তফসীরে নূরুল কোরআন

সাতাশ পারা

২৭

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

সাতাশতম খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

সাতাশতম খন্ড

২৭

সাতাশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

তৃতীয় প্রকাশ ঃ সফর ১৪৩১ হিঃ
মাঘ ১৪১৬ বাং
জানুয়ারী ২০১০ ইং

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১৩-০১৪৮৮৯

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V); 27. Published by Al-Balag Publications
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 300.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!! মহান আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআনের সাতাশতম খন্ড প্রকাশিত হলো। এটি পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অফুরন্ত করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এজন্যে বিনীত চিত্তে তাঁর মহান দরবারে পেশ করি অগণিত শোকর।

এ শুভ-মুহূর্তে দরুদ ও সালাম পেশ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, যিনি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য, যিনি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, যিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের দলপতি। যাঁর নূর অধিকতর চমকপ্রদ এবং অধিকতর সমুজ্জ্বল।

হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর আল-আওলাদের প্রতি, এমন দরুদ যা চিরদিন অব্যাহত থাকে। ।

এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের নেয়ামত, সবই তাঁর দান। আমাদের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, তাঁর অগণিত দানের জন্যে শোকর গুজার হওয়া প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

"যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ শুমার করতে চাও তবে তা সম্ভব হবেনা"।

অতএব আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হওয়া বন্দা মাত্রেরই কর্তব্য।

তবে এ সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো পবিত্র কোরআন, যা আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করেছেন। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যেদিকে পবিত্র কোরআনের হেদায়েত নেই, মানব জীবনে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান পবিত্র কোরআন দেয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা দেখা দিতে পারে তারও

সমাধান রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা"।

পবিত্র কোরআন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভান্ডার। এ জ্ঞান ভান্ডার থেকে সর্ব কালের সকল মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। আর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই, যা কোরআনে করীমে নেই।

আজকের এ সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীতে মানুষের জীবন দুর্বিষহ, জীবন-পরিক্রমায় সে সম্মুখীন হয় অগণিত বাধা-বিপত্তির। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে যারা ঈমানদার অবস্থায় জীবন যাপন করতে চায়, সততা ও সত্যবাদিতার গুণ অর্জন করতে চায়, তাদের প্রতি পদক্ষেপেই যেন সমস্যার পাহাড় দন্ডায়মান থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়াসও থাকে, কিন্তু অবশেষে দেখা যায় সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না। এমন অবস্থায় আমাদের করণীয় কি তার সঠিক জবাব রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে।

আজকের এই পৃথিবী অশান্ত, অশান্ত মানুষের মন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির অন্বেষায় সকল দেশের মানুষ ব্যাকুল হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক শান্তি সম্মেলন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে শান্তি চুক্তিও হয়। কিন্তু শান্তি পাওয়া যায়না কোথাও। এ শান্তির সন্ধানই দিয়েছে পবিত্র কোরআন, আর কোরআন প্রদত্ত শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন শান্তিদূত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"হুশিয়ার হও, শুধু আল্লাহ পাকের স্মরণেই মানব মন শান্তি লাভ করে"।

পবিত্র কোরআনই মানব জীবনের পরিপূর্ণ সাফল্যের পথ-নির্দেশ করেছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

"অবশ্যই সে সফলকাম হয়েছে যে আত্ম-সংশোধন করেছে"।

আত্ম সংশোধন ব্যতীত আত্মোন্নতি অচিন্তনীয়, আত্মসশোধন ব্যতীত মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধন সম্ভব নয়। তাই আজকের পৃথিবীতে মানবতার চরম দুর্দিন, কেননা আত্মসংশোধনের কোন প্রয়াস নেই। আল্লাহ্ পাক মানুষকে যে সব নৈতিক গুণ অর্জনের আদেশ দিয়েছেন, সে সব গুণের অভাব দেখা দিয়েছে চরমভাবে। এর একমাত্র কারণ এই যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত মানুষের মধ্যে সে সব গুণের বিকাশ ঘটতে পারেনা। তাই মানবতার উৎকর্ষ সাধনে এমনকি মানবতার উদ্ধার ও উত্থানের লক্ষ্যে আজ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী। তাই পবিত্র কোরআন পাঠ করা, এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং এর উপর আমল করা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য, এ কর্তব্য পালনার্থেই একদিন শুরু হয়েছিল তফসীরে নূরুল কোরআনের এই সাধনা।

আল্হাম্দুলিল্লাহ! আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমতেই আজ এ মহান গ্রন্থের সাতাশতম খন্ড পেশ করা সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে শুধু আল্লাহ্ পাকের রহমতেই হয়েছে, আর যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তা-ও ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ পাকের রহমতেই হবে। হে আল্লাহ্! কবুল কর এই সাধনা, তোমার প্রিয় হাবীব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় এ মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

বিনীত

গ্রন্থকার

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

১। শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত..... ৪
২। ঈমানী শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী.....৬
৩। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা.....১৪
৪। আয়াতের মর্মকথা..... ১৬
৫। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য..... ১৭
৬। আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা.....১৯
৭। সূরা তূর প্রসঙ্গে.....২৫
৮। স্বপ্নের তা'বীর.....২৫
৯। এ সূরার আমল..... ২৫
১০। নামকরণ.....২৫
১১। মূল বক্তব্য.....২৫
১২। বয়তুল মা'মুরের অবস্থান..... ২৬
১৩। সমুদ্রগুলো দোযখে পরিণত হবে..... ২৮
১৪। আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা.....৩০
১৫। হযরত যোবায়ের এবনে মোতএমের ইসলাম গ্রহণ.....৩০
১৬। হযরত ওমর (রাঃ) অসুস্থ হলেন.....৩১
১৭। শপথের তাৎপর্য.....৩২
১৮। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা.....৫১
১৯। সূরা নজম প্রসঙ্গে.....৫৭
২০। এ সূরার আমল..... ৫৭
২১। স্বপ্নের তা'বীর.....৫৮
২২। মূল বক্তব্য.....৫৮
২৩। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক..... ৫৮
২৪। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলেন.....৬২
২৫। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছিলেন..... ৬৪
২৬। সিদ্‌রাতুল মুনতাহার কথা..... ৬৭

২৭। আত্ম প্রশংসায় লিপ্ত হয়োনা..... ৮৩
২৮। শানে নুযুল.....৮৩
২৯। আয়াতের মর্মকথা..... ৮৩
৩০। মৃত্যুর পর উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা.....৮৭
৩১। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা.....১১০
৩২। আদ জাতির ঘটনা.....১১৫
৩৩। সামুদ জাতির ঘটনা..... ১১৭
৩৪। লূত সম্প্রদায়ের ঘটনা.....১২১
৩৫। ফেরাউন ও তার দলবলের ঘটনা..... ১২৫
৩৬। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা.....১২৮
৩৭। শানে নুযুল.....১২৯
৩৮। তকদীর প্রসঙ্গে.....১৩০
৩৯। সূরা আর রহমান প্রসঙ্গে.....১৩৫
৪০। এ সূরার বৈশিষ্ট্য.....১৩৬
৪১। স্বপ্নের তা'বীর.....১৩৬
৪২। দয়াময়ের সর্ব শ্রেষ্ঠ দান..... ১৩৮
৪৩। পাপীষ্ঠদের পরিণতি..... ১৬১
৪৪। শানে নুযুল.....১৬৫
৪৫। জান্নাতের কয়েকটি নেয়ামত, ...১৬৮
৪৬। জান্নাতের ফলের বিবরণ.....১৭৪
৪৭। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব.....১৭৭
৪৮। এ সূরা সম্পর্কে কিছু কথা ১৭৯
৪৯। সূরা ওয়াকেয়াহ প্রসঙ্গে.....১৮১
৫০। নামকরণ..... ১৮১
৫১। মূল বক্তব্য..... ১৮১
৫২। এ সূরার ফজিলত.....১৮২
৫৩। সূরা ওয়াকেয়ার আমল.....১৮২
৫৪। স্বপ্নের তা'বীর.....১৮৩
৫৫। কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে.....১৮৪
৫৬। মানব জাতি তিনভাগে বিভক্ত হবে.....১৮৬
৫৭। অগ্রবর্তী কারা.....১৮৬
৫৮। জান্নাতবাসীদের খাদেম..... ১৯১
৫৯। জান্নাতের খাবার.....১৯৩

৬০। হুরদের বিবরণ.....১৯৪
৬১। বেহেশতের পরিবেশ..... ১৯৫
৬২। যারা বেহেশতে সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে.....১৯৫
৬৩। শানে নুযুল ১৯৬
৬৪। উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিশেষ মর্যাদা..... ২০০
৬৫। মানুষের কর্তব্য.....২১৫
৬৬। আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হও..... ২১৬
৬৭। অজু ব্যতীত পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা যায় না.....২২০
৬৮। এ জীবনের পর কি হবে? ২২৩
৬৯। সূরা হাদীদ প্রসঙ্গে.....২২৬
৭০। নামকরণ.....২২৬
৭১। মূল বক্তব্য.....২২৬
৭২। এ সূরার ফজিলত.....২২৭
৭৩। এ সূরার আমল..... ২২৮
৭৪। স্বপ্নের তা'বীর.....২২৮
৭৫। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক..... ২২৮
৭৬। তিনি সব কিছুর পূর্বে, তাঁর পূর্বে কিছুই নেই..... ২৩১
৭৭। অর্থ-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ পাক..... ২৩৮
৭৮। আল্লাহর রাহে দান করার মাহাত্ম.....২৪২
৭৯। হযরত আবুবকর (রাঃ) এর ফজিলত..... ২৪৪
৮০। আল্লাহর রাহে দান করার মাহাত্ম.....২৪৭
৮১। আখেরাতে মুনাফেকদের দুরবস্থা.....২৫৪
৮২। গাফলত পরিহার কর.....২৫৬
৮৩। শানে নুযুল.....২৫৬
৮৪। দুনিয়ার জীবনের হাকীকত..... ২৬২
৮৫। জান্নাত লাভ হবে শুধু আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে.....২৬৬
৮৬। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব.....২৬৭
৮৭। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই একমাত্র আদর্শ.... ২৭২
৮৮। ইসলামী জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য.....২৭৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

সাতাশতম খন্ড — সাতাশতম পারা

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا
فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ
أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩১) ইব্রাহীম বলেন, হে ফেরেশতাগণ! তবে তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

(৩২) তারা বলেন, আমরা এক পাপীষ্ঠ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

(৩৩) তাদের উপর মাটির পাথর বর্ষণ করাই আমাদের কাজ।

(৩৪) যারা বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের জন্যে আপনার প্রভুর তরফ থেকে তা (পাথরগুলো) চিহ্নিত রয়েছে।

(৩৫) এরপর আমি সেখান থেকে মোমেনদেরকে সরিয়ে দেই।

(৩৬) তবে সেখানে একটি মাত্র মুসলিম গৃহ ব্যতীত আর কোন গৃহ পাইনি।

(৩৭) এতে আমি নিদর্শন রেখেছি সে সব লোকের জন্যে যারা কঠিন আযাবকে ভয় করে।

(৩৮) আর মূসার ঘটনায়ও রয়েছে উপদেশ, আমি তাকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করি।

(৩৯) সে তখন তার ক্ষমতার দম্ভে তা থেকে বিমুখ হয় আর বলে, লোকটি যাদুকর অথবা পাগল।

(৪০) পরিণামে আমি তাকে এবং তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করি এবং তাদের সকলকে নিক্ষেপ করি সমুদ্র বক্ষে, ফেরাউন ছিল অভিযুক্ত ও তিরষ্কারের যোগ্য।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইরাক থেকে সিরিয়ায় হিজরত করছিলেন। তাঁর ভ্রাতস্পুত্র হযরত লুত (আঃ) তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। হযরত লুত (আঃ) সদুম, আমুরা প্রভৃতি জনপদের জন্যে নবী মনোনীত হয়েছিলেন। এ জনপদগুলো বর্তমান জর্দানের অন্তর্ভুক্ত। জর্দানের বিখ্যাত "মৃত সাগরের" উপকূলেই ছিল এ জনপদগুলোর অবস্থান।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর তাঁবুর দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় কয়েকজন আগন্তুক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। মেহমানদারী ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাই আগন্তুকদের পরিচয় লাভের পূর্বেই তিনি তাঁদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁরা খাদ্য গ্রহণে কোন প্রকার আগ্রহ বোধ করলেন না, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত এবং ভীত হলেন। মানবরূপী এ আগন্তুকগণ তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, আমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতা, আমরা আপনাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করছি। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের সঙ্গে যে বাক্যালাপ করেছিলেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে, এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ

'ইব্রাহীম বলেন, হে ফেরেশতাগণ! তবে তোমাদের উদ্দেশ্য কি', অর্থাৎ কোন্ উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছ?

ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাব দিলেন এভাবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ

'তারা বলেন, আমরা এক পাপীষ্ঠ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি'।

অর্থাৎ হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির প্রতি, যারা জঘন্য নিন্দনীয় কুকর্মে লিপ্ত ছিল। মানব জাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে কোন জাতি এত ঘৃণ্য কুকর্ম করেনি তথা অল্প বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে কামাচারে লিপ্ত হয়নি। এতদ্ব্যতীত তারা ছিল ডাকাত, লুটেরা, অশ্লীল কুকর্মে লিপ্ত, চরম নির্লজ্জ, আল্লাহ্ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত লুত (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে এবং বলেছে, আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আযাব নিয়ে আসুন। এমন অবস্থায় হযরত লুত (আঃ) দরবারে এলাহীতে দোয়া করলেন এভাবে,"হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এ জালেমদের জুলুম থেকে হেফাজত কর এবং এ জঘন্য চরিত্রহীন লোকদের মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য কর, এবং আমাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান কর"।

আল্লাহ্ পাক হযরত লুত (আঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করলেন। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ

যারা সীমা লংঘন করেছে, তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করাই হলো আমাদের কাজ।

حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ

অর্থাৎ কংকর এবং সেই জমাট মাটি যা প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়, এমন প্রস্তর বর্ষণ করে তাদের শাস্তি বিধানই হলো আমাদের কর্মসূচী।

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ

'যারা বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের জন্যে আপনার প্রভুর তরফ থেকে তা (পাথরগুলো) চিহ্নিত রয়েছে'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, প্রত্যেক পাপীষ্ঠ ব্যক্তির জন্যে পাথর নির্দিষ্ট ছিল এবং তাতে তার নাম লিখিত ছিল।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রতিটি পাথরের মধ্যেই সে পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল, যা দ্বারা তাকে ধ্বংস করা হবে।

অথবা এর অর্থ হলো, নিক্ষিপ্ত প্রস্তরগুলো যে আযাবের জন্যে ব্যবহৃত একথা সকলের জানা হয়েছিল।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার একথাও বলেছেন যে, ঐ পাথরগুলো যে দুনিয়ার পাথর নয়, একথাও প্রমাণিত হয়েছিল।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৪

لِلْمُسْرِفِيْنَ

অর্থাৎ যারা মন্দ ও নিন্দনীয় কাজে সীমা লংঘন করেছে, যারা বাড়াবাড়ি করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, مسرفين শব্দের দ্বারা মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাকের সঙ্গে শেরক করা সবচেয়ে বড় সীমা লংঘন এবং সবচেয়ে বড় অপরাধ।

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

এরপর আমি সেখান থেকে মোমেনদেরকে সরিয়ে দেই, কেননা ঐ জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাই আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সেখান থেকে গজব নাযিল করার পূর্বেই সরিয়ে দেন।

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

'তবে সেখানে একটি মাত্র মুসলিম গৃহ ব্যতীত আর কোন গৃহ পাইনি'।

ফেরেশতাগণ হযরত লুত (আঃ)-কে বললেন, রাতের কিছু অংশ বাকী থাকতে আপনি নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ুন, গমনকালে কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী পেছনের দিকে তাকাবে, এজন্যে অন্যদের প্রতি যে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হবে, তা তার প্রতিও নিক্ষিপ্ত হবে। আর ঐ জনপদে হযরত লুত (আঃ)-এর পরিবার ব্যতীত আর কোন মুসলিম পরিবার পাওয়া যায়নি, সকলে অন্যায় অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল, আর হযরত লুত (আঃ)-এর পরিবারবর্গের মধ্যেও শুধু তিনি এবং তাঁর কন্যাগণই এ আযাব থেকে নাজাত পেয়েছেন। তাঁর স্ত্রী যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত, সেজন্যে সে-ও কোপগ্রস্ত হয়।

وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত

এতে আমি নিদর্শন রেখেছি সে সব লোকদের জন্যে, যারা কঠিন আযাবকে ভয় করে।

অর্থাৎ হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির এ ধ্বংসলীলা, তাদের এ শোচনীয় পরিণতি অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে নিঃসন্দেহে একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা এ পৃথিবীতে অন্যায়, অশ্লীল, অমানবিক কুকর্মে লিপ্ত হবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এমনকি এসব ক্ষেত্রে নবীর নিকটাত্মীয় হওয়াও আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হয়না।[১]

১। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩০৫-০৭

وَفِىْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

'আর মূসার ঘটনায়ও রয়েছে উপদেশ, আমি তাকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করি'।

অর্থাৎ যেভাবে হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, ঠিক তেমনি মূসা (আঃ)-এর ঘটনায়ও পরবর্তী কালের মানুষের জন্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন।

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ তথা বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাঁর হাতের লাঠিটি বিরাটকায় অজগরে পরিণত হতো, যখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে স্বহস্তে স্পর্শ করতেন তখন তা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হতো। কিন্তু এসব মোজেযা দেখেও ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানালো, ক্ষমতার দম্ভ তার ঈমান আনয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

সে বললো, মূসা (আঃ) যাদুকর অথবা পাগল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে সে তাঁকে যাদুকর বলেছে, আর যেহেতু ক্ষমতার দম্ভে সে আত্মহারা হয়েছিল এবং দুনিয়ার লোভে মোহে মুগ্ধ-মত্ত হয়ে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল, তাই তৌহীদের আহবানে সাড়া দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে পাগল বলেছে অথচ ক্ষমতার দম্ভে সে নিজেই হয়ে পড়েছিল নির্বোধ, কান্ডজ্ঞান শূন্য, কেননা তার কথাতেই রয়েছে স্ববিরোধিতা এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। হযরত মূসা (আঃ)-কে সে পাগল এবং যাদুকর বলেছে, যদি তিনি পাগল হন তবে যাদুকর কি করে হলেন, কেননা যারা যাদুকর তারা হয় অত্যন্ত চতুর, আর যদি তিনি পাগল হন, তবে তাঁকে যাদুকর বলা যায়না। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফেরাউনের কোন কথাই সত্য নয়।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ

'পরিণামে আমি তাকে এবং তার সৈন্য সামন্তকে পাকড়াও করি এবং তাদের সকলকে নিক্ষেপ করি সমুদ্রের বক্ষে। ফেরাউন ছিল অভিযুক্ত এবং তিরস্কারের যোগ্য'।

যেহেতু ফেরাউন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীর আহবানে সাড়া দেয়নি, তৌহীদে বিশ্বাস করেনি এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা সমূহকে যাদু বলে আখ্যা

দিয়েছে, তাই আল্লাহ পাক তার শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, তাকে তার দলবল সহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করেছেন, আর হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণের বরকতে বণী ইসরাঈল নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করলো।

وَهُوَ مُلِيْمٌ

অর্থাৎ কুফর ও নাফরমানী, দম্ভ ও অহমিকা এবং সত্যের সঙ্গে শত্রুতা পোষণের দোষে ফেরাউন ছিল অভিযুক্ত এবং তিরষ্কারের যোগ্য। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَفِىْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

'আর মূসার ঘটনায়ও রয়েছে উপদেশ, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করি'।

ঈমানী শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী

প্রকাশ্য দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা হলো ফেরাউন অত্যন্ত শক্তিধর, দাম্ভিক, জালেম নৃপতি ছিল। পক্ষান্তরে, হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রকাশ্যে কোন শক্তিই ছিলনা, কিন্তু তাঁর নিকট ছিল সত্য, এ সত্যের দাওয়াত নিয়েই তিনি এসেছিলেন ফেরাউনের কাছে, তিনি আল্লাহ পাকের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন ঈমানী ও রুহানী শক্তির অধিকারী, আর ফেরাউন ছিল জাগতিক শক্তির অধিকারী, জাগতিক শক্তি কখনো রুহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তির মোকাবেলা করতে পারেনা। যেমন ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং লোহিত সাগরে তার সলিল সমাধি ঘটেছে।

ঠিক এমনিভাবে নমরুদ জাগতিক শক্তির অধিকারী হয়েও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর রুহানী শক্তির মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, অদ্রুপ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সকল জাগতিক শক্তি যুক্তফ্রন্ট করে বারংবার মোকাবেলা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে কা'বা শরীফের ভেতর প্রবেশ করে পাঠ করেছিলেন পবিত্র কোরআনের এ আয়াত খানিঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য"।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ
عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ
هُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَ
السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

তরজমা

(৪১) আর আদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে নিদর্শন, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম কল্যাণ-শূণ্য বায়ু।

(৪২) যে কোন জিনিষের উপরই ঐ বায়ু প্রবাহিত হয়েছে, তাকেই সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছেড়েছে।

(৪৩) আর সামুদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে নিদর্শন, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা ভোগ করে লও।

(৪৪) কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো, পরিণামে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা তা দেখছিল।

(৪৫) কিন্তু তখন তারা উঠে দাঁড়াতে এবং তা প্রতিরোধও করতে পারল না।

(৪৬) আর আমি ইতিপূর্বে নূহের জাতিকেও ধ্বংস করেছি, নিশ্চয় তারা ছিল অবাধ্য সম্প্রদায়।

(৪৭) আমি আমার শক্তি বলে নির্মাণ করেছি আসমান, আর আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।

(৪৮) আর আমি জমীনকে বিছিয়ে রেখেছি, আর কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি।

(৪৯) আর আমি প্রত্যেকটি জিনিষকে জোড় জোড় করে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ।

(৫০) অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কওমে লুত এবং ফেরাউনের পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এ ঘটনা সমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ পাক অবাধ্য কাফেরদের ধ্বংসকে দুনিয়ার মানুষের জন্যে নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন, যাতে করে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আর একই উদ্দেশ্যে এ আয়াত থেকে আদ, সামুদ এবং নূহ জাতির শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ

'আর আদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে নিদর্শন, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম কল্যাণ-শূণ্য বায়ু'।

الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ

অর্থাৎ এমন বায়ু যাতে কোন কল্যাণ থাকেনা। সাধারণতঃ বায়ু হয় বৃষ্টির বাহন, কিন্তু আদ জাতির নিকট প্রেরিত বায়ুতে ছিলনা বৃষ্টি, এতে ছিল শুধু ধ্বংস। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ

'যে কোন জিনিষের উপরই ঐ বায়ু প্রবাহিত হয়েছে, তাকেই সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছেড়েছে'।

আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী এবং সত্যদ্রোহীতার অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ আদ জাতির ধ্বংস নেমে আসে, ঝড় এবং ঘূর্ণিবাত্যায় দূরাত্মা কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়, আর এ আযাব আসে তাদের কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ। এতে রয়েছে পৃথিবীর অন্য মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়।

وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ

'আর সামুদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে নিদর্শন, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা ভোগ করে লও'।

অর্থাৎ যেভাবে কওমে লুত, কওমে ফেরাউন এবং কওমে আদের ধ্বংসলীলায় শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, ঠিক তেমনি এ পর্যায়ে সামুদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে মানব

জাতির জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ

অর্থাৎ সামুদ জাতিকে ধ্বংস করার ব্যাপারেও আল্লাহ্ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ্ পাক পাহাড় থেকে তাদের জন্যে একটি উষ্ট্রী বের করে দিয়েছেন, আর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ যেন এ উষ্ট্রীটির ক্ষতি সাধন না করে। কিন্তু দূরাত্মা কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত সালেহ (আঃ)-এর শত বাধা সত্ত্বেও ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে। তখন হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বলেন, তোমাদের গৃহে তোমরা তিনদিন যাবত আনন্দ উল্লাস করতে থাক,

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ

কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো। হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলোনা, তিনদিন পর্যন্ত তাদেরকে ঐ অবস্থায় রেখে দেয়া হলো, এরপর আল্লাহ্ পাকের আযাব আপতিত হলো এবং তা স্বচক্ষে তারা দেখছিল, আর তাদের গৃহেই তাদেরকে ধ্বংস করা হলো।

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ

'কিন্তু তখন তারা উঠে দাঁড়াতে পারেনি এবং ঐ আযাব প্রতিরোধও করতে পারেনি'।

সামুদ জাতিকে হেদায়েত করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নবী হযরত সালেহ (আঃ) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেনি, তাই তাদের প্রতি আযাব নাযিল হলো, আর তা এত আকস্মিক ভাবে আপতিত হলো যে, আযাব নাযিল হবার পর তারা পলায়নের কোন অবকাশ পায়নি, এমনকি তারা পলায়নের জন্যে দাঁড়াতেও পারেনি। আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই তারা করতে পারেনি। হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আরো কিছু দিন ভোগ করে লও, এটি ছিল তাদের প্রতি তাঁর সতর্কবাণী।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এই ভোগের সময় ছিল মাত্র তিন দিন। এরপরই তারা কোপগ্রস্ত হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের আদেশ কার্যকর হয় এবং তারা তাদের নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।[১]

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

'আর ইতিপূর্বে আমি নূহের জাতিকেও ধ্বংস করেছি, নিশ্চয় তারা ছিল অবাধ্য জাতি'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ১২৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৬

অর্থাৎ কওমে লুত, ফেরাউন, আদ এবং সামুদ জাতির পূর্বে হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতিকেও তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে, কেননা তারা ছিল অত্যন্ত পাপীষ্ঠ, ইতিপূর্বে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۞ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ

'আর আমি আমার শক্তিবলে নির্মাণ করেছি আসমান, আর আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী'।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে ايد শব্দটির অর্থ হলো শক্তি। মুজাহেদ (রঃ) থেকেও এ অর্থই বর্ণিত আছে। আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তাঁর অনন্ত অসীম শক্তি দ্বারাই বিশাল আসমানকে কোন খুঁটি ব্যতীত ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। এমনিভাবে যমীনকে তিনি কি সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অবাধ্য হয়ে কেউ বাঁচতে পারেনা, তার দৃষ্টান্ত কওমে আদ, সামুদ এবং কওমে নূহের ধ্বংস। আল্লাহ পাকের নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপই তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

'আর আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী, মহা শক্তির অধিকারী'।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি আসমান যমীনকে সম্প্রসারণকারী। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমি আমার সৃষ্টির জন্যে রিয্ক প্রশস্তকারী।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে যমীন ও আসমানের সৃষ্টির কথা বলেছেন এবং একথাও ঘোষণা করেছেন, তিনি তাঁর মহা শক্তি দ্বারা আসমান সৃষ্টি করেছেন, যার কোন খুঁটি নেই এবং আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির জন্যে যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন অতি সুন্দরভাবে।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৭

'আর আমি প্রত্যেকটি জিনিষকে জোড় জোড় করে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ'।

যেমন ঈমান ও কুফর, ভাল-মন্দ, হেদায়েত ও গোমরাহী, আসমান-যমীন, দিবা-রাত্রি, সকাল-সন্ধ্যা, জ্বীন-মানুষ, নর-নারী, চন্দ্র-সূর্য, আলেম-জাহেল, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ।

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ'।

অর্থাৎ তোমরা যেন এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখ যে, প্রকারভেদ সৃষ্টিরই বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক প্রত্যেক সৃষ্টিকে একাধিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী করেছেন, কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ পাক সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

'অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

অতএব, হে মানব জাতি! তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হও, একথা জেনে রাখ যে, তাঁর আশ্রয় ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই। তোমাদেরকে এ মহা সত্য সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যেই আগমন করেছেন আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণ, তাই তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ পাকের একত্ববাদে এবং সব কিছু থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ কর, তাঁর সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হও, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে যত্নবান হও।

اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদেরকে সতর্ককারী রূপে এসেছি, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে মোজেযা তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ
مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾
اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾
وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ
اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ
يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾ فَاِنَّ
لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

তরজমা

(৫১) আর তোমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোন মা'বুদকে স্বীকার করোনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত প্রকাশ্য সতর্ককারী।

(৫২) এভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকটও যখনই কোন রসূল এসেছেন, তখনই তারা নবী রসূলগণকে যাদুকর বা পাগল বলেছে।

(৫৩) তবে কি তারা একে অন্যকে এই অসিয়ত করেই মরেছে, বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী জাতি।

(৫৪) (হে রসূল!) আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, আর এতে আপনার প্রতি কোন অভিযোগও হবেনা।

(৫৫) আর (হে রসূল!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মোমেনদের উপকারে আসে।

(৫৬) আর আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্যে যেন তারা শুধু আমারই এবাদত করে।

(৫৭) আমি তাদের নিকট থেকে রিয্ক কামনা করিনা, আর তারা আমার আহার্য সংগ্রহ করুক, তা-ও আমার কাম্য নয়।

(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ পাকই রিয্কদাতা, তিনি শক্তিশালী এবং সুশক্ত ও সুকঠিন।

(৫৯) এই পাপীষ্ঠদেরও প্রাপ্য তাই, যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। অতএব, তারা যেন আমার নিকট আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া না করে।

(৬০) সে দিনের আগমনে কাফেরদের সর্বনাশ অবধারিত, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ

অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের দিকেই পলায়ন কর, অর্থাৎ সব কিছু ছেড়ে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর নৈকট্য-ধন্য হও, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে যত্নবান হও, এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হও, এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা কর, আল্লাহ পাকের রহমতের-ই আশা কর, শুধু আল্লাহ পাককেই ভয় কর, তিনি তোমার মালিক, তিনিই তোমার খালেক বা স্রষ্টা অতএব, তুমি সকল সম্পর্কচ্ছেদ করে শুধু এক আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক গড়তে প্রয়াসী হও।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

'আর তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন মা'বুদকে স্বীকার করোনা,' অর্থাৎ যদি তুমি সব কিছু থেকে পলায়ন করে নিজেকে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির রাখতে না পার, তবে অন্তত তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করোনা, অন্য কোন কিছুকে মা'বুদ বা উপাস্য বলে মনে করো না। উপাস্য একজনই তথা একমাত্র আল্লাহ পাকই মা'বুদ বা উপাস্য, এবাদতের যোগ্য শুধু তিনিই, আর কেউ নয়, অতএব আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই বা প্রিয় কেউ নেই আর আল্লাহ পাক ব্যতীত মকসুদও কেউ নেই, কেননা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই মর্দে মোমেনের সকল সাধনা, অতএব এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত হও।

اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত প্রকাশ্য সতর্ককারী, অতএব আমি তোমাদেরকে সর্তক করছি, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সম্মুখে মাথা নত করোনা। এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর, শেরক সহ যাবতীয় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে সচেষ্ট হও।

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

'এভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকটও যখনই কোন রসূল এসেছেন, তখনই তারা নবী রসূলগণকে যাদুকর বা পাগল বলেছে'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! এত সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি কাফেররা ঈমান না আনে, তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্জন না করে, তবে আপনি তাতে দুঃখিত হবেন না, কেননা ইতিপূর্বে যখনই কোন জাতির নিকট কোন নবী রসূল আগমন করেছেন, তখনই তাঁদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে যাদুকর এবং পাগল বলা হয়েছে। এ কাফেরদের অন্যায় আচরণ দেখলে মনে হয়, যেন পূর্বের কাফেররা এদেরকে এ অন্যায় কাজের জন্যে অসিয়ত করেছে এবং পূর্বকালের লোকেরা এ যুগের কাফেরদেরকে আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ

'তবে কি তারা একে অন্যকে এই অসিয়ত করেই মরেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী জাতি'।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে كَذٰلِكَ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনার উম্মতের কাফেরদের যে অবস্থা রয়েছে, অনুরূপ অবস্থাই ছিল পূর্ববর্তী নবী রসূলগণের উম্মতদের। তারাও এমনিভাবেই নবী রসূলগণের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে, তবে কি পূর্ববর্তী কাফেররা এ যুগের কাফেরদেরকে নবী রসূলগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের অসিয়ত করে গেছে? কেননা সকল যুগের কাফেরদের একই প্রকার আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ

যেহেতু এদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক, তাই পরস্পরকে অসিয়ত করার প্রশ্ন ওঠেনা, বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। তাদের স্বভাব এবং প্রকৃতি একই, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যদ্রোহীতার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই, তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে, কিন্তু আচরণে কোন অমিল নেই। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের অন্যায় আচরণে সবর অবলম্বনের তাগিদ দিয়ে এরশাদ

করেছেনঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

'(হে নবী!) কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি সবর অবলম্বন করুন, যেমন সবর অবলম্বন করেছেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলগণ'।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ

'(হে রসূল!) আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, আর এতে আপনার প্রতি কোন অভিযোগও হবেনা'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যখন এই কাফেরদেরকে বারংবার ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করেছেন, কিন্তু আপনার আহবানে তারা সাড়া দেয়নি, তাদের শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রেখেছে, তাই তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই শ্রেয়। আর এ কারণেই এ ব্যাপারে আপনার প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তাই আপনাকে কাফেরদের জন্যে চিন্তিত হতে হবেনা, আর আপনি তাদেরকে সাবধান করেননি এবং নাজাতের পথ প্রদর্শন করেননি, এ অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে কেউ আনতে পারবেনা। তাই তাদের আচরণে ভ্রুক্ষেপ না করে আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতিম, এবনে রাহবীয়া, এবনে হাইসাম, এবনে কোলায়েব মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন এ আয়াত

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ

(হে রসূল!) আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, আর এতে আপনার প্রতি কোন অভিযোগও হবেনা)

নাযিল হয়, তখন আমাদের প্রত্যেকের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব আসবে এবং সকলকে ধ্বংস করা হবে, কেননা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার আদেশ দিয়েছেন। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত-

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

নাযিল হয়, তখন আমরা সকলে আনন্দিত এবং নিশ্চিন্ত হই।

এবনে জরীর লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, যখন فَتَوَلَّ عَنْهُمْ নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের নিকট তা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয়, কেননা তাঁরা মনে করেছেন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী

নাজিল হওয়া বন্ধ হলো এবং আযাব আপতিত হওয়া অবধারিত, এরপর আল্লাহ্ পাক নাজিল করলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

(হে রসূল!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, নিশ্চয় আপনার উপদেশ মোমেনদের জন্যে উপকারী হবে)

অর্থাৎ যার মধ্যে ঈমান আনয়নের যোগ্যতা রয়েছে তার জন্যে আপনার উপদেশ উপকারী হবে, যদিও কাফেররা আপনার উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে প্রস্তুত না হয়।

অথবা এর অর্থ হলো, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন, আপনার উপদেশ নিঃসন্দেহে মোমেনদের জন্যে উপকারী হবে। তাদের মন এর দ্বারা আলোকিত হবে।

এ আয়াত নাযিল হবার পর মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন।[১]

আয়াতের মর্মকথা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের হেদায়েতের জন্যে, মানুষের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছানো ছিল তাঁর মহান দায়িত্ব, তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন, কিন্তু অনেক লোক তাঁর উপদেশ গ্রহণে বিরত ছিল, শুধু তাই নয়; বরং তাঁর বিরোধিতা করা এবং তাঁর প্রতি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি জুলুম অত্যাচার করাই ছিল তাদের কাজ। এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, (হে রসূল!) যারা আপনার প্রতি ঈমান আনেনা এবং আপনার প্রতি জুলুম অত্যাচার করতে খড়গহস্ত, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন, তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে আপনার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তা আপনি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন, তাই কেউ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেনা যে, আপনি তাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছাননি এবং তাদেরকে আপনি সতর্ক করেননি। তবে কাফেরদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করলেও আপনার উপদেশ প্রদান অব্যাহত রাখুন, কেননা আপনার উপদেশ মোমেনদের জন্যে বিশেষ উপকারী হবে, যদিও কাফেররা এ উপদেশ থেকে মাহরুম হয়।

"প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপদেশ দ্বারা মোমেনগণই উপকৃত হবে" এর দৃষ্টান্ত হলো, কোরআনে করীমের সূরা বাকারার প্রথম আয়াতের ঘোষণা ঃ

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৯
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২০

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন পথ প্রদর্শক তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় রয়েছে।

তাকওয়া পরহেযগারী হলো পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের পূর্বশর্ত। ঠিক এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো মানব মনের যোগ্যতা, যা সত্য গ্রহণের মাপকাঠি প্রমাণিত হয়।

فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'নিশ্চয় নসিহত মোমেনদের জন্যে উপকারী হয়'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে।

(এক) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপদেশ দ্বারা মোমেনদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়, যেমন কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا

(যেন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়)

(দুই) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, (হে রসূল!) আপনার পরে পৃথিবীতে যারা আসবে, এমন মোমেনদের জন্যেও আপনার উপদেশ উপকারী হবে।

(তিন) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপদেশের মাধ্যমে যখন কোন কাফের ঈমান আনে, তখন তার উপকৃত হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়।[১]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আর আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্যে যেন তারা শুধু আমারই বন্দেগী করে'।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষ ও জ্বীন জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, আর এ বন্দেগীর মাধ্যমেই মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়। মানব জাতি যেহেতু পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হয়েছে, তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছেন, পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-২৩১

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

'তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছু'।

আল্লাহ পাকই মানুষের রিয্কের যাবতীয় ব্যবস্থা জমীনের অভ্যন্তরে রেখে দিয়েছেন। যে যখনই যেখানে যথা নিয়মে জমীনের উপর মেহনত করে, আল্লাহ পাক তাকে তার কাম্য বস্তু দান করেন, আর এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বন্দার জন্যে আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, চন্দ্র সূর্য দ্বারা আলো বিতরণ করেন, বায়ু প্রবাহিত করেন, বন্দার কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর বন্দেগী করা। এ পর্যায়ে প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা, শেরক বর্জন করা এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ পাকের বন্দেগী শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট এবাদতের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড যথা পানাহার, আয়-রোজগার, বিয়ে-শাদী এক কথায় সব কিছু হতে হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এ সত্যটিকে ঘোষণা করেছেন এভাবেঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার সকল এবাদত, আমার জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড এমনকি, আমার মরণ পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে"।

মরমী কবি তাই বলেছেন,

تابع حق دید نش نادید نش

خور دنش نوشید نش خوا بید نش

(বন্দার দেখা না দেখা সব কিছুর মধ্যেই থাকতে হবে আল্লাহ পাকের তাবেদারী, তার পানাহারের এমনকি নিদ্রাগমনেও।)

قرب حق ازہر عمل مقصود دار

تاز توگر دو جلالش آشکار

প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, আর শুধু এভাবেই তোমার দ্বারা আল্লাহ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড এমনকি দেখা-না দেখা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের মর্জি তথা বিধান মোতাবেক হতে হবে, এটিই হলো আল্লাহ পাকের বন্দেগী, আর এ বন্দেগীর জন্যেই আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে এ বন্দেগী করতে হবে তা হাতে কলমে দেখিয়ে গেছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত কোন সৎ কাজই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না।

সংক্ষেপে কথাটিকে এভাবে বলা যায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, আর এ আনুগত্য নিজের খেয়াল খুশী মোতাবেক হলেও চলবেনা, বরং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে প্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হতে হবে। এজন্যে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার বন্দেগীর জন্যে নিজেকে তৈরী কর, আমি তোমাকে পর মুখাপেক্ষীতা থেকে রক্ষা করবো। তোমার দারিদ্রকে প্রতিরোধ করবো, আর যদি তুমি তা না কর, তবে তোমার অন্তরকে রকমারী ব্যস্ততা দিয়ে পরিপূর্ণ করবো এবং তোমার পর মুখাপেক্ষীতার পথ বন্ধ করবো না। (তিরমিজী, এবনে মাজা)

আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যেন আমি তোমাদেরকে আমার এবাদত বন্দেগীর আদেশ প্রদান করি।

যেমন অন্য আয়াতে কথাটি এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا

"আর তাদেরকে শুধু এজন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করে"।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের لِيَعْبُدُوْنِ শব্দটির অর্থ হলো لِيَعْرِفُوْنِ অর্থাৎ আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে শুধু এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমার পরিচয় পায়, আমাকে চিনতে পারে। আর কাফেররাও আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করতে পারে। যেমন আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

'(হে রসূল!) যদি আপনি এ মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ليعبدون শব্দটির অর্থ হলো, বিনীত হওয়া, অর্থাৎ মানুষ যেন আমার নিকট বিনয় প্রকাশ করে, আমার অনুগত হয়, কেননা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার অর্থই হলো, সৃষ্টি মাত্রকে তার স্রষ্টার সকল সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে গ্রহণ করা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে এবাদতের কথা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য হলো তৌহীদে বিশ্বাস করা। মোমেন মাত্রই সুখে-দুঃখে এক আল্লাহ পাককেই ডাকে, সুখ-দুঃখে, আরাম-আয়েশে মর্দে মোমেন কেবলমাত্র আল্লাহ পাককেই ডাকে আর কাউকে নয়, কিন্তু কাফেররা চরম বিপদের মুখোমুখি হলেই শুধু আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

'যখন তারা তরীতে আরোহণ করে, (সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ দেখে ভীত হয়) তখন তারা নিতান্ত একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ পাককে ডাকে'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) এ পর্যায়ে এবাদতের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই অধিকতর সঠিক মনে হয়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

فكل ميسر لما خلق له

(প্রত্যেকের জন্যে সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়, যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।)

অর্থাৎ যাকে যে কাজের জন্যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের তওফিক দান করেন।

এজন্যে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি জ্বীন ও মানুষকে এবাদত করার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার যোগ্যতা রয়েছে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেকটি শিশুই স্বভাবগতভাবে ইসলামের উপর পয়দা হয়। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান বা অগ্নিপূজক রূপে গড়ে তোলে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১১০-১১

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের এবাদতের মূলকথা দু'টি, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা এবং আল্লাহ পাকের সৃষ্টির প্রতি দয়া করা।[১]

মূলতঃ এ দু'টি কর্মপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা সম্ভব হয়। ইসলামী শরীয়তের প্রত্যেকটি কথাই আল্লাহ পাকের নির্দেশ, অতএব শরীয়ত মোতাবেক জীবন-যাপন করা এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা সম্ভবপর হয়।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীর মধ্যে তাঁর কোন স্বার্থ নেই, এতে তাঁর কোন উপকারও নেই, তিনি সর্বশক্তিমান, স্বয়ং প্রশংসিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, এজন্যে হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছে, যদি সমগ্র বিশ্ব মানব আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হয়, তবুও তাঁর কণামাত্র ক্ষতি করতে সক্ষম হয়না, আর যদি সমগ্র মানব জাতি সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকে, তাতেও তাঁর খোদায়ীতে এতটুকুও বাড়েনা। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে মানুষকে বন্দেগীর আদেশ কেন দেয়া হয়েছে? এর উত্তরে বলা যায়, মানুষকে আল্লাহ পাকের করুণা-ধন্য হবার জন্যেই তাঁর বন্দেগী করার আদেশ দেয়া হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করতে চান, পরকালীন জিন্দেগীতে পরম সাফল্য দান করতে চান, এ উদ্দেশ্যেই বন্দেগীর আদেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করবে, তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবেনা, আল্লাহ পাক তাঁকে আখেরাতে অনন্ত অসীম নেয়ামত দানে ধন্য করবেন। পক্ষান্তরে, যে শেরক করবে, তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হবে, তার জন্যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

কোন কোন আসমানী কিতাবে রয়েছে, হে বণী আদম! আমি তোমাকে আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি, অতএব তুমি এতে গাফলত করোনা, তোমাদের রিয্কের দায়িত্ব আমি নিয়েছি। তুমি আমার অন্বেষন কর, যেন আমাকে পেয়ে যাও, যদি তুমি আমাকে পাও, তবে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস কর যে, তুমি সব কিছু পেয়েছ, আর যদি তুমি আমাকে না পাও তবে মনে রেখ, তুমি যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছ। শ্রবণ কর তোমার অন্তরে সব কিছুর চেয়ে অধিকতর মহব্বত আমার জন্যে হতে হবে।[২]

মূলতঃ এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ

'আমি তাদের নিকট থেকে রিয্ক কামনা করিনা, আর তারা আমার আহার্য সংগ্রহ করুক, তা-ও আমার কাম্য নয়'।

১। তফসীরে কবির, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-২৩৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৬-৭

কেননা, আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, মানব দানব এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতের রিজক আল্লাহ পাক নিজেই সরবরাহ করে থাকেন। তাই বন্দার নিকট তাঁর চাওয়ার কিছুই নেই। তিনিই মহান রিয্কদাতা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাকই রিয্ক দাতা, তিনি পরম শক্তিশালী এবং সুশক্ত ও সুকঠিন'।

একথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাঁর বন্দাদের সম্পর্ক এমন নয়, যেমন মুনীব এবং গোলামের মধ্যে থাকে। সাধারণতঃ মুনীবেরা চায় গোলাম তার জন্যে রোজগার করে এনে হাযির করুক। কিন্তু আল্লাহ পাক সকল প্রয়োজনের উর্দ্ধে, সকল দুর্বলতা থেকে তিনি পবিত্র; তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন। আর যেহেতু তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী, তাই কারো রিয্ক পৌঁছানো তাঁর জন্যে কঠিন কিছু নয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের শুরুতে قل শব্দটি উহ্য রয়েছে, এর অর্থ হলো (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে তাঁর মহান বাণী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন অর্থ-সম্পদ চাইনা এবং তোমরা আমার পানাহারের ব্যবস্থা কর তা-ও আমার কাম্য নয়, কেননা আল্লাহ পাক মহান, সর্বশক্তিমান, রিয্কদাতা, তিনি সকলের রিয্ক সরবরাহ করেন তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতের এ মর্মটি অন্য আয়াতেও রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا

'আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রকার বিনিময় চাইনা'।[১]

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ

'এ পাপীষ্ঠদেরও প্রাপ্য তাই, যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে'।

অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সব অবাধ্য কাফের জাতি তাদের নাফরমানীর কারণে কোপগ্রস্ত হয়েছে যেমন আদ, সামুদ জাতি, লুত জাতি, নূহ জাতি গং, মক্কাবাসী কাফেরদেরও অনুরূপ শাস্তিই ভোগ করতে হবে। তাদের পাপাচারের ভরা ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। অতএব, তাদের শাস্তি জন্যে তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই, যথা নিয়মে এবং যথা সময়ে তাদের শাস্তির অবশ্যই হবে, এতে হযরত রসূলে করীম

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১১৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মজলুম মুসলমানগণকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, দূরাত্মা কাফেরদের শাস্তি অনিবার্য এবং নির্ধারিত সময়েই তা আসবে। যেহেতু কাফেররা আখেরাতকে অবিশ্বাস করতো, আল্লাহ্ পাকের আযাবের কথা বললে তারা বিদ্রুপ করে বলতো,

مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল, আজাবের ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে', তারই জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ

আযাবের জন্যে তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই, যথা সময়েই তা আসবে, এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আলোচ্য আয়াতাংশের খেতাব হবে কাফেরদের সঙ্গে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ

সেদিনের আগমনে কাফেরদের সর্বনাশ অবধারিত, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন, কাফেররা যদি এতদসত্ত্বেও ঈমান না আনে, সত্যকে গ্রহণ না করে তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, যে কঠিন ভয়ংকর দিনের কথা তাদেরকে বলা হয়েছে অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সেদিন তারা কঠিন আযাব ভোগ করবে, কোন অবস্থাতেই তাদের রেহাই নেই।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের يوم তথা দিন বলতে বদরের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা বদরের দিন মক্কার কাফেরদেরকে চরম শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, يوم শব্দ দ্বারা কেয়ামতের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২০
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তূর

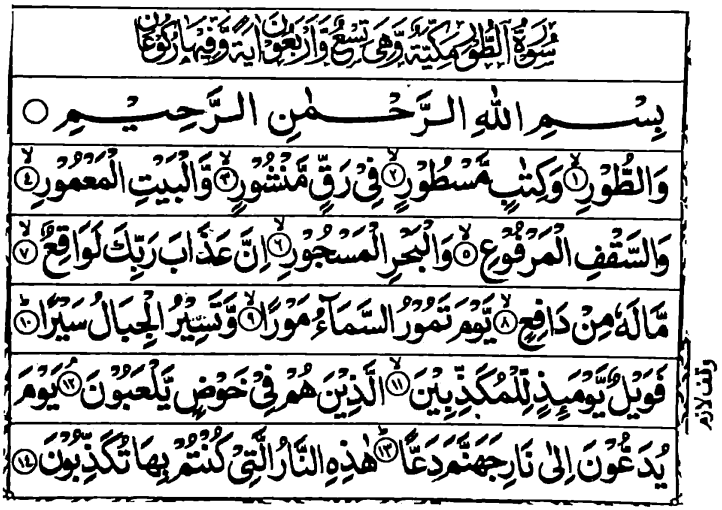
سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٢ يَوْمَ

يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝١٤

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) শপথ তূর পর্বতের,

(২) এবং শপথ লিখিত কিতাবের,

(৩) যা উন্মুক্ত কাগজে রয়েছে (আমলনামা)।

(৪) শপথ বায়তুল মা'মুরের,

(৫) শপথ সমুন্নত ছাদের,

(৬) এবং শপথ ফুটন্ত সমুদ্রের।

(৭) নিশ্চয় (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যম্ভাবী,

(৮) কেউ তাকে ঠেকাতে পারবেনা।

(৯) যেদিন আকাশ প্রবলভাবে কাঁপতে থাকবে,

(১০) এবং পাহাড় পর্বত চলতে থাকবে দ্রুতবেগে।

(১১) সেদিন মিথ্যাজ্ঞানকারীদের চরম দুর্ভোগ হবে,

(১২) যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে অনর্থক ভাবে লিপ্ত থাকে।

(১৩) যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে দোযখের দিকে নেয়া হবে।

(১৪) এটি সে দোযখই, যা তোমরা মিথ্যা বলে মনে করতে।

সূরা তূর প্রসঙ্গে

সূরা তূর মক্কায় অবতীর্ণ, এতে ৪৯ আয়াত, ৩১২ বাক্য ও ১,৫০০টি অক্ষর রয়েছে। এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা তূর মক্কায় নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

হযরত জোবায়ের এবনে মোতয়েম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, আমি নিজেই শ্রবণ করেছি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করেছেন।[১]

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, কিছুদিন পর ঐ সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হবে, অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি কা'বা শরীফের নিকট বসবাস করবে।

এ সূরার আমল

যদি কোন বন্দী ব্যক্তি সর্বদা এ সূরা পাঠ করে, তবে অতি সত্বর রেহাই পাবে। এমনিভাবে, যদি কোন ভ্রমণরত ব্যক্তি সর্বদা এ সূরা পাঠ করতে থাকে, তবে সে সফরে নিরাপদ থাকবে।

নামকরণ

এ সূরার বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তূর পর্বতের শপথ দ্বারা, এজন্যে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা তূর।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, (এক) পরকালীন জীবনের সত্যতা (দুই) সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী (তিন)

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৭

সত্য-সাধকদের জন্যে পুরষ্কারের শুভ সংবাদ। এর পাশাপাশি রয়েছে তওহীদ ও রেসালতের আলোচনা এবং কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতার উল্লেখ। সূরার শুরুতেই পাঁচটি বস্তুর শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছেঃ পরকালীন জীবনে পাপীষ্ঠদের শাস্তি অনিবার্য, কেউ তা ঠেকাতে পারবেনা। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ একথার সাক্ষী যে, প্রত্যেকটি মানুষকে অবশেষে তার কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে, মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এ সূরার শুরুতেই আল্লাহ পাকের অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

وَالطُّوْرِ

'শপথ তূর পর্বতের'।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, যে পর্বতে বৃক্ষ থাকে তাকে "তূর" বলা হয়, আর যে পর্বতে বৃক্ষ থাকেনা, তাকে "জবল" বলা হয়।

অভিধাণ বেত্তা ইমাম রাগেব বলেছেন, যে কোন পাহাড়েরই নাম তূর হতে পারে, তবে তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য আয়াতে তূর শব্দটি দ্বারা সে পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ

"এবং লিখিত কিতাব" অর্থাৎ লওহে মাহফুজ, প্রত্যেকটি মানুষের আমলনামা, পবিত্র কোরআন ও তৌরাত এসবই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে।

فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ

যা উন্মুক্ত কাগজে রয়েছে, ফলে সকলে পাঠ করতে পারে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ

বয়তুল মা'মুরের অবস্থান

বয়তুল মা'মুর- "আবাদ ঘর"। এর দ্বারা কা'বা শরীফ এবং কা'বা শরীফের সরাসরি উর্দ্ধে ফেরেশতাদের এবাদতের জন্যে বয়তুল মা'মুর রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে মরদবিয়া, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি

এরশাদ করেছেন, বয়তুল মা'মুর রয়েছে সপ্তম আসমানে, প্রতি দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বয়তুল মা'মুরে হাযির হয়, তারা আর কোন দিন ফিরে আসেনা, অর্থাৎ প্রতিদিনই নুতন সত্তর হাজার ফেরেশতা সেখানে এবাদতে মশগুল থাকে। এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।[১]

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত মে'রাজ সম্পর্কীয় হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখেছি, তিনি বয়তুল মা'মুরের সঙ্গে হেলান দিয়ে রয়েছেন, বয়তুল মা'মুরে প্রতি দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদতের জন্যে প্রবেশ করে, তারা পুনরায় আর কখনো আসেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) এর বর্ণনায় রয়েছে, ফেরেশতাগণ বয়তুল মা'মুরের তওয়াফ করে এবং তার ভেতরে নামাজ আদায় করে, এরপর আর কখনো আসেনা। সর্বক্ষণ ফেরেশতাগণ সেখানে ছড়িয়ে থাকে।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, বয়তুল মা'মুর বলে এ স্থলে কা'বা শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা হজ্জ, ওমরা পালনকারী, এ'তেকাফকারীদের দ্বারা কা'বা শরীফ সর্বক্ষণ আবাদ থাকে।

অথবা বয়তুল মা'মুর শব্দটি দ্বারা মোমেনের অন্তরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত এবং এখলাস দ্বারা মোমেনের অন্তর পরিপূর্ণ থাকে।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলো, বয়তুল মা'মুর কি? তিনি বললেন, তা আসমানে রয়েছে কা'বা শরীফের ঠিক উপরে। যেভাবে যমীনের কা'বা সম্মানিত স্থান, ঠিক তেমনি বয়তুল মা'মুরও আসমানে সম্মানিত স্থান, প্রতিদিন তাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে। যে ফেরেশতা আজ এ দায়িত্ব পালন করলো, কেয়ামত পর্যন্ত সে আর কখনো এ সুযোগ পাবেনা, কেননা ফেরেশতাগণের সংখ্যাই এত অধিক।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বয়তুল মা'মুর সম্পর্কে জান? তারা জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই জানেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তা হলো আসমানী কা'বা, যমিনী কা'বার ঠিক উপরেই অবস্থিত, যদি তা নীচে পড়ে, তবে কা'বা শরীফের উপরই পড়বে। তাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামাজ আদায় করে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আসবেনা।[২]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৯
২। তফসীরে ইবনে কাসীর, (উর্দু)পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৯

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ

উঁচু ছাদ, এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

(এক) নীলাভ আকাশ যা পৃথিবীর ওপরে কোন খুঁটি ব্যতীতই আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতে স্থাপিত হয়েছে।

(দুই) বেহেশতের উপরে আরশে এলাহী স্থাপিত রয়েছে, তার প্রতিও ইঙ্গিত করা হতে পারে।

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ

(এবং ফুটন্ত সমুদ্রের)

সমুদ্রগুলো দোযখে পরিণত হবে

মোহাম্মদ এবনে কা'ব এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোকে অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এ মত পোষণ করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক সাগর-মহাসাগরগুলোকে অগ্নিকুন্ডে রূপান্তরিত করবেন, এর পরিণতিতে দোযখের অগ্নি আরো বৃদ্ধি পাবে।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন এ মর্মে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জেহাদ, হজ্ব এবং ওমরা ব্যতীত কোন ব্যক্তি যেন সমুদ্রের সফর না করে, কেননা সমুদ্রের নীচে অগ্নি রয়েছে, অথবা তিনি বলেছেন, অগ্নির নীচে সমুদ্র রয়েছে।

হযরত ইয়ালা এবনে উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমুদ্র হলো দোযখ।

আবুশ শেখ এবং বায়হাকী সায়ীদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি অমুক ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর সত্যবাদী কোন ইহুদীকে দেখিনি, সে আমাকে বলেছিল, আল্লাহ্ পাকের বিরাট অগ্নিকুন্ড হলো সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রগুলো অবশেষে অগ্নিকুন্ডে রূপান্তরিত হবে। যখন কেয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ্ পাক চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জকে একত্রিত করবেন অর্থাৎ এগুলোকে সাগর-মহাসাগরে নিক্ষেপ করবেন। এভাবে সকল সাগর-মহাসাগর দোযখে পরিণত হবে।

কালবী (রঃ) বলেছেন, "মাসজুর" অর্থ হলো পরিপূর্ণ, আর হাসান, কাতাদা এবং আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, "মাসজুর" অর্থ হলো শুষ্ক, অর্থাৎ সমুদ্রের পানি

শুষ্ক হয়ে যাবে। আর রবী এবনে আনাস (রঃ) বলেছেন, তখন সমুদ্রের মিঠা পানি এবং লবনাক্ত পানি একাকার হয়ে যাবে, আর এ অবস্থাকেই "মাসজুর" বলা হয়েছে।

আলী এবনে বদর বলেছেন, সাগর-মহাসাগর গুলোকে "বাহরে মাসজুর" এজন্যে বলা হয়েছে যে, তার পানি পান করা যায় না, আর তা দ্বারা কৃষিকাজও হয়না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বাহরে মাসজুর বলা হয় বাহরে মা'কুফ কে, অর্থাৎ যে পানিকে স্থবির করে রাখা হয়েছে।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রঃ)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এমন কোন রাত হয়না, যে রাতে সাগরগুলো তিনবার আল্লাহ পাকের দরবারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করেনা, এ মর্মে যে অনুমতি হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নিমজ্জিত করে দেই। কিন্তু আল্লাহ পাক এমন কাজ করা থেকে সমুদ্রগুলোকে বিরত রাখেন, আর তাদের নির্দিষ্ট সীমা লংঘনের অনুমতি দেন না।[১]

যাহ্যাক (রঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বাহরে মাসজুর হলো মহান আরশের নীচে স্থাপিত একটি সাগর, সাত আসমান সাত যমীনের মধ্যে যতখানি দূরত্ব রয়েছে, এ সমুদ্রের গভীরতা ততখানি। এ সমুদ্রকে "বাহরে হায়ওয়ান" বলা হয়। যখন হযরত ইস্রাফীল (আঃ) প্রথম শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন ৪০ দিন সকালে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ঐ সমুদ্র থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যে কারণে লোকেরা নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে আসবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)-ও এ মত পোষণ করতেন।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ

'নিশ্চয় (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যম্ভাবী, কেউ তাকে ঠেকাতে পারবেনা'।

একথাটিকে আল্লাহ পাক তাঁর বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি সমূহের শপথ করে বলেছেন, যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ থাকে, তারা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই পাবেনা, আর এ ঘোষণাটি করা হয়েছে তূর পর্বত, লওহে মাহফুজ, বয়তুল মা'মুর এবং আকাশ মন্ডলী ও ফুটন্ত সাগর সমূহ প্রভৃতির শপথ করে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৩৭

আয়াতের অন্য এটি ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, "তূর" শব্দটি দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্বার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদায়, ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বে সুউচ্চ পর্বততুল্য, আর সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে তিনি ছিলেন আলোর কেন্দ্র। তাঁর আলোক ধারায় সমগ্র মানব জাতির অন্তর আলোকিত হয়েছে এবং হতে থাকবে। আর "কিতাবে মাসতুর" দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গভীর জ্ঞান-গরিমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা লক্ষ লক্ষ লোক লিপিবদ্ধ এবং কণ্ঠস্ত করেছে এবং করছে। কেননা তিনি এরশাদ করেছেন,

اوتيت علم الاولين والاخرين

"পূর্বাপর লোকদের সমস্ত এলম আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাকে দান করা হয়েছে"।

আর বয়তুল মা'মুর দ্বারাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর السقف المرفوع দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ শান এবং মর্তবার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং والبحرالمسجور দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জ্ঞান-সমুদ্রের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এসব কিছুর শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বেঈমান নাফরমানদের প্রতি অবশ্যই আযাব আপতিত হবে। ঐ আযাবকে ঠেকাতে পারে, এমন শক্তি কারোই নাই।

হযরত যোবায়ের এবনে মোতএমের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

হযরত যোবায়ের এবনে মোতএম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বদরের যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে কথা বলার জন্যে মদীনা মোনাওয়্যারায় হাযির হই। আমাকে যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি মাগরিবের নামাজ আদায় করছিলেন, মসজিদ থেকে তাঁর পবিত্র কোরআন পাঠের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তিনি সূরা তূরের আলোচ্য আয়াত পাঠ করছিলেন। যখন তিনি مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ (ঐ আযাবকে কেউ ঠেকাতে পারবেনা) পাঠ করছিলেন তখন ভয়ে আমার অন্তর কাঁপতে লাগল, আমি তখনও মুসলমান হইনি, আয়াত খানি শ্রবণ করার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, এ স্থান থেকে উঠবার পূর্বেই আমার প্রতি আযাব আপতিত হবে, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করলাম।

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۞ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا

'যেদিন আকাশ প্রবলভাবে কাঁপতে থাকবে এবং দ্রুতবেগে পাহাড় পর্বত চলতে থাকবে, সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের চরম দুর্ভোগ'।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) مور শব্দটির তর্জমা করেছেন, আসমান নড়াচড়া করবে। আর আতা খোরাসানী বলেছেন, আসমানের এক অংশ অন্য অংশের আগে পরে যাবে আর পাহাড় সমূহ চলাচল করতে থাকবে। সেদিন এ কাফেরদের দুর্ভোগ হবে। যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে, খেলা-ধূলায়, গান-বাজনায়, গল্প-গুজবে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর ব্যাপারে গাফেল থাকে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা, সেদিন তারা চরম শাস্তি ভোগ করবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ

অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনে হাশরের দিনকে অস্বীকার করেছিল, কেয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করেছিল এবং খেলাধূলায় মত্ত থেকে মহাসত্যকে অস্বীকার করেছিল, তারা সেদিন কঠিন-কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا- هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

'সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে দোযখের দিকে নেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, এটি সে দোযখই, যাকে তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করতে'।

যারা দুনিয়াতে ইসলামকে বিদ্রুপ করতো, ইসলামের বিধি-নিষেধকে অমান্য করতো তাদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ কাফের মুরতাদদেরকে গলাধাক্কা দিয়ে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে এবং দোযখের কাছে নিয়ে বলবে, এটি সে দোযখই, যার সত্যতা তোমরা অস্বীকার করতে, এখন তার শাস্তি ভোগ কর।

হযরত ওমর (রাঃ) অসুস্থ হলেন

হাফেজ এবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) এক রাতে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে বের হলেন। এক ব্যক্তি তাঁর গৃহে তাহাজ্জুদের নামাজে সূরা তূরের আলোচ্য আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করছিল, হযরত ওমর (রাঃ) যখন এ আয়াত اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ শ্রবণ করলেন, তখন একটি চিৎকার দিলেন এবং বললেন, শপথ! কা'বা শরীফের প্রতিপালকের, মনে হয় কোমর ভেঙ্গে গেছে। এরপর তিনি ঐ গৃহের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। অনেকক্ষণ পর যখন তিনি প্রকৃতস্থ হলেন তখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ আয়াতের

ভয়াবহতার প্রতিক্রিয়া তাঁর অন্তরে এত বেশী হয়েছিল যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এভাবে সুদীর্ঘ এক মাস যাবত তিনি অসুস্থ রইলেন। অনেক লোক তাঁকে দেখতে আসত, কিন্তু তারা জানত না তাঁর কী রোগ হয়েছে?

শপথের তাৎপর্য

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত সমূহে পাঁচটি বিরাট বিস্ময়কর গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির শপথ করে ঘোষণা করেছেন যে, আখেরাতে বেঈমান নাফরমানদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (১) কোহেতূর (২) কিতাবে মাসতুর (৩) বয়তুল মা'মুর, (৪) সাকফে মারফু, (৫) বাহরে মাসজুর। এসব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার পর এ সত্যে বিশ্বাস করতে কোন বুদ্ধিমান মানুষেরই বিলম্ব হয়না যে, যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থান এবং কেয়ামত অনুষ্ঠান আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। আর কেয়ামত কায়েম হবে ঈমানদর ও নেককারদের পুরষ্কার এবং বেঈমান ও নাফরমানদের শাস্তি ঘোষণার জন্যে। কেয়ামতের দিনই প্রত্যেকটি মানুষকে তার সারা জীবনের কৃতকর্মের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা বা শ্বেতপত্র দেয়া হবে। ঈমানদার ও নেককার হলে ডান হাতে এবং বেঈমান ও বদকার হলে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوٓا أَوْ لَا
تَصْبِرُوا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۖ وَوَقَىٰهُمْ
رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ
أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৫) তবে এটি কি যাদু? (স্বচক্ষে দেখে বল) অথবা তোমরা কি দেখছ না?

(১৬) এতে প্রবেশ কর, তোমরা সবর অবলম্বন করতে পার অথবা না পার- উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান। (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যা কিছু করতে, তারই বদলা তোমরা পাবে।

(১৭) নিশ্চয় পরহেযগারগণ জান্নাতে এবং সুখ-সম্পদে থাকবে।

(১৮) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দান করবেন তারা তা উপভোগ করবে, আর তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন দোযখের আযাব থেকে।

(১৯) মনের সুখে তোমরা পানাহার করতে থাক, তোমাদের আমলেরই শুভ পরিণতি স্বরূপ।

(২০) সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো আরাম কেদারায় তারা হেলান দিয়ে বসবে, আর আমি তাদেরকে ডাগর চোখা জান্নাতী হুরদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি।

(২১) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের সন্তান-সন্ততীগণও ঈমানে তাদের অনুগামী হয়েছে। আমি তাদের সন্তান-সন্ততীদেরকে (মর্যাদায়) তাদের সাথে শামিল করবো। এবং আমি তাদের কর্মফল কিছুমাত্রও কম করবোনা। (কাফেরদের) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আমলের কারণে (দোযখে) আবদ্ধ থাকবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, প্রত্যেক দূরাত্মা কাফেরকে গলাধাক্কা দিয়ে দোযখের পার্শ্বে নিয়ে হাযির করা হবে এবং দোযখকে দেখিয়ে বলা হবে, এটিই সেই দোযখ, যাকে তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করতে।

اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, দুনিয়ার জীবনে তোমরা নবী রসূলগণকে যাদুকর বলতে, তাদের উপদেশকে তোমরা যাদু মন্ত্র বলে উড়িয়ে দিতে, তাই আজ জিজ্ঞাসা করি, এটি কি যাদু? প্রকৃত অবস্থা তোমরা নিজরা দেখে বল, অথবা তোমরা কি কিছুই দেখতে পাওনা? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীকে তখন তোমরা যাদু মন্ত্র বলতে এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীকে তোমরা যাদুকর বলতে, এখন তোমাদের সম্মুখে সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এখন বল এটি কি যাদু? নাকি তোমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছ না? যেমন দুনিয়ার জীবনে নবীর মোজেযা দেখেও দেখনি, এখনও কি তোমাদের সে অবস্থা? এরপর আদেশ হবে,

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ

এতে প্রবেশ কর, তোমরা সবর অবলম্বন করতে পার অথবা না পার-উভয়ই তোমাদের জন্যে সমান, কেননা চিরদিন তোমাদেরকে দোযখের অগ্নিকুন্ডে থাকতে হবে, কখনো দোযখ থেকে তোমাদের নাজাত নেই এবং শাস্তি লাঘব করারও কোন পন্থা নেই।

اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

(দুনিয়ার জীবনে) তোমরা যা কিছু করতে, তারই বদলা তোমরা পাবে। কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে সতর্ক করা হয়েছে। সে সতর্কবাণীর পরিপন্থী কিছুই হবেনা, আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট শাস্তিরও পরিবর্তন হবেনা। আর এটি আল্লাহ পাকের জুলুম নয়; বরং শুধু তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় মাত্র, আর এ বিনিময় হবে ন্যায় ভিত্তিক, তাই দোযখের অগ্নিকুন্ডের শাস্তিতে তোমরা ধৈর্যধারণ করতে পার কি না পার তাতে কিছুই যায় আসেনা। দোযখের শাস্তির কারণে তোমরা যদি চিৎকার হাহাকার কর তবে তোমাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা, আর যদি নীরবে শাস্তি ভোগ কর তবু কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন করা হবেনা। যেহেতু তোমাদের অপরাধ হলো কুফর ও নাফরমানী তাই তোমাদের শাস্তি হবে চিরদিন। আর একথা মনে রেখ, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হয় তা তোমাদের প্রাপ্য ছিল, যা তোমাদের প্রাপ্য নয় এমন শাস্তি আদৌ দেয়া হচ্ছেনা।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

'নিশ্চয় পরহেযগারগণ জান্নাতে এবং সুখ সম্পদে থাকবে'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বেঈমান ও নাফরমানদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে ঈমানদার ও পরহেযগার লোকদের পুরষ্কারের ঘোষণা স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমানদার পরহেযগার তারা জান্নাতে এবং সুখ-সম্পদে থাকবে, শুধু ঈমানদার হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং ঈমানের দাবী মোতাবেক পরহেযগার হওয়া একান্ত জরুরী। এ কথাটির দু'টি অংশ রয়েছে, (১) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার কারণে আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধান সমূহ যত্নসহকারে মেনে চলতে হয়। (২) আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকতে হয়। এটিই হলো ঈমানের দাবী, আর এ দাবী পালন করার মাধ্যমেই পরহেযগারী অবলম্বন করা যায়। আলোচ্য আয়াতে এমন পরহেযগারদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছে যে, যারা মুত্তাকী, পরহেযগার হবে তারা জান্নাতের বাগানে পরম সুখে-শান্তিতে আনন্দ উল্লাসে বাস করবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে জীবনের সত্য-সাধনার বিনিময়ে যা দান করবেন তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। আল্লাহ পাক যা দান করবেন তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করবেন।

দ্বিতীয়তঃ একথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের পরওয়ারদেগার যা দান করবেন তা হবে মহান দাতা স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে, তাই তাঁর

নেয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাতীত। তদুপরি অনন্ত অসীম নেয়ামতের এ ঘোষণার পাশাপাশি আরো একটি বিশেষ ঘোষণা রয়েছে তা হলোঃ

وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

'আর তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন দোযখের আযাব থেকে'।

দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত বড় নেয়ামত এবং জান্নাতের নেয়ামত সমূহের কোন সীমা নেই। এমন নেয়ামত যা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি এবং এ নেয়ামত সমূহের নামও কেউ শোনেনি আর কেউ তা কল্পনাও করেনি।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'মনের সুখে তোমরা পানাহার করতে থাক, তোমাদের আমলেরই বিনিময় স্বরূপ'।

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত থাকত এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকত, আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে সর্বদা নিরত থাকত এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতো, তাদের জন্যে অন্যান্য নেয়ামতের পাশাপাশি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের আনন্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদেরকে বলা হবে, মনের সুখে তোমরা পানাহার করতে থাক, বেহেস্তের আনন্দ ভোগ করতে থাক। রকমারী খাদ্য-দ্রব্য, উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামত সমূহ তাদেরকে প্রদান করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যত ইচ্ছা তোমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ ভোগ করতে থাক, কোন প্রকার ভয় নেই, এ নেয়ামত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই, কোন প্রকার কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করবেনা। দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের সম্পর্কে তোমাদের যে দুশ্চিন্তা ছিল এবং আখেরাতের জন্যে তোমরা নেক আমলের যে সাধনা করেছ, তার শুভ-পরিণতি এখন ভোগ কর।

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

'সারিবদ্ধভাবে সাজানো আরাম কেদারায় তারা হেলান দিয়ে বসবে, আর আমি তাদেরকে ডাগর চোখা জান্নাতী হুরদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি'।

অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসবে, আনন্দ উল্লাসে থাকবে, নিশ্চিন্ত মন, আরাম-আয়েশের যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী, অগণিত নেয়ামত সমূহ বর্তমান, এর পাশাপাশি পান পাত্র নিয়ে হুর গেলমানগণ ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষমান থাকবে। যেখানে চাওয়ার আগে সব কিছু পাওয়া যায়, সেই জান্নাতের অকল্পনীয় সুখ-শান্তি ভোগ করবেন জান্নাতীগণ, এর সাথে সাথে ডাগর চোখা হুরগণের সঙ্গে

জান্নাতবাসীগণের বিয়ে হবে, সবার উপরে জান্নাতীগণ লাভ করবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সান্নিধ্য, এর চেয়ে বাড়তি আর কী চাই!

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, জান্নাতবাসীগণ কি একে অন্যের সঙ্গে মোলাকাত করবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যিনি আমাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তারা অবশ্যই একে অন্যের সঙ্গে মোলাকাত করবে। যারা উচ্চ মর্যাদায় থাকবে, তারা তাদের থেকে নিম্ন মর্যাদার লোকদের সঙ্গে মোলাকাত করবে। কিন্তু যারা নিম্নস্তরে থাকবে, তারা উপরের স্তরের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেনা। তাদের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবেনা, সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকবে।[১]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

'আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের সন্তান-সন্ততীগণ ঈমানে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততীদেরকে তাদের সাথে শামিল করবো'।

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাঁর অনন্ত অসীম দয়া মায়ার কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেন, যে সব মোমেনগণ জান্নাতের অধিবাসী হবে, তাদের সুখ-শান্তির পাশাপাশি নিজেদের সন্তান-সন্ততীর সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষাও থাকবে, আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতীগণ তাদের সন্তান সন্ততীদের সাথে মিলিত হতে পারবে, তবে শর্ত হলো, তাদের সন্তান সন্ততীকেও ঈমানদার হতে হবে, ঈমানদার অবস্থায় তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে এবং পিতা-মাতার আদর্শের সঠিক অনুসারী হতে হবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে, কোন জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পর যখন পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে দেখবেনা তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, তারা কোথায়? জবাব দেয়া হবে তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, তখন ঐ ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আমি তো নিজের জন্যে এবং তাদের জন্যে নেক আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদেশ হবে, সন্তান-সন্ততীদেরকেও এ ব্যক্তির মর্তবায় পৌঁছে দেয়া হোক।[২]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩১
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১২

বস্তুতঃ পিতা-মাতার বদৌলতে সন্তান-সন্ততীগণও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। পিতা-মাতার নেকী কম করা হবেনা; বরং সন্তান-সন্ততীর নেকী বাড়িয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক মোমেনদের নয়ন মনের তৃপ্তির জন্যে তাদের সন্তান সন্ততীর মর্তবা বাড়িয়ে দেবেন।

এভাবে তাদেরকে একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হবে, নেককার মোমেনদের জন্যে এটিই হবে আল্লাহ পাকের বিশেষ দান।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত খাদীজা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর সে দু'টি সন্তানের কি অবস্থা হবে, যাদের মৃত্যু হয়েছে প্রাক-ইসলামী যুগে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তারা দোযখে থাকবে। একথা শ্রবণ করে হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর চেহারায় দুশ্চিন্তার ভাব পরিলক্ষিত হলে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি তুমি তাদেরকে দেখতে তবে তাদের প্রতি তোমার ঘৃণা হতো। এরপর হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আমার যে সন্তান আপনার তরফ থেকে হয়েছে, তাদের কি অবস্থা? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা জান্নাতে থাকবে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

কিছুদিন পর হযরত খাদীজা (রাঃ) পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একই প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকই ভাল জানেন যে, তারা যদি জীবিত থাকত তবে কি করতো?

আরো কিছু দিন পর হযরত খাদীজা (রাঃ) পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন, তখন এ আয়াত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (একে অন্যের ভার বহন করবেনা) নাযিল হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, তারা স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরই থাকবে, অথবা তিনি বলেছেন, তারা জান্নাতে থাকবে।

এবনে আবি শায়বা হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট মানব সন্তানদের সেই শিশুদের সম্পর্কে আরজী পেশ করেছি, যারা খেলাধূলার বয়সের ছিল, (অর্থাৎ যারা অতি অল্প বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে) আল্লাহ পাক আমায় তাদেরকে দান করেছেন (অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

এবনে জরীর লিখেছেন, হযরত সামুরা (রাঃ) বলেছেন, আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরেকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি এরশাদ করেছেন, তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে। এবনে জরীর এ মর্মের হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর তরফ থেকেও বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মুশরেকদের শিশু সন্তানদের পরীক্ষা করা হবে, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকই জানেন, তারা (যৌবন লাভের পর) কি করতো?[১]

وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ মোমেন পিতা-মাতার সন্তানদেরকে তাদের নিকট আনার জন্যে পিতা-মাতার সওয়াব কম করা হবেনা; বরং সন্তানদের মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

'(কাফেরদের) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আমলের কারণে (দোযখে) আবদ্ধ থাকবে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেন এবং তাদের আওলাদ সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে, আর এ আয়াতে কাফেরদের সন্তানদের পরিণতি সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে প্রত্যেকে তার কুফর ও নাফরমানীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে "প্রত্যেক ব্যক্তি" বলে প্রত্যেক কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর প্রত্যেক কাফের তার শেরকের শাস্তি স্বরূপ দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। তবে কাফেরদের এ শাস্তি অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। অতএব, কাফের ও ফাসেকদের অপরাধের জন্যে তাদের সন্তানরা শাস্তি ভোগ করবেনা। প্রত্যেকেই নিজের আমলের পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে। এটিই হবে কেয়ামতের দিনের বিচার-নীতি। আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

"যে কণা-মাত্র নেক আমল করবে, সে তার পুরস্কার অবশ্যই দেখতে পাবে, আর যে কণা-মাত্র মন্দ কাজ করবে সে-ও তার কৃতকর্মের শাস্তি দেখতে পাবে"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২০-২১

وَأَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا
كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ
كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالُوْٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ
اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
نَدْعُوْهُ ۖ إِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ
الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২২) আর আমি তাদেরকে (বেহেশতবাসীগণকে) দান করবো ফলমূল ও গোশ্ত প্রভৃতি, যা তারা পছন্দ করে।

(২৩) সেখানে তারা পানপাত্র অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে নেবে, যা পান করলে কেউ অসার কথা বলবেনা এবং পাপকার্যেও লিপ্ত হবেনা।

(২৪) তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়।

(২৫) তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে কথা-বার্তা বলবে।

(২৬) তারা বলবে, আমরা তো ইতিপূর্বে নিজেদের গৃহে (দুনিয়ার জীবনে আমাদের পরিণাম সম্পর্কে) ভীত থাকতাম।

(২৭) তাই আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন।

(২৮) আমরা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে তাঁকে ডাকতাম, (তাঁর নিকট দোয়া করতাম) নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত বড় অনুগ্রহশীল, অতীব দয়াবান।

(২৯) (হে রসূল!) আপনি মানুষকে উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আপনি গণক নন এবং উন্মাদও নন।

(৩০) তবে কি তারা বলে তিনি একজন কবি, আমরা তাঁর ব্যাপারে কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছি।

(৩১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও বেহেশতবাসীগণের জন্যে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত সংরক্ষিত রয়েছে তার কিছুটা বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

'আর আমি তাদেরকে (বেহেশতবাসীগণকে) দান করবো ফলমূল ও গোশ্ত প্রভৃতি, যা তারা পছন্দ করে'।

অর্থাৎ যাবতীয় খাদ্য সম্ভার আল্লাহ পাক বেহেশতবাসীগণকে দান করবেন, যে খাদ্য তাদের একান্ত পছন্দনীয়, তা তাদেরকে দান করা হবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, আল্লাহ পাক মুত্তাকী পরহেযগার লোকদেরকে যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্য, ফলমূল দান করবেন এবং তাদেরকে পানীয় সরবরাহ করা হবে। তাদের আনন্দ উল্লাসের সীমা থাকবেনা, যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে তা তারা পাবে।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ

বেহেশতে তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পরস্পর কাড়াকাড়ি করে পানপাত্র গ্রহণ করবে। দুনিয়াতে সুরা পান করলে মানুষ মাতাল হয়, পাপকার্যে লিপ্ত হয়, বেহেশতের পবিত্র পানীয়ে এমন কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া থাকবেনা।

আলোচ্য আয়াতের لغو শব্দের ব্যাখ্যায় কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো বাতিল।

মোকাতেল এবনে হাব্বান বলেছেন, এর অর্থ হলো অহেতুক এবং নিরর্থক কথাবার্তা।

সায়ীদ এবনে মুসায়্যেব (রঃ) এর অর্থ বলেছেন, বেহুদা কথা।

এবনে যায়েদ বলেছেন, এর অর্থ হলো গালিগালাজ, ঝগড়া।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, জান্নাতের পানীয় পান করলে গুনাহগার হবেনা।[১]

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২২

'তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়'।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের যে ব্যক্তি হবে, তার পেছনেও দশ হাজার খাদেম তার খেদমতের জন্যে দন্ডায়মান থাকবে।

আর এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ মর্মে যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্তবার অধিকারী সে ব্যক্তি হবে, যার খেদমতে সকাল সন্ধ্যায় এমন পাঁচ হাজার খাদেম হাযির থাকবে, যাদের একজনের কাছেও এমন তৈজষপত্র থাকবেনা, যা অন্যের কাছে (অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের খাবার ও তৈজষপত্র থাকবে)। আর ঐ কিশোরদের অবস্থা সৌন্দর্যের দিক থেকে চমকদার, সংরক্ষিত মুক্তার ন্যায় হবে।

আল্লামী বগভী (রঃ) হযরত হাসান এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যখন খাদেম সৌন্দর্যে মুক্তার ন্যায় হবে, তখন যার খেদমত করবে তার কী অবস্থা হবে?

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, আরজ করা হয়েছে হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যখন খাদেমের এ অবস্থা হবে তখন যার খেদমত করবে, তার কী অবস্থা হবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যার খেদমত করা হবে, সে হবে চোদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায়, আর তার খাদেমরা হবে অন্যান্য তারকারাজির ন্যায়।

আবদুর রাজ্জাক এবং এবনে জরীর তাদের নিজ নিজ তফসীরে কাতাদার (রঃ) একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۞ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۞ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ

'তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে কথাবার্তা বলবে, তারা বলবে, আমরা তো ইতিপূর্বে নিজেদের গৃহে (দুনিয়ার জীবনে) আমাদের পরিণাম সম্পর্কে ভীত থাকতাম, তাই আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে দোযখের আজাব থেকে রক্ষা করেছেন'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৩৪

বেহেশতবাসীগণ পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবে, তারা বলবে, আখেরাতে কী হয় তা এক আল্লাহ পাকই জানেন, দুনিয়ার জীবনে এই ভয় সর্বদা থাকত, আল্লাহ পাকের দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দোয়া করতাম, যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেন, আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতাম, কিন্তু কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে ভয়ের অন্ত ছিলনা। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে তিনি দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং বেহেশতের অগণিত নেয়ামত দান করেছেন।

মসনদে বাজ্যারে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতীগণ তাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, আর যার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, তার অন্তরেও একই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে। এরপর ঐ ব্যক্তির আসনটি উড়তে শুরু করবে, এরপর একে অন্যের সঙ্গে দেখা হলে তারা পরস্পর কথা বলবে। তখন একথাও বলবে যে অমুক দিন অমুক স্থানে আমি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত ভাবে মুনাজাত করেছিলাম যে, আল্লাহ পাক যেন আখেরাতের নেয়ামত দান করেন। তাই আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র বেহেশত দান করেছেন। আমাদের প্রতি দয়া করেছেন।

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ

(আমরা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এই বলে দোয়া করতাম, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, অতীব দয়াবান।)

মসরুক (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) একদিন আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন, এরপর এভাবে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে জান্নাতে যাওয়ার পর জান্নাতীগণ দুনিয়ার ঘটনাবলী ভুলে যাবেনা; বরং জান্নাতে বসে তারা দুনিয়ার স্মৃতিচারণ করবে।

দ্বিতীয়তঃ কাফেররা দুনিয়াতে যা কিছু ভোগ করেছে তার কথাও মনে রাখবে, এজন্যে তাদের কষ্ট অনেক বেড়ে যাবে, কেননা মোমেনগণের অবস্থা হবে এই যে, তারা দুনিয়ার কারাগার থেকে জান্নাতে যাবে, আর কাফেররা আনন্দ উল্লাসের স্থল থেকে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।[২]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-১৪
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-২৫৪

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ

'(হে রসূল!) আপনি মানুষকে উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আপনি গণক নন এবং উন্মাদও নন'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দু' দল লোকের উল্লেখ রয়েছে, এক দল যারা সত্যদ্রোহী, যারা অশান্তি প্রিয়, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত তাদের সম্পর্কে সূরার প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের শাস্তি অনিবার্য, এরপর ঈমানদার ও নেককারদের শুভ-পরিণতি জান্নাতের ঘোষণার পর জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামতের কিছু উল্লেখ রয়েছে।

আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, কাফেররা তাঁকে উন্মাদ, গণক বলতো, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে (হে রসূল!) আল্লাহ পাকের দয়ায় আপনি কাফেরদের অপপ্রচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, আপনি নিঃস্কলংক, আপনি পাগলও নন, গণকও নন, আপনার সত্যিকার পরিচয় হলোঃ আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী, আর শুধু নবীও নন, বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। অতএব, কাফেরদের এসব অন্যায় আপত্তিকর মন্তব্যে কিছুই যায় আসেনা। নবী হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো মানুষকে উপদেশ দান করা, এ দায়িত্ব আপনি যথারীতি পালন করতে থাকুন, হতভাগা কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি সবর অবলম্বন করুন, আপনি তো আমার সাহায্য লাভে ধন্য, কাফেররা যাই বলুক, তাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ

'তবে কি তারা বলে, তিনি একজন কবি, আমরা তাঁর ব্যাপারে কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছি'।

এ আয়াতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) কাফেররা যে আপনার কথায় কর্ণপাত করেনা, তার কারণ কি এই যে, তারা আপনাকে একজন কবি মনে করে, কালের গর্ভে অনেক কবিই হারিয়ে গেছে, তাদের ধারণা হলো, আপনিও এভাবেই হারিয়ে যাবেন, তারা সেদিনেরই অপেক্ষায় আছে।

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা আমার মৃত্যুর অপেক্ষা করছো, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি, দেখি! তোমাদের কী পরিণতি হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পর্কে কি আদেশ দান করেন?

হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা আমার পরিণতি দেখার অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষা করছি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর আর তা হলো, আমার শুভ-পরিণতি হলো পরম সাফল্য আর তোমাদের শোচনীয় পরিণতি হলো চরম ব্যর্থতা এবং কঠিন শাস্তি।[১]

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا
صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ
أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ
مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ
تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ
فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ
الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৩২) তাদের বিচারবুদ্ধি কি তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়? অথবা তারা এক সীমা লংঘনকারী জাতি।

(৩৩) অথবা তারা কি বলতে চায়, পবিত্র কোরআনকে তিনি নিজেই রচনা করেছেন? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুতেই বিশ্বাস করেনা।

(৩৪) তারা যদি (তাদের কথায়) সত্যবাদী হয়, তবে অনুরূপ কোন বাণী তারা নিয়ে আসুক।

(৩৫) তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা?

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১০১০

(৩৬) অথবা আসমান যমীনকে তারাই কি সৃষ্টি করেছে? বরং তারা কিছুতেই বিশ্বাস করেনা।

(৩৭) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের ভান্ডার কি তাদের নিকটই রয়েছে? নাকি তারা তার রক্ষী নিযুক্ত হয়েছে?

(৩৮) নাকি তাদের নিকট কোন সিঁড়ি রয়েছে? যাতে (আরোহন করে) তারা কথা-বার্তা শ্রবণ করে? তবে তাদের শ্রোতারা যেন এর প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে।

(৩৯) তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্যে এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে?

(৪০) (হে রসূল!) আপনি কি তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়েছেন? যাকে তারা অত্যন্ত দুর্বহ বোঝা মনে করছে?

(৪১) অথবা তারা কি গায়বী কথা জানে? যে তারা তা লিখে রেখেছে?

(৪২) অথবা তারা কি কোন চক্রান্ত করতে চায়? পরিণামে কাফেররাই হবে চক্রান্তের শিকার।

(৪৩) অথবা আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের কি অন্য কোন উপাস্য রয়েছে? আল্লাহ পাক তাদের শেরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কখনও গণক, কখনও পাগল বলতো, আর কখনও তাঁকে কবিও বলা হতো, আর আলোচ্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এ মর্মে যে, মক্কার কোরায়শদের মানুষ বুদ্ধিমান মনে করে কিন্তু তাদের বুদ্ধির দৌড় কি এতখানি যে, আল্লাহর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তারা গণক, পাগল বা কবি মনে করে? তাদের বিবেক বুদ্ধি কি তাদের এ শিক্ষাই দেয়? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ওহী নাযিল হয় আর কবি যে কল্পনার জাল বিস্তার করে এবং মাতাল যে প্রলাপ বকে, এর মধ্যে তারা কি কোন পার্থক্যই করতে পারেনা? তারা কি এতই নির্বোধ, প্রকৃতপক্ষে, তারা সবই বোঝে, তবে তারা জ্ঞানপাপী, তাদের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে দৌরাত্ম এবং সত্যদ্রোহীতা, আর সেই স্বভাবগতঃ দৌরাত্মের কারণেই তারা সত্যকে গ্রহণ করেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

'তাদের বিচার বুদ্ধি কি তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়? অথবা তারা এক সীমা লংঘনকারী জাতি'।

অর্থাৎ কোরায়শ সর্দারদের তো বুদ্ধিমান মনে করা হয় কিন্তু তাদের বুদ্ধি কি তাদেরকে এ আদেশই দেয় যে, একই ব্যক্তিকে তারা একবার গণক বলে, আবার

যাদুকর বলে, কখনো কবি বলে, আবার কখনো উন্মাদ বলে, অথচ যে যাদুকর সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আর যে উন্মাদ তার বুদ্ধিই নেই, তাদের এসব স্ববিরোধী কথাবার্তায় একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারাই নির্বোধ, অথবা সত্যদ্রোহীতা এবং ইসলামের শত্রুতায় তারা সীমালংঘন করেছে। পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার দলিল প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত এবং অনস্বীকার্য।

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

'অথবা তারা কি বলতে চায়, পবিত্র কোরআনকে তিনি নিজেই রচনা করেছেন? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুতেই বিশ্বাস করেনা। তারা যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হয় তবে অনুরূপ কোন বাণী তারা নিয়ে আসুক'।

অর্থাৎ এ কাফেররা কি একথা বলতে চায় যে, পবিত্র কোরআনকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই রচনা করে এনেছেন এবং আল্লাহ পাকের কালাম বলে প্রচার করেছেন? তারা কি এ ধারণা করে যে, পবিত্র কোরআনের ন্যায় মহান গ্রন্থ কোন মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব? যদি তাদের এ ধারণাই হয় তবে পবিত্র কোরআনের অনুরূপ কোন বাণী তারা রচনা করে নিয়ে আসুক। অথচ তা কখনো তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। মানব দানব সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও পবিত্র কোরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। তাদেরকে বারে বারে আহবান জানানো সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মূলতঃ এ কাফেরদের মন পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়না এবং এ কাফেররা জেনে শুনেই এসব কথা বলছে।

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা'?

অর্থাৎ তারা যে আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের বাণীকে মানেনা, এর কারণ কি? তারা কি ভেবেছে যে, তাদের উপর কারো কোন শক্তি নেই? তারা কি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছে, কে তাদের স্রষ্টা? নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? এ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল কি তাদেরই সৃষ্টি? অথবা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের ভান্ডারের আধিপত্য কি তারা লাভ করেছে? প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র মালিক, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা, তাঁর হাতেই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা, এসব

কথা কাফেররা খুব ভালভাবেই জানে। কিন্তু তাদের হিংসা-শত্রুতা, মানবতা বিরোধী আচরণ, একথার প্রমাণ যে, তাদের পাপ-প্রবণ মন তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রাখে, তারা বুঝে শুনেই সত্যদ্রোহীতায় লিপ্ত থাকে।

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوقِنُونَ

'অথবা আসমান যমীনকে তারাই কি সৃষ্টি করেছে? বরং তারা কিছুতেই বিশ্বাস করেনা'।

কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতেও তারা ঈমান আনেনা, আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই, অথচ বিশাল বিস্তৃত আসমান যমীন স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব জীবন্ত নিদর্শন, এসব নিদর্শন দেখেও কি তারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনা? নাকি তারা একথা মনে করে যে, তারা এসব সৃষ্টি করেছে? তারা যে সৃষ্টি করেনি একথা তারা ভালভাবেই জানে, অতএব, আল্লাহ পাকই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁর প্রতি ইমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই হলো বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

'(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের ভান্ডার কি তাদের নিকটই রয়েছে? নাকি তারা তার রক্ষী নিযুক্ত হয়েছে'?

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সম্পদ ভান্ডারের কর্তৃত্ব কি তাদের হাতেই রয়েছে? যে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে নবুওয়্যত দিয়ে দিতে পারে!

অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের জ্ঞান-ভান্ডারের উপর কি তাদের আধিপত্য রয়েছে যে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে এলম এবং হেকমত দান করতে পারে? এবং তারা জানতে পারে কে নবুওয়্যতের যোগ্য আর কে এলম এবং হেকমতের উত্তরাধিকারী হতে পারে? অথবা সব কিছুর উপর কি তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে? তথা তারা আল্লাহ পাকের সম্পদের ভান্ডরের রক্ষী নিযুক্ত হয়েছে? এসব কিছুই নয়, অতএব তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা, যদি তারা এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তবে দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকাই তাদের কাজ।

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

'নাকি তাদের নিকট কোন সিঁড়ি রয়েছে? যাতে (আরোহন করে) তারা কথাবার্তা শ্রবণ করে? তবে তাদের শ্রোতারা যেন এর প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে'।

অর্থাৎ তাদের নিকট কি এমন কোন সিঁড়ি রয়েছে? যার মাধ্যমে তারা আকাশে ওঠে এবং আসমানী কথাবার্তা শ্রবণ করতে পারে এ মর্মে যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি এমন কিছু তাদের কেউ শুনে থাকে তবে তার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা তাদের কর্তব্য।

أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ

'তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্যে? এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে'?

কাফেররা বলতো যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ পাকের কন্যা, তাই এ আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ্ পাকের জন্যে কন্যা সন্তান? আর নিজেদের জন্যে পুত্র সন্তান? এভাবে আল্লাহ্ পাকের জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে তারা আল্লাহ্ পাকের শানে অত্যন্ত বড় বেয়াদবী করেছে এবং নিজেদের মূর্খতা এবং জঘন্য নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে, এমন লোকদেরকে কখনও বুদ্ধিমান বলা যায়না।

أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি কি তাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়েছেন? যাকে তারা অত্যন্ত দুর্বহ বোঝা মনে করছে'?

অর্থাৎ এ কাফেররা যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানেনা, তার কোন কারণ থাকা উচিত, তবে কি (হে রসূল!) আপনি যে দ্বীন ইসলামের প্রচার করছেন, আপনি কি তাদের নিকট বিনিময়ে কোন অর্থ-সম্পদ চেয়েছেন, যা তাদের নিকট দুর্বহ বোঝা বলে মনে হয়? তারা ঐ অর্থ-সম্পদ আদায় করা কঠিন মনে করেই আপনার বিরোধিতা করছে?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ

'অথবা তারা কি গায়বী কথা জানে? যে তারা তা লিখে রেখেছে'?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে غيب শব্দ দ্বারা "লওহে মাহফুজ"কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যাতে সকল গায়বী বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরকালীন জীবন সম্পর্কে যে সব কথা বলেন যথা হাশর, কেয়ামত, ঈমান ও নেক আমলের জন্যে সওয়াব এবং বেঈমানী ও পাপাচারের জন্যে আযাব প্রভৃতি। সেগুলো অবশ্যই ঘটবে কিন্তু এ কাফেরদের নিকট কি এ এলম রয়েছে? যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা ঠিক নয় (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)?

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ

'অথবা তারা কি কোন চক্রান্ত করতে চায়? পরিণামে কাফেররাই হবে চক্রান্তের শিকার'।

অর্থাৎ কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করে, সে চক্রান্তের শোচনীয় পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে, যেমন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার চক্রান্ত করেছিল, অবশেষে তাদের সে চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের এক বছর পরই বদরের রণাঙ্গনে সকল চক্রান্তকারীর মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর পর তাদের শাস্তি ছিল অবধারিত।

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

'অথবা আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য রয়েছে? আল্লাহ পাক তাদের শেরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র'।

যেহেতু তারা আল্লাহকে মানেনা, তাদের হাতে গড়া মূর্তির পূজা করে, তাই প্রশ্ন করা হয়েছে আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের কি এমন কোন মা'বুদ রয়েছে? যার বন্দেগীতে তারা ব্যস্ত মুগ্ধ, আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলার অবসর বা সুযোগ তাদের নেই? বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তাদের শেরক থেকে পবিত্র, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কোন চক্রান্তই কার্যকর হবেনা, তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য; সত্য অবশেষে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হবে, মিথ্যা বিদায় নেবে, মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য।

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾
فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا
يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

তরজমা

(৪৪) আর তারা যদি এক খন্ড আকাশকেও ভেঙ্গে পড়তে দেখে, তবে বলবে এ-তো এক পুঞ্জিভূত মেঘ।

(৪৫) অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত ছেড়ে দিন, যেদিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে।

(৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত কোন কাজেই আসবেনা, আর তারা কোন প্রকার সাহায্য সহায়তাও পাবেনা।

(৪৭) এ পাপীষ্ঠদের জন্যে এছাড়া অন্য আযাবও রয়েছে, তবে তাদের অনেকেই তা জানেনা।

(৪৮) (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায়, আপনি আমার চক্ষুর সম্মুখেই রয়েছেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন, যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করেন।

(৪৯) আর রাত্রিবেলায় ও তারকার অস্তগমনের পর আপনি তাঁর তসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

তফসীরুল কোরআন

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ

এ আয়াতে দূরাত্মা কাফের মুশরেকদের সত্যদ্রোহীতা, হঠকারিতা, জেদ এবং একগুয়েমির বিবরণ স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাকের আযাব দেখেও তারা নাফরমানী বর্জন করতে রাজী নয়; অন্যায় অনাচার পরিহারে প্রস্তুত নয় এমনকি, যদি তাদের উপর আকাশের একটি খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে, তবু তারা বলবে এটি তো পুঞ্জিভূত মেঘ, আর এ অবস্থায়ও তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবেনা।

كسف শব্দটির অর্থ খন্ড, কেননা মুশরেকরা বলেছিল,

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ

"যদি আপনি নবুওয়্যতের দাবীতে সত্য হন, তবে আমাদের উপর আসমানের একটি খন্ড নিক্ষেপ করুন"।

কাফেরদের এ ঔদ্ধত্বপূর্ণ মন্তব্যের জবাবেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন।

অর্থাৎ যদি তারা তাদের উপর আকাশ খন্ড পড়তে দেখতেও পায়, তবে তারা বলবে এটি হলো পুঞ্জিভূত মেঘ, যেমন আদ জাতি মেঘমালা দেখে বলেছিল, এখন বৃষ্টিপাত হবে, কিন্তু ঐ মেঘমালার মধ্যে ছিল এমন আযাব, যা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো, যদি মক্কার এ কাফেরদের উপর আমি আকাশ খন্ড নিক্ষেপ করি, তবু তারা কুফর ও নাফরমানী থেকে বিরত হবেনা; বরং তারা চিরতরে ধ্বংস হবে, কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ পাকের মর্জি নয়; তাই তাদের প্রতি আসমান থেকে আযাব নাযিল হয়নি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এজন্যে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ

অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত ছেড়ে দিন, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত হবে, যেদিন তাদের চক্রান্ত কোন কাজেই আসবেনা, আর তারা সেদিন কোন সাহায্য সহায়তাও পাবেনা।

فَذَرْهُمْ

"অতএব, তাদেরকে ছেড়ে দিন" একথার তাৎপর্য হলো, তাদের ব্যাপারে আযাব নাযিল করার দরখাস্ত করবেন না, তাদেরকে তাদের বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দিন।

يَوْمَهُمْ

অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করবেন, সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দিন।

এ আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা কোন্ দিন?

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) বলেছেন, এটি সেদিন, যেদিন ইস্রাফীল (আঃ) শিংগায় ফুঁক দেবেন। যেদিন প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং নিজ নিজ কৃতকর্ম অবগত করানো হবে এবং প্রত্যেকের জীবন ও কর্মের পরিণতি সে দেখতে পাবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এদিন হলো প্রত্যেকের মৃত্যুর দিন, কেননা মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের এ জীবনের অবসান ঘটে এবং পরকালীন জীবনের সূত্রপাত হয়, তখনই মানুষকে এ জীবনের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়। এমন অবস্থায় আয়াতের তাৎপর্য হবে, (হে রসূল!) মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দিন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে, যেমন হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন,

الناس نيام فاذا ما توا انتهبوا

'পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে, যখন তাদের মৃত্যু হবে তখনই তারা জাগবে'।

وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

'আর তারা কোন প্রকার সাহায্য সহায়তাও পাবেনা'।

আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে আসবেনা, কেউ তাদের সাহায্যকারী হবেনা।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

'আর এ পাপীষ্ঠদের জন্যে অন্য আযাবও রয়েছে, তবে তাদের অনেকেই তা জানেনা'।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাদেরকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছেড়ে দিন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার জীবনে তারা নিরাপদ থাকবে, বরং দুনিয়ার জীবনেও তাদের প্রতি বিভিন্ন সময়ে আযাব আপতিত হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যেমন বদরের দিন কাফেরদের সমুচিত শাস্তি দেয়া হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে, এ আযাব হলো ক্ষুধার কষ্ট, কেননা মক্কাবাসী সাত বছর যাবত দুর্ভিক্ষের আযাবে গ্রেফতার হয়েছিল।

হযরত বারা এবনে আযেব (রাঃ) বলেছেন, এ আযাব হলো কবরের আযাব। যেদিন তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হবে, কেউ তাদেরকে সাহায্যের জন্যে আসবেনা।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

'(হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায়'।

আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় সবর অবলম্বনের তাৎপর্য হলো কাফেরদেরকে অবকাশ দেয়া, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে আরো কিছু দিন অবকাশ দিয়েছেন, অতএব (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি কাফেরদের আযাবের আদেশ দিয়েছি, অতএব, আযাব নাযিল হওয়া পর্যন্ত আপনি ধৈর্য ধারণ করুন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো, কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের হুকুম নাযিল হওয়া পর্যন্ত (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন।

এ পর্যায়ে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, فَذَرْهُمْ অর্থাৎ (হে রসূল!) কাফেরদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন,

এতে এ ঈঙ্গিত রয়েছে, কাফেরদেরকে যত উপদেশই দেয়া হোক না কেন তারা পথে আসবেনা, অতএব (হে রসূল!) তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দিন এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষা করুন, এ মুহূর্তে তাদের প্রতি বদদোয়া করবেন না। যাহোক, এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের ব্যাপারে সবর অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ধৈর্য সহকারে আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

জুযায (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আপনি আমার চোখে চোখে আছেন, আপনাকে আমি দেখছি এবং আপনার হেফাজত করছি, তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

আর কখনো যদি তাদের মন্দ আচরণে আপনার মন আহত হয়, তবে আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন, কেননা আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করলে এবং আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় থাকলে, মানব মনে এত প্রশান্তি আসে যে, কারো আচরণের কষ্ট সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যায়। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'মনে রেখ, আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যমেই মানব মন প্রশান্তি লাভ করে'।

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

'(হে রসূল!) আপনি আপনার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন, যখন আপনি শয্যাত্যাগ করেন এবং রাত্রি বেলায় ও তারকার অস্তগমনের পর আপনি তাঁর তসবীহ পাঠ করতে থাকুন'।

যখন কাফেরদের অন্যায় আচরণ মনোকষ্টের কারণ হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করার ইচ্ছা হবে, কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হলো, এমন সময় আপনি আল্লাহ পাকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন, আল্লাহ পাকের স্মরণে মনোনিবেশ করুন, সমস্যার সমাধানের এটি উত্তম পন্থা।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন, যখন আপনি উঠে দাঁড়ান।)

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং আতা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মজলিস থেকে যখন ওঠেন তখন এ দোয়া পাঠ করুন,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

যদি কল্যাণকর মজলিস হয়ে থাকে তবে এ দোয়ার বরকতে কল্যাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। আর যদি মজলিসে কোন মন্দ কথা হয়ে থাকে তবে এ তসবীহ তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন চিৎকার ও আর্তনাদের স্থানে বসে এবং মজলিস থেকে উঠবার আগে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

তবে ঐ মজলিসে যদি কোন মন্দ কথা হয়ে থাকে, তবে এ দোয়া তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে (বগভী)।

ইমাম বায়হাকী এবং ইমাম তিরমিজীও এ মর্মের হাদীস সংকলন করেছেন।

হযরত রাফে এবনে খোদায়েজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি মজলিস থেকে উঠবার সময় এ দোয়া পাঠ করতেন। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ইতিপূর্বে তো আপনি মজলিস থেকে উঠতে এ দোয়া পাঠ করতেন না? তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমার নিকট জীব্রাঈল (আঃ) এসেছিল, সে বলেছে এ দোয়াটি মসজিদের মন্দ কথাগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে حِيْنَ تَقُوْمُ কথাটির ব্যাখ্যা হলো, যখন আপনি শয্যাত্যাগ করেন তথা নিদ্রার পর যখন উঠে দাঁড়ান তখন নামায আদায় করুন।

তফসীরকার যাহ্যাক এবং রবী বলেছেন, এর অর্থ হলো যখন আপনি নামাযের জন্যে দন্ডায়মান হন তখন এ দোয়া পাঠ করুন।

আর কালবী (রঃ) বলেছেন, বিছানা ছেড়ে যখন মানুষ ওঠে এবং নামাযের জন্যে দন্ডায়মান হয় তখন যেন আল্লাহ পাককে স্মরণ করা হয়।

হামেদ এবনে হোমায়েদ বর্ণনা করেন, আমি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রিকালে (বিছানা থেকে) উঠে দাঁড়াতেন তখন সর্ব প্রথম কি কাজ করতেন? উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

বিছানা থেকে উঠে সর্ব প্রথম দশবার আল্লাহু আকবর, দশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করতেন, এরপর এ দোয়া اللهم اغفرلى واهدنى وارزقنى পাঠ করতেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

(আর রাত্রি বেলায়ও তসবীহ পাঠ করুন।)

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মাগরিব এবং এশার নামাজ আদায় করুন।

وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ

(তারকা অস্তগমণের পর তসবীহ পাঠ করুন।)

অর্থাৎ যখন তারকারাজি নিস্প্রভ হয়ে পড়ে, ভোরের আভা দেখা যায় তখনও তসবীহ পাঠ করুন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা ফজরের নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা ফজরের পূর্বে দু' রাকাআত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ফজরের দু' রাকাআত অর্থাৎ সুন্নত, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নজম

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَسِتُّوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوٰى ۝٣ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝٥ ذُوْ
مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۝٦ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝٨
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝٩ فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۝١٠ مَا
كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝١١ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝١٢ وَلَقَدْ رَاٰهُ
نَزْلَةً اُخْرٰى ۝١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝١٤ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۝١٥
اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝١٧
لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝١٨

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তগামী হয়।

(২) তোমাদের সাথী (এই রসূল) বিভ্রান্ত নন এবং বিপথগামীও নন।

(৩) আর নিজের প্রবৃত্তির মর্জি মাফিকও কথা বলেন না।

(৪) তাতো শুধু ওহীই, যা তাঁর নিকট নাযিল হয়।

(৫) তাঁকে এক মহা শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দেয়।

(৬) প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে তার প্রকৃত আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল।

(৭) তখন সে আসমানের উচ্চ প্রান্তে ছিল।

(৮) এরপর সে তার নিকটবর্তী হলো- অতি নিকটবর্তী।

(৯) তখন তাদের মধ্যে দু' ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তার চেয়েও কম।

(১০) এরপর আল্লাহ পাক স্বীয় বন্দার প্রতি যা ওহী নাযিল করার ছিল, তা নাযিল করলেন।

(১১) রসূল যা কিছু দেখেছিলেন, তাঁর অন্তর তাকে অস্বীকার করেনি।

(১২) তিনি যা দেখেছেন, তোমরা সে সম্পর্কে তর্ক করতে চাও?

(১৩) তিনি তো আরো একবার ঐ ফেরেশতাকে দেখেছিলেন।

(১৪) সিদরাতুল মুনতাহার পার্শ্বে।

(১৫) তার কাছেই রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া।

(১৬) যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

(১৭) তাঁর দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়নি।

(১৮) তিনি তাঁর প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন।

সূরা নজম প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে শুধু একটি আয়াত যা হযরত ওসমান (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ এবনে আবি সাব্হা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তা মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ রয়েছে। এ সূরায় ৬২ আয়াত, রুকু ৩,৩০০ বাক্য এবং ১,৪০৫টি অক্ষর রয়েছে।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, সেজদা বিশিষ্ট সূরা সমূহের মধ্যে সূরা নজম সর্ব প্রথম নাযিল হয়েছে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেজদা করেন এবং তাঁর পেছনে যারা ছিলেন, তাঁরাও সেজদা করেন। শুধু এক ব্যক্তি সেজদা করেনি, সে ছিল উমাইয়া এবনে খালফ, যে অবশেষে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা নজম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

এ সূরার আমল

যে ব্যক্তি সূরা নজম হরিণের চামড়ায় লিপিবদ্ধ করে হাতে বেধে রাখবে, সে বিজয়ী হবে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৪

স্বপ্নের তাবীর

যে স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা নজম পাঠ করছে, তবে তার একটি সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।

মূল বক্তব্য

হিজরতের পূর্বে মে'রাজ শরীফের ঘটনার পর মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মে'রাজের বিশেষ অবস্থারও উল্লেখ করা হয়েছে। আর এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবা প্রকাশ করা হয়েছে এবং একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথাই আল্লাহ পাকের ওহী। অতএব, তাঁর অনুসরণ একান্ত কর্তব্য। সূরার পরিসমাপ্তিতে আদ, সামুদ, কওমে নূহ, কওমে লুত প্রভৃতির উল্লেখ করে তাদের ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় তৌহীদের প্রমাণ এবং সৃষ্টি জগতের মধ্যে এ নশ্বর জগতের অবসান ও কেয়ামত অনুষ্ঠানের যে প্রমাণ রয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে।

আর আলোচ্য সূরায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি কথা যে সমগ্র মানব জাতির জন্যে অনুসরণীয় তা ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মোবারক জবান থেকে যা বের হয় তা শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী, একথার ঘোষণাও রয়েছে এ সূরায়।

তফসীরুল কোরআন

وَالنَّجْمِ اِذَاهَوٰى

'শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তগামী হয়'।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেনঃ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সূরাইয়া নামক নক্ষত্র যখন অস্তমিত হয়, আরবগণ এ নক্ষত্রকে نجم বলে। هوى শব্দের অর্থ হলো অদৃশ্য হওয়া অর্থাৎ নক্ষত্র যখন অদৃশ্য হয়ে যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পৃথিবীতে পোকা মাকড়ের মাধ্যমে যত বালা মসিবত দেখা দেয়, নজম নামক নক্ষত্রটি উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা দূর হয়ে যায়।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, النجم। শব্দটি দ্বারা আসমানের সকল নক্ষত্রকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, শয়তান আসমানী কথাবার্তা শ্রবণের জন্যে যখন উপরের দিকে যায় তখন তার প্রতি যে নক্ষত্রপুঞ্জ নিক্ষেপ করা হয়, النجم। শব্দটি দ্বারা সে নক্ষত্রগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবু হামজা (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সে নক্ষত্রগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা কেয়ামতের দিন বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে যাবে।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে যে, النجم। শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা পবিত্র কোরআন সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে।

হযরত ইমাম জাফর আস সাদেক (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যখন তিনি শবে মে'রাজে আসমান থেকে যমীনে অবতরণ করেছিলেন।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, النجم। দ্বারা মুসলমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর هوى শব্দ দ্বারা মুসলমানকে কবরে দাফন করার কথা বোঝানো হয়েছে।

যদি النجم। দ্বারা বিশেষ কোন নক্ষত্র বা সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে উদ্দেশ্য করা হয়, আর هوى শব্দ দ্বারা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হওয়া এবং শয়তানদের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়া অর্থ করা হয়, তবে এ তারকারাজি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে, শয়তানকে বিতাড়িত করা।

দ্বিতীয়তঃ যদি النجم। শব্দ দ্বারা কোরআনে করীম উদ্দেশ্য করা হয় এবং هوى শব্দে পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে এর তাৎপর্য হলো মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

তৃতীয়তঃ যদি النجم। দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতময় ব্যক্তিত্বকে উদ্দেশ্য করা হয়, আর هوى অর্থ যদি শ'বে মে'রাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আসমান থেকে যমীনে অবতরণকে গ্রহণ করা হয়, তবে এর তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কেননা মে'রাজের পর মানব জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পৃথিবীতে অবতরণ করা সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের একটি বিরাট নেয়ামত, যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

চতুর্থতঃ যদি النجم। দ্বারা মুসলমানকে উদ্দেশ্য করা হয়, আর هوى দ্বারা মুসলমানের কবরে দাফন উদ্দেশ্য হয় তবে একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে, ঈমান এবং নেক আমল নিয়ে জীবন যাপন করা, শয়তানের ধোকা থেকে সংরক্ষিত থেকে মুসলমানের জীবন মরণ এবং দাফন হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত।[১]

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

'তোমাদের সাথী (এই রসূল) বিভ্রান্ত নন এবং বিপথগামীও নন'।

আল্লাহ পাক শপথ করে একথা ঘোষণা করেছেন যে, আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্ত নন, তিনি ভুলেও সত্য পথ থেকে সরে যান না, কখনো তিনি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেন না, পথভ্রষ্ট হন না, তিনি সর্ব প্রকার ভুল ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত, তিনি নিঃস্পাপ, নিস্কলংক, তাঁর পথ সত্য, সুস্পষ্ট, তাঁর আদর্শ মহান, অনিন্দ্য-সুন্দর, চির স্মরণীয় এবং চির অনুকরণীয়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার এ ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং একথা বলেছেন তারকারাজির শপথ করে।

তারকারাজির শপথ করার তাৎপর্য হলো, আসমানে অসংখ্য তারকা বিদ্যমান, যুগ যুগ ধরে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত নিয়মে তারকারাজি উদিত এবং অস্তমিত হয়। তাদের জন্যে নির্ধারিত কক্ষপথে তারা যথানিয়মে পরিভ্রমণ করে থাকে, এতে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়না। যেভাবে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সূর্য, যার আলো তার নিজস্ব এবং সকল নক্ষত্রপুঞ্জের পরেই সূর্য উদিত হয়, আর সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য নক্ষত্রের আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়, ঠিক এমনিভাবে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য, তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সকল নবীর নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তিনি সকলের শেষে আগমন করেছেন, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই, যেমন সূর্য উদিত হওয়ার পর আর কোন তারকা দেখা যায় না।

যেভাবে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিয়ম ভঙ্গ করার সাধ্য কারোই নেই, ঠিক তেমনি নবুওয়্যতের আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ বা সূর্যেরও আল্লাহ পাকের আইন ও নিয়মের ব্যতিক্রম করার সাধ্য নেই। এজন্যেই আল্লাহ পাকের কোন নবীই সত্য পথ থেকে বিচ্যুৎ হন না; হতে পারেন না, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৩৩-৩৪

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

(তোমাদের সাথী বিভ্রান্ত নন এবং বিপথগামীও নন।)

এমনকি, তাঁর একটি কথাও তিনি নিজের তরফ থেকে বলেন না, তাঁর ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়না, তিনি যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ পাকের মহান বাণী ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

আর তিনি নিজের প্রবৃত্তির মর্জি মোতাবেকও কথা বলেন না, তিনি যা কিছু বলেন তা-তো শুধু ওহীই, যা তাঁর নিকট নাযিল হয়।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, তাঁর প্রত্যেকটি কথাই আল্লাহ পাকের কথা, তাঁর প্রতিটি কাজই আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক হয়, তাঁর কথা ও কাজে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধেরই বহিঃপ্রকাশ হয়, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই আল্লাহ পাকের নির্দেশানুযায়ী হয়, এর ব্যতিক্রম কখনো হয়না। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে অনুসরণীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাঁর অনুসরণেই রয়েছে এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, ওহী দু' প্রকার (১) যা তেলাওয়াত করা হয়, যেমন পবিত্র কোরআন। (২) যা তেলাওয়াত করা হয়না, যেমন হাদীস শরীফ।

অতএব, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, যা বলেছেন এবং যা অনুমোদন করেছেন, সবই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যা শ্রবণ করতাম, তাই লিপিবদ্ধ করতাম। কোন কোন কোরায়শী ব্যক্তি আমাকে বলেছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও রাগ করেও কথা বলেন, আমি এ সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজী পেশ করলাম, তখন তিনি এরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, হক্ব ব্যতীত আমি কিছুই বলিনা, অতএব, তুমি যা শ্রবণ কর তাই লিপিবদ্ধ কর।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৫
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-১৯-২০

এজন্যে যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের তরফ থেকে কখনও কোন কথা বলতেন না।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى

"তাঁকে এক মহা শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দেয়"।

অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের ওহী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন, ওহীর মূল প্রেরণকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন, আর জীব্রাঈল (আঃ) হলেন ওহী প্রেরণের মাধ্যম বা বার্তাবাহক। বার্তাবাহক যদি শক্তিশালী না হয়, তবে এমনি মহান দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নয়, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, অতি শক্তিশালী একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাকের মহান বাণী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়ে থাকে, তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, বলিষ্ঠ এবং অতীব শক্তির অধিকারী, তিনি এত শক্তিশালী যে, হযরত লুত (আঃ)-এর জনপদকে তিনি উপরের দিকে তুলে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন, ফিলিস্তিনী এলাকার বিরাট ভূখন্ডকে তুলে এনে মক্কাবাসীর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের লক্ষ্যে বর্তমান তায়েফ নামক এলাকায় সংস্থাপন করেছিলেন। তাঁর একটি হুংকার এত ভয়াবহ ছিল যে, সামুদ জাতি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

ذُوْ مِرَّةٍ

এর দু'টি অর্থ (১) তিনি সৃষ্টিগতভাবে শক্তিশালী, (২) অতি সুন্দর

فَاسْتَوٰى

'ঐ শক্তিশালী ফেরেশতা (জিব্রাঈল) তার প্রকৃত আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলেন

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা যেমন অন্য আয়াতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

এ শব্দটির অনুবাদ করা যায়, কিন্তু কিভাবে কোন্ পন্থায় এ ঘটনাটি ঘটেছে তা কারোই জানা নেই।

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى

(তখন সে আসমানের উচ্চ প্রান্তে ছিল।)

হযরত জীব্রাঈল (আঃ) পূর্বাকাশের এক প্রান্তে দন্ডায়মান হয়েছিলেন, যে স্থান থেকে সূর্য উদিত হয়।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। একবার ওহী নাযিল হওয়ার সূচনা কালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জমীনে ছিলেন এবং জীব্রাঈল (আঃ) পূর্বাকাশের এক প্রান্তে অবস্থান করছিলেন এবং এ মহা শক্তিশালী ফেরেশতা তাঁর প্রকৃত অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। যে দৃশ্য দেখার কারণে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভীত হয়ে পড়ে ছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সূরা মোদ্দাসস্যের নাযিল হয়েছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলেন শবে মে'রাজে, সিদরাতুল মুনতাহার কাছে।

মসনদে আহমদে একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে তাঁর প্রকৃত রূপে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত ডানা ছিল, যা আসমানের এক প্রান্তকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তাঁর দেহ থেকে মূল্যবান জমররদ মুক্তা এবং মারওয়ারিদ ঝরে পড়ছিল।[১]

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

এরপর সে তার নিকটবর্তী হলো-অতি নিকটবর্তী। তখন তাদের মধ্যে দু' ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তার চেয়েও কম।

অর্থাৎ হযরত জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হন আর এত নিকটবর্তী হন যে, তাদের উভয়ের মধ্যে মাত্র একটি ধনূকের দু' প্রান্তবর্তী দূরত্ব অথবা তার চেয়েও কম দূরত্ব থেকে যায়। এত নিকটবর্তী যে, তাঁর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকেনা এবং এ উপমাটি তাঁদের অতি নৈকট্য প্রকাশের জন্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى

'এরপর আল্লাহ পাক স্বীয় বন্দার প্রতি যা ওহী নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত আবুজর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম এ মত পোষণ করতেন, এ আয়াতে ধনুকের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যে নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে, তা হলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জীব্রাঈল (আঃ)-এর নৈকট্য। পক্ষান্তরে, হযরত

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-২১-২২

আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) সহ আরো বহু সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এ মত পোষণ করতেন যে, আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের দীদারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন'।

একরামা (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত কাব আহবার (রাঃ)-এর মোলাকাত হয়। তখন কা'ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে তাঁর দীদার এবং কথোপথেনকে ভাগ করে দিয়েছেন। মূসা (আঃ) এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দীদার নসিব করেছেন। হযরত মুসা (আঃ) দু' বার আল্লাহ পাকের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' বার আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হয়েছেন।

মসরুক (রঃ) বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করি, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন? তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি এমন কথা জিজ্ঞাসা করেছ যে, আমার দেহের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। আমি আরজ করলাম, হে উম্মুল মোমেনীন! একটু অপেক্ষা করুন, এরপর আমি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলাম,

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

(রসূল যা কিছু দেখেছিলেন, তার অন্তর তাকে অস্বীকার করেনি।)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছেন

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, ওব্বাদ এবনে মানসুর তফসীরকার একরামা (রঃ)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন তুমি কি চাও? যে আমি তোমাকে বলে দেই, হযরত রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছিলেন। আমি বললাম জ্বী হ্যাঁ, আমি তাই চাই, তখন তিনি বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হয়েছেন, শুধু একবার নয়, দু' বার।

এ পর্যায়ে হযরত সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রঃ) এবং শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা শিব্বির ওসমানী (রঃ) এ মত পোষণ করতেন যে, শবে মে'রাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছেন।

হযরত সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রঃ) তাঁর "মুশকিলাতুল কোরআন" গ্রন্থে সূরা নজমের আলোচ্য আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন, আর "ফাতহুল মুলহেম ফিঁ শরহে ছহী মুসলিম" গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম মওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) শাহ সাহেবের ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত শাহ সাহেব সূরা নজমের এ আয়াত সমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন এবং তিনটি অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন।

(১) এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যেমন সত্যের প্রতি তাঁর মন সুদৃঢ়, তিনি নিঃস্পাপ এবং তাঁর হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (২) এরপর তাঁর নিকট যার মাধ্যমে ওহী পৌঁছানো হয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং শক্তিশালী হওয়ার বিবরণ রয়েছে। এরপর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে বার্তাবাহক জীব্রাঈল (আঃ)-এর সাথে তাঁর পরিচয় ও নৈকট্য রয়েছে এবং তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আকাশের এক প্রান্তে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। (৩) এসব বিবরণের পর স্বয়ং আল্লাহ পাকের দীদার লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন শবে মে'রাজে এবং তাঁর বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছেন, একথা ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

আর সূরা বণী ইসরাঈলের যে আয়াতে মে'রাজের সফরের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে–

لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا

"যেন আমি তাঁকে দেখাই আমার মহান নিদর্শন সমুহ"।

এ ঘোষণার বাস্তবায়ন হয়েছে শবে মে'রাজের সফরে, মহাশুণ্য পরিভ্রমণে, সিদরাতুল মুনতাহায় গমনে এবং জান্নাত দোযখ সহ আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দর্শনে এবং মহান আল্লাহ পাকের দীদার লাভে। এর পরিপূর্ণতা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী একখানি আয়াতে-

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

(তিনি তাঁর প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন সমূহ দেখেছেন।)

আলোচ্য আয়াতে যা দেখার কথা বলা হয়েছে, তা যদি শুধু জীব্রাঈলকে দেখার কথা হতো তবে এর জন্যে ওয়াদা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, আর তাকে মহান শ্রেষ্ঠত্বর নিদর্শন বলারও কোন প্রয়োজন হতোনা। কেননা অহী নাজিল হওয়ার সূচনাতেই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাঈল (আঃ)-কে তাঁর প্রকৃত রূপে দেখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তেইশ বছরের নবুওয়্যতের আমলে আল্লাহ পাকের বার্তাবাহক হিসেবে

চব্বিশ হাজার বার এসেছেন, কাজেই তাঁর দেখাকে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলার কোন যুক্তিই নেই, আর তাঁকে দেখার জন্য মে'রাজের ন্যায় অবিস্মরণীয় সফর তথা মহাশুণ্য পরিভ্রমণেরও কোন প্রয়োজন ছিল না।

অতএব, সূরা বণী ইসরাঈলের لنريه শব্দে এমন কিছু দেখার ওয়াদা করা হয়েছে, যা তিনি ইতিপূর্বে দেখেননি। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে সূরা নজমের আয়াত সমূহের তৃতীয় অংশে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হওয়ার এবং তাঁর দীদার লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সপ্ত আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে আরও অনেক দূরে পৌঁছানো হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজের এ বিস্ময়কর সফর হয়েছিল।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত সমূহের যে ব্যাখ্যা দেয়া হল, তা لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (তাকে চক্ষু সমূহ দেখতে পায়না) কথাটির বিরোধী নয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহ পাকের দীদার কি করে সম্ভব হয়! যখন আল্লাহ পাক নিজেই لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ বলেছেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন তাঁর বিশেষ নূরে আত্ম প্রকাশ করেন তখন তাঁকে দেখা সত্যিই সম্ভব নয়। (তিরমিজী)

কিন্তু এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ পাকের নূর ও তাজাল্লীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও মর্তবা রয়েছে। মোমেনদের উদ্দেশ্যে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে জান্নাতে যাওয়ার পর মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে, তখন তাদের দর্শন শক্তি এত বৃদ্ধি করা হবে যে মোমেনগণ আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লী বরদাশত করতে পারবে, যা দুনিয়ার জীবনে অচিন্তনীয়। আর বিশেষ মর্তবার একটি দীদার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে, যা তিনি ব্যতীত কারোই নসীব হয়নি। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একমাত্র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেই এ সৌভাগ্য দান করা হয়েছে, আর কাউকে নয়, এ বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁরই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাককে দু' বার দেখেছেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, একবার অর্ন্তদৃষ্টিতে দেখেছেন, আর একবার প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখেছেন। অথবা এর অন্য একটি অর্থ হতে পারে একবার স্বপ্ন জগতে দেখেছেন, আর একবার জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন, যা শবে মে'রাজে হয়েছে।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আমার প্রতিপালককে দেখেছি।[১]

হযরত আনাস (রাঃ), হাসান (রঃ) ও একরামা (রঃ)-এর কথা হল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে স্বচক্ষে দেখেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) একরামা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধুত্বের জন্যে নির্বাচন করেছেন, তাঁকে খলিলুল্লাহ বলে ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে কথা বলার জন্যে নির্বাচন করেছেন, এজন্যে তাঁকে বলা হয় কালিমুল্লাহ আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্বাচন করেছেন দীদার প্রদানের জন্যে।

أَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۞ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

"তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি সে সম্পর্কে তর্ক করতে চাও? তিনি তো আরও একবার তাঁকে দেখেছিলেন, সিদরাতুল মুনতাহার পার্শ্বে।

সিদরাতুল মুনতাহার কথা

এত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তোমরা কি নবীর বর্ণিত বিষয়ে ঝগড়া করতে চাও। তাঁর প্রতিটি কথা ধ্রুব সত্য, সন্দেহাতীত। আর প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাঈল (আঃ)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দ্বিতীয়বারও দেখেছেন। তা দেখেছেন তিনি শবে মে'রাজে সিদরাতুল মুনতাহার পাশে তথা শেষ প্রান্তের কুল বৃক্ষের কাছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এ কুল বৃক্ষটি সপ্তম আসমানে মহান আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত। আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে এটি ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন, বৃক্ষটির শেকড় ষষ্ঠ আসমানে রয়েছে, এর শাখা প্রশাখা সপ্তম আসমানে পৌঁছেছে। এ বৃক্ষটি এত প্রশস্ত যদি কোন অশ্বারোহী ৭০ বছর ধরে চলে তবু ঐ বৃক্ষটির ছায়ার বাইরে যেতে পারবেনা।

আর হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যদি কোন অশ্বারোহী একশ' বছরও চলতে থাকে, তবু সিদরাতুল মুনতাহার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।[২]

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫১
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৫০

সিদরা অর্থ হল কুল বৃক্ষ। আর মুনতাহা হল "শেষ প্রান্ত"। হাদীস শরীফে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঊর্দ্ধলোক, উদ্ধলাকের মধ্যখানে সপ্তম আকাশে এই বৃক্ষটি স্থাপিত আছে। নিচের সব কিছু এখানে এসেই শেষ হয়। এর উপরে আর কিছুই যেতে পারেনা, আর যা কিছু এর উপরে আছে, তা এর নিচে যায়না। উভয় পক্ষের আদান প্রদান হয় সিদরাতুল মুনতাহায়। শবে মে'রাজে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এখানেই বিদায় নিয়েছিলেন, কেননা এর উপরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এর উপরে যেতে পেরেছেন একমাত্র হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, সিদরাতুল মুনতাহা একটি বৃক্ষ যা অলংকার, পোষাক, ফল এবং রকমারী বর্ণে সুসজ্জিত। যদি তার একটি পাতা পৃথিবীতে ঝরে পড়ে, তবে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে আলোকিত করার জন্যে যথেষ্ট হবে, এটিই "তুবা"।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى

(তার কাছেই রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া।)

তফসীরকার আতা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি এমন এক জান্নাত, যা জীব্রাঈল (আঃ) এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের রাহে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যারা প্রাণ উৎসর্গ করে শাহাদাতের মর্তবা লাভ করেন, তারা জান্নাতুল মাওয়াতে অবস্থান করবেন।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى

'যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল'।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকের নূর ঐ বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, যে কারণে বৃক্ষটি চমকাচ্ছিল।

আল্লামা বগভীর (রঃ) আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি সিদরাতুল মুনতাহার প্রতিটি পাতায় একজন ফেরেশতাকে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখেছি, যে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছিল।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى

(তাঁর দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়নি)

অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি ডানে বামে যায়নি এবং তাঁর নয়ন যুগল বিভ্রান্ত হয়নি; বরং সঠিক স্থানেই ছিল নিবদ্ধ। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী ماطغى শব্দটির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের যে সব বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ তাঁকে দেখার আদেশ দেয়া হয়েছিল, তা থেকে তাঁর চক্ষু ক্ষণিকের জন্যেও সরে পড়েনি।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চক্ষু যা দেখেছে তা সঠিক দেখেছে, আর তাঁর অন্তর সঠিকভাবে তা উপলব্ধি করেছিল। তাঁর চক্ষু ভুল করেনি।

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

'তিনি তাঁর প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন সমূহ দেখেছেন'।

শবে মে'রাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন তারই উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে। তফসীরকারগণ বলেছেন, বোরাক, আসমান, আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত এবং বিভিন্ন প্রকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা, সিদরাতুল মুনতাহা প্রভৃতি। এসবই নিঃসন্দেহে বড় বড় বিস্ময়কর নিদর্শন।

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত কিছু হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ আয়াতে যে নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা হলো, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) আলোচ্য আয়াত পাঠ করেছেন এবং বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিন সবুজ বর্ণের রফরফ দেখেছেন যা আকাশের এক প্রান্তকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল।

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾
وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ
وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ
الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

তরজমা

(১৯) তোমরা কি লাত ও উজ্জার প্রতি লক্ষ্য করেছ?

(২০) এবং তৃতীয় আর একটি মানাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?

(২১) তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে? আর কন্যা সন্তান আল্লাহ্ পাকের জন্যে?

(২২) এমন বন্টন তো অসঙ্গত।

(২৩) এগুলো কয়েকটি নাম মাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ। আল্লাহ্ পাক এর কোন দলিল প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা শুধু অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে হেদায়েত এসেছে।

(২৪) মানুষ যা চায় তা কি সে পায়?

(২৫) বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ এক আল্লাহ্ পাকেরই হাতে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালত এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার বিবরণ ছিল, এ পর্যায়ে মে;রাজের উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াত সমূহে শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। মুশরেকদের নিজেদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর সম্মুখে মাথা নত করার যে কোন যুক্তি নেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, তা তারা তৈরী করছে। মহান আল্লাহ পাকের বন্দেগী না করে লাত, উজ্জা, মানাত প্রভৃতি দেবতার পূজা করা নিঃসন্দেহে চরম ধৃষ্টতা, অথচ বর্বরতার যুগে আরবদের নিকট লাত, উজ্জা, মানাত নামক এ দেবতারাই ছিল সম্মানিত এবং পূজনীয়।

তাই আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক লাত উজ্জার ভক্তদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন,

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ- وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ

'তোমরা কি লাত, উজ্জার প্রতি লক্ষ্য করেছ? এবং তৃতীয় আর একটি মানাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছো'?

অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম ও উচ্চ মর্তবার শান দেখার পর, তাঁর কুদরত হেকমতের অনন্ত অসীম জীবন্ত নিদর্শন দেখার পর এসব হীন বস্তুর সম্মুখে মাথা নত করার কোন যুক্তিই নেই। এটি নিঃসন্দেহে মানবতার অবমাননা। মানুষের জন্যে অত্যন্ত মর্যাদা হানিকর কাজ। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তাই মানব জাতি শুধু এক আল্লাহ পাকের সম্মুখেই মাথা নত করতে পারে, আর কারো সম্মুখে নয়। লাত নামক মূর্তিটি ছিল একটি সাদা পাথরের। এর উপর তারা গেলাফ চড়িয়ে রাখতো। সাকীফ নামক গোত্র এর পূজারী ছিল। আওস, খাজরাজ, খোজাআ গোত্রের লোকেরাও এর ভক্ত ছিল। তায়েফবাসীরা মানাতের পূজা করতো।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, কথিত আছে, লাত নামক একজন ভাল মানুষ ছিলেন। হজ্জের মওসুমে সে হাজীদেরকে পানিতে ছাতু ভিজিয়ে পান করাতো। এ ব্যক্তির মৃত্যু হলে লোকেরা তার কবরের পার্শ্বে একত্রিত হতে শুরু করে। পরবর্তীতে ঐ লাত নামক একটি মূর্তি তৈরী করে তারা পূজা করতে থাকে।

এমনিভাবে 'উজ্জা' 'আজীজ' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। মক্কা ও তায়েফের মধ্যে নাখলা নামক স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল। তাকেই উজ্জা বলা হত। কুরায়শরা এর সম্মান করতো। তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধের দিন আবু সুফিয়ান গৌরব করে বলেছিল, "আমাদের উজ্জা আছে, তোমাদের তা নেই"। এর প্রতি উত্তরে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে একথা বলার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "আমাদের মওলা হলেন আল্লাহ পাক, তোমাদের কোন মওলা নেই"।

বোখারী শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি (ভুলবশত) লাত ও উজ্জার শপথ করে বসে, তার কর্তব্য হল সঙ্গে সঙ্গে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, আস জুয়া খেলবো, তার কর্তব্য হল সদকা করা।

এই হাদীসের তাৎপর্য হলো, বর্বরতার যুগে মানুষ যেহেতু এমন শপথ করতো, তাই অভ্যাস বশত যদি এমন কথা বের হয়ে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে কলেমায়ে তায়্যেবা পাঠ করা উচিত। একবার হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ভুলবশত লাত ও উজ্জার শপথ করেছিলেন। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেন। তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" পাঠ কর এবং তিনবার "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম" পাঠ কর এবং বাম দিকে থুথু ফেল, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর করোনা।

মানাত নামক মূর্তিটি ছিল মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যখানে অবস্থিত "কাদীদ" নামক স্থানে। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা এখান থেকেই এহরাম বেঁধে হজ্জের জন্যে মক্কা শরীফে হাযির হতো।

এবনে এসহাক লিখেছেন, কোরায়শ ও বনু কেনানা উজ্জা নামক মূর্তিটির পূজারী ছিল। আর বনু শায়বান নামক গোত্রের লোকেরা এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। বনু শায়বান গোত্র বনু সা'লীম গোত্রেরই একটি অংশ ছিল, তাদের সাথে মক্কার বনু হাশেম গোত্রের বন্ধুত্ব ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)-কে উজ্জা নামক মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি যথা সময়ে এ নির্দেশ পালন করেছিলেন।

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমান ও মুশরেকদের যৌথ সমাবেশে সূরা নজম পাঠ করেন এবং আল্লাহ পাককে সেজদা করেন। তখন মুসলমানদের সাথে মুশরেকরাও পবিত্র কোরআনের এ সূরার মহিমায় অভিভূত হয়ে সেজদা করে। অবশ্য পরে তারা বিভিন্ন কথা বলে লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মানুষ মাত্রেরই এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা কর্তব্য এবং এসব প্রাণহীন জড় পদার্থের পূজা অর্চনা থেকে বিরত থাকা একান্ত করণীয় কাজ।

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

'তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে আর কন্যা সন্তান আল্লাহ পাকের জন্যে? এমন বন্টন তো সম্পূর্ণ অসঙ্গত, এগুলো কয়েকটি নাম মাত্র যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা রেখেছ, আল্লাহ পাক এর কোন দলিল প্রমাণ নাযিল করেননি'।

মক্কার কাফেররা তাদের দেবতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা বলতো, (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক) আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক তোমরা নিজেদের জন্যে পুত্র সন্তান পছন্দ করলে, আর মহান আল্লাহ পাকের জন্যে কন্যা সন্তান? এটি নিঃসন্দেহে বড় বাড়াবাড়ি, অবিচার, অযৌক্তিক, অসুন্দর এবং নিতান্ত অসঙ্গত বন্টন।

মূলতঃ তোমরা এবং তোমাদের পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষরা কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ব্যতীতই এগুলোকে নিজেদের উপাস্য বলে গ্রহণ করেছ এবং তোমাদের ইচ্ছা মাফিক

তোমরা এগুলোর নামকরণ করেছ। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এজন্যে কোন দলিল প্রমাণ নাযিল করা হয়নি, তাই যা কিছুর তোমরা উপাসনা কর, প্রকৃতপক্ষে এগুলো উপাস্যই নয়।

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى

'তারা শুধু নিজেদের অনুমান এবং প্রবৃত্তির বশেই এমন করছে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে হেদায়েত এসেছে'।

আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত আসার পরও তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে, হেদায়েতের আলো তারা গ্রহণ করছে না। অন্যায় অনাচার, কুসংস্কার, অহংকার এবং অবিচারের পথই তারা গ্রহণ করেছে।

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى

'মানুষ যা চায় সে কি তা পায়'?

এ মুশরেকরা আশা করে যে তাদের বিপদ মুহূর্তে তাদের হাতে গড়া দেবতারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এভাবে তাদের আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে এবং আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করে, তাদের সে আশার গুড়ে বালি। মানুষ যা চায় তা কি পায়? কেননা আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ্ মাফ করতেও পারেন"।

অতএব, যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে আর এ ধারণা করে যে তাদের উপাস্যরা তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদেরকে বিপদমুক্ত করবে, সে আশা কখনও পূর্ণ হবার নয়।

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى

বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ এক আল্লাহ্ পাকেরই হাতে, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে জীবন যাপন করবে, তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য তাদের জন্যেই সুনিশ্চিত।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ
بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ
عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۡ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৬) আর আসমান সমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোন উপকারেই আসবেনা, যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি দান না করেন।

(২৭) যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, তারাই মেয়েদের নামে ফেরেশতাগণের নামকরণ করে।

(২৮) অথচ এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা শুধু নিজেদের ভিত্তিহীন কল্পনার ওপর চলে, অথচ সত্যের মোকাবেলায় অলীক কল্পনার কোন মূল্যই নেই।

(২৯) অতএব, (হে রসূল!) যে আমার স্মরণে বিমুখ, তাকে আপনি উপেক্ষা করে চলুন, সে তো পার্থিব জীবন ব্যতীত কিছুই চায়না।

(৩০) বস্তুতঃ এ পর্যন্তই তাদের বিদ্যার দৌড়। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হলো, আর তিনিই ভাল জানেন, কে হেদায়েত প্রাপ্ত হলো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুশরেকদের উপাস্যদের কথা ছিল, পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, মুশরেকদের এ উপাস্যদের কোন গুরুত্বই নেই, তারা যখন যাকে ইচ্ছা তাকে নিজেদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, অথচ এ উপাস্যদের কোন শক্তি নেই, তারা জড় পদার্থ, চরম অসহায়। মুশরেকরা এ ভ্রান্ত

ধারণা পোষণ করতো যে, সংকটময় মুহূর্তে তাদের উপাস্যরা তাদের স্বপক্ষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করবে। মুশরেকদের এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করার লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে,

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى

'আর আসমান সমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোন উপকারেই আসবেনা, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তাকে অনুমতি দান না করেন'।

অর্থাৎ মুশরেকদের এসব হাতে গড়া উপাস্যদের সুপারিশ করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য অগণিত ফেরেশতা আসমানে রয়েছে, তাদেরও কারো পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার নেই, তবে আল্লাহ্ পাক যাকে পছন্দ করেন, এবং যাদের পক্ষে সুপারিশ করা পছন্দ করেন, তাদেরকে যখন তিনি দয়া করে অনুমতি দান করেন, এমন অনুমতি প্রাপ্ত ফেরেশতারাই আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করতে পারে, যেমন "সূরা নাবায়" আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

"দয়াময় আল্লাহ্ পাক যাকে অনুমতি দান করবেন, সে ব্যতীত অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে যথার্থ কথা বলবে"।

সূরা ইনফিতারে এ বিষয়টিকে অন্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ

"সেদিন একের অপরের জন্যে কিছুই করার সামর্থ্য থাকবেনা এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে এক আল্লাহ্ পাকের"।

অতএব, কাফেরদের পক্ষে তাদের মনগড়া উপাস্যরা কোন প্রকার সুপারিশ যে করতে পারবেনা, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন, মুশরেকরা যে সব ফেরেশতাদের উপাসনা করে, এ আশায় যে তারা কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর মহান দরবারে সুপারিশ করতে পারবেনা। আর সমস্ত ফেরেশতা একত্রিত হয়ে সুপারিশ করলেও তা উপকারী হবেনা, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যাকে অনুমতি প্রদান করা হয়, আর যার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়, শুধু তাকেই সুপারিশ করার সুযোগ দেয়া হবে।

আল্লাহ পাক কাফেরদের প্রতি তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণেই অসন্তুষ্ট এবং তাদের উপাস্যদের প্রতিও তিনি নারাজ, অতএব কাফেরদের পক্ষে সুপারিশ করার কেউ থাকবেনা।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ

'নিশ্চয় যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, তারাই মেয়েদের নামে ফেরেশতাদের নামকরণ করে'।

বস্তুতঃ যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করেনা এবং এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আসবে এবং এ জীবনের কর্মফল সেখানে ভোগ করতে হবে, একথায়ও যারা বিশ্বাস করেনা, তারাই তাদের মেয়েদের নামে ফেরেশতাদের নামকরণ করে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা শুধু নিজেদের ভিত্তিহীন কল্পনার অনুসরণ করে। কিছুমাত্র জ্ঞানবুদ্ধিও যদি তাদের থাকত, তবে তাদের অনুমান ও কল্পনার অনুসরণ করতো না, আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কল্পনা দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে পার পাওয়া যায় না, অতএব তাদের শাস্তি অবধারিত। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেনঃ

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا

'(হে রসূল!) যারা আমার স্মরণ থেকে বিমুখ, আর দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ উল্লাস ব্যতীত তাদের কিছুই কাম্য নয়, আখেরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল, তাদের ব্যাপারে আপনি ভ্রুক্ষেপ ও করবেন না'।

অর্থাৎ হে নবী! যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা এবং আখেরাতের সাফল্য চায় না, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনই তাদের কাম্য এবং লক্ষ্য, তাদের নিকট সত্যকে যতভাবেই পেশ করা হোক না কেন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না।

আলোচ্য আয়াতের ذكر শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অথবা এর অর্থ হলো ঈমান বা আল্লাহ পাকের স্মরণ, এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে বিমুখ থাকে, অথবা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বা আল্লাহ পাকের স্মরণের ব্যাপারে গাফেল থাকে, তাদেরকে উপেক্ষা করুন।

وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ যে পার্থিব জীবন ব্যতীত কিছুই চায় না, এ জীবনের আনন্দ উল্লাসই তার কাম্য, পরকালীন জীবন সম্পর্কে উদাসীন, তাকে তার হালে ছেড়ে দিন।

মুশরেকদের মূর্খতা এবং ধৃষ্টতা যখন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত হেদায়েত সম্পর্কে তারা যখন উদাসীন, আর তারা এমন পাথরগুলোর পূজা করে যা তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে তারা যখন বিমুখ, তখন তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দিন। তাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, অতএব (হে রসূল!) আপনি তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। তাদের অবস্থা চতুঃস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও মন্দ। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা বলতে পারেনা এবং বিশ্বাস করতে পারেনা যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দ্বারা, তারা নারী হতে পারে। মূলতঃ তারা নরও নয়, নারীও নয়। অথচ নির্বোধ মুশরেকরা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা, এটি তাদের কল্পনা প্রসূত কথা, এর কোন দলিল প্রমাণ তাদের নিকট নেই, তাদের এ ভিত্তিহীন অলীক কল্পনা সত্যের মোকাবেলায় টিকতে পারেনা। অতএব (হে রসূল!) যারা পবিত্র কোরআনকে মানেনা অথবা যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা, এ ক্ষণস্থায়ী জগত ও জীবনের মায়ায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ, আখেরাত সম্পর্কে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, তারা পরিণামদর্শী নয়, তারা নিজেদের কল্যাণকামী নয়, তাই তারা উপেক্ষিত হওয়ারই যোগ্য।

কিন্তু যেহেতু জাগতিক বিষয়ে তাদের কর্ম তৎপরতা এবং সাময়িক সাফল্য দেখে মনে হয় যে বুদ্ধি বিবেচনার কিছু অংশ তাদেরকেও দেয়া হয়েছে, মানব মনের এ ধারণা দূর করার জন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى

বস্তুতঃ এ পর্যন্তই তাদের বিদ্যার দৌড় (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হলো, আর তিনিই ভাল জানেন কে হেদায়েত প্রাপ্ত হলো।

দুনিয়ার জীবনে উন্নতি করা তথা অর্থ সম্পদ রোজগার করা পর্যন্তই তাদের বিদ্যার দৌড়, এর বেশি তারা কিছুই জানেনা ও মানেনা। মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে সে জীবনে প্রত্যেকটি মানুষকে তার এ জীবনের কর্মফল ভোগ করতে হবে, এ জীবনের কর্ম যদি ভাল হয়, তথা ঈমান ও নেক আমল যদি থাকে তবে তার শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে যদি ঈমান ও নেক আমলের অভাব হয়, তবে তার শোচনীয় পরিণতি অনিবার্য, এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তার ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত নয়, আল্লাহ পাকই জানেন কে পথভ্রষ্ট কে হেদায়েত প্রাপ্ত। তিনি প্রত্যেকের

সকল কথা শ্রবণ করেন এবং সকল কাজ প্রত্যক্ষ করেন। অতএব, প্রত্যেকের পরিণতি সম্পর্কে এক আল্লাহ পাকই সম্পূর্ণ অবগত। যারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে তাদেরকে তিনি জান্নাত দান করবেন, আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তিনিই তাদের শাস্তি বিধান করবেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ
اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾ اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ﴿٣٣﴾ وَاَعْطٰى
قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿٣٤﴾ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ
بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ﴿٣٧﴾ اَلَّا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾

তরজমা

(৩১) আর আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের, যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি তাদের কর্মের শোচনীয় পরিণতি ভোগ করতে দেন। আর যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে দান করেন উত্তম পুরষ্কার।

(৩২) যারা ছোট-খাট অন্যায় কাজ করলেও মহা পাপ এবং অশ্লীল আচরণ থেকে বিরত থাকে (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক তাদেরকে মাফ করে থাকেন) আপনার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম, আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা মাতৃ-গর্ভে অবস্থান করেছিলে, তখনও তিনি তোমাদেরকে খুব ভাল করে জানতেন, অতএব তোমরা আত্ম প্রশংসায় মত্ত হয়োনা, আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন কে পরহেযগার?

(৩৩) (হে রসূল!) যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আপনি কি তাকে দেখেছেন?

(৩৪) সে দান করে অত্যন্ত সামান্যই এবং পরে বন্ধ করে দেয়।

(৩৫) তবে কি তার নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা সে দেখতে পায়?

(৩৬) তাকে কি অবগত করা হয়নি যা রয়েছে মূসার কিতাবে।

(৩৭) এবং ইব্রাহীমের সহীফায় যিনি তার কথা সত্যে পরিণত করেছিলেন।

(৩৮) কোন বাহকই যে অন্যের বোঝা ওঠাবে না।

(৩৯) আর মানুষ নিজে যা করে সে শুধু তাই পায়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকই জানেন কে পথভ্রষ্ট এবং কে হেদায়েত প্রাপ্ত। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের। বিশ্বের সব কিছুর তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা ও রিয্কদাতা। মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড সবই আল্লাহ পাকের নখদর্পণে রয়েছে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। সমগ্র সৃষ্টি জগতই এক আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। অবশেষে আল্লাহ পাক নেককারদের দান করবেন পুরষ্কার, আর যারা অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হবে তাদের কুকর্মের শাস্তি তারা ভোগ করবে, এতে বাধা দান করতে পারে এমন শক্তি কারোই নেই।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ

"যারা ছোট-খাট অন্যায় কাজ করলেও মহা পাপ এবং অশ্লীল আচরণ থেকে বিরত থাকে"।

আলোচ্য আয়াতের اللمم শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

(১) কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করা, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত না করা।

(২) যত সগীরা গুনাহ রয়েছে, সবই اللمم এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) যে সগীরা গুনাহ বারে বারে করা হয় না, এতে অভ্যস্ত হয়না, এমন সগীরা গুনাহকেও اللمم বলা হয়, কেননা সগীরা গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা আর সগীরা গুনাহ থাকেনা।

(৪) তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এর দু'টি পন্থা রয়েছে।

(ক) এমন গুনাহ আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যার শাস্তির কথা ঘোষণা করেননি, এমনকি আখেরাতেও কি শাস্তি হবে তার কোন ঘোষণা নেই, এটি اللمم এর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) যদি কোন গুনাহ মুসলমানদের দ্বারা হয়ে যায়, এরপর সে ঐ গুনাহ থেকে তওবা করে ফেলে, তখন তা اللمم এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

'(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক তাদেরকে মাফ করে থাকেন) আপনার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম'।

পূর্ববর্তী আয়াতে পাপীষ্ঠ লোকদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের মাগফেরাতের ঘোষণা রয়েছে, যাতে করে যারা পাপাচারে লিপ্ত হয় তারা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ না হয়।

আবু নায়ীম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলে একজন নবী প্রেরণ করেছিলেন এ মর্মে যে, নিজের উম্মতের অনুগত লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে নিজেদের নেক আমলের ওপর যেন তারা ভরসা না করে, কেননা কেয়ামতের দিন যখন হিসাবের জন্যে তাদেরকে দন্ডায়মান করবো তখন যাকে ইচ্ছা তাকে অবশ্যই শাস্তি দেব, আর নিজের উম্মতের গুনাহগারদেরকেও জানিয়ে দাও, তারা যেন নিরাশ না হয়, কেননা আমি বড় বড় গুণাহও মাফ করে দেব।[১]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

غَلَبَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ

আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।

আল্লাহ পাক পরম করুণাময়, তাঁর অনন্ত করুণায় তিনি পাপীকেও ক্ষমা করেন। তিনিই ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا.....اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'(হে রসূল!) আপনি আমার এ ঘোষণা প্রচার করুন) হে আমার সেই বন্দাগণ! তোমরা যারা পাপাচারের কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

১। কবীরা গুণাহ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১-২৫

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

'আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন'।

অর্থাৎ যখন আল্লাহ পাক তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন থেকে তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তোমাদের সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল ছিলেন। তোমাদের জীবনে কি কি ঘটবে তাও আল্লাহ পাক জানতেন। পৃথিবীর কোন মানুষই জন্মের পূর্বে তার জীবন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনা, কিন্তু আল্লাহ পাক সবই জানেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আসমান জমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক মাখলুকের তকদীর লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে, সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক কলম সৃষ্টি করেছেন, এরপর আদেশ দিয়েছেন, লেখ। কলম আরজ করেছে, কি লিখব? আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, তকদীর লিপিবদ্ধ কর। আদেশ মোতাবেক কলম যা কিছু হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যা কিছু হবে সবই লিপিবদ্ধ করে।

ইমাম মালেক (রঃ), তিরমিজী ও আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্বীয় কুদরতী ডান হাত রেখে কিছু রুহ বের করলেন এবং এরশাদ করেছেন, আমি এদেরকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি, এরা জান্নাতীদের আমল করবে। এরপর আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে তিনি বাম হাত রেখে কিছু রুহ বের করেছেন এবং এরশাদ করেছেন, আমি তাদেরকে দোযখের জন্যে সৃষ্টি করেছি, আর তারা দোযখীদের আমল করবে। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তাহলে আমল কোন্ কাজে লাগবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক যে বন্দাকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেন তাকে জান্নাতবাসীদের কাজ করার তৌফিক দান করেন, এমনকি সে ব্যক্তি জান্নাতীদের ন্যায় আমলরত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যে বন্দাকে তিনি দোযখের জন্যে সৃষ্টি করেন তার দ্বারা

দোযখী আমলই করিয়ে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাকে দোযখে প্রবেশ করান।[১]

এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, তেবরানী, আবু নায়ীম, এবনে মরদবিয়া সাবেত এবনুল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইহুদীদের কোন শিশুর যদি মৃত্যু হত তখন তারা বলতো, এতো সিদ্দীক ছিল। এ খবর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ইহুদীরা মিথ্যা কথা বলে, কেননা কোন মানুষকে যখন আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেন তখন তাকে তার মায়ের পেটে থাকতেই তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে সে বদ হবে না নেক হবে। তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি তখন থেকেই তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছি।[২]

وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ

'আর যখন তোমরা মাতৃ-গর্ভে অবস্থান করছিলে, তখনও তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক অবগত ছিলেন'।

বর্ণিত আছে, মানব শিশু যখন তার মাতৃ উদরে চার মাসের হয় তখন আল্লাহ্ পাক তার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ঐ ফেরেশতা তার জীবন, কর্ম ও রিয্ক সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে, আর একথাও লিপিবদ্ধ করে যে সে ভাগ্যবান হবে না, ভাগ্যাহত হবে। এরপর সেই দেহের মধ্যে রুহ ফুঁকে দেয়া হয়। অতএব, শপথ সেই আল্লাহ্ পাকের! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সারা জীবন জান্নাতের কাজ করে, এমনকি তার মধ্যে ও জান্নাতের মধ্যে এক হাতের তফাত থাকে, এমন অবস্থায় তকদীরে যা লিপিবদ্ধ আছে তা প্রভাব বিস্তার করে, সে দোযখীদের ন্যায় কাজ করে এবং দোযখে চলে যায়। পক্ষান্তরে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সারা জীবন দোযখীদের ন্যায় কাজ করে এমনকি, তার মধ্যে আর দোযখের মধ্যে এক হাতের দূরত্ব থাকে, অবশেষে তার তকদীর প্রভাব বিস্তার করে এবং সে জান্নাতের আমল করে এবং জান্নাতে চলে যায়।[৩]

তফসীরকারগণ বলেছেন, মক্কার কাফেরদের তথাকথিত নেতা ওলীদ এবনে মুগীরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথায় কিছুটা আকৃষ্ট হয় এবং ইসলাম কবুল করার জন্যে প্রায় প্রস্তুত হয়। এ অবস্থা দেখে অন্য একজন কাফের তাকে বলে, তুমি ইসলাম কেন গ্রহণ করবে? ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৬৮
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪২
৩। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৬৯

যদি গুনাহ হয় তবে সেই গুনাহর বোঝা আমি নিজেই বহন করবো, তোমার যদি কোন শাস্তি হয় তবে আমি তা নিজেই মাথা পেতে নেব, অবশ্য যদি তুমি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ সম্পদ দাও। এসব কথার কারণে ওলীদের মনের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ইসলাম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে তকদীরে যদি ইসলাম গ্রহণের তৌফিক থাকে তবেই ইসলাম গ্রহণ করা এবং আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, এটি আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

'অতএব তোমরা আত্ম প্রশংসায় মত্ত হয়োনা, আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন কে পরহেযগার'।

আত্ম প্রশংসায় লিপ্ত হয়োনা

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের কর্মের পবিত্রতা বর্ণনা করোনা, কোন ভাল কাজ করার পর অথবা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার পর আত্ম প্রশংসায় লিপ্ত হয়োনা, কেননা তোমরা তোমাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে অবগত নও।

হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাক জানেন বন্দা কি কাজ করবে এবং তার পরিণতি কি হবে। এজন্যে তোমরা নিজেদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র মনে করোনা। আর কোন নেক আমল করতে পারলে এজন্যে আত্ম প্রশংসায় লিপ্ত হয়োনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

শানে নুযুল

তফসীরকার কালবী ও মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, লোকেরা কিছু ভাল কাজ করতো, এরপর গর্ব প্রকাশার্থে বলতো, আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের হজ্ব, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

(আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন কে পরহেযগার?)

অর্থাৎ মানুষের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ পাক জানতেন কে পরহেযগার হবে, আর কে হবেনা।

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাক যদি মানুষকে তাকওয়া পরহেযগারীর তৌফিক দান করেন, সততা, সত্যবাদিতা, উদারতা মহানুভবতার গুণ অর্জনের তৌফিক দান করেন, আল্লাহ

পাকের ভয় ও মহব্বতের গুণে গুণান্বিত করেন, তবে তাতে আত্মগরিমায় মেতে উঠতে নেই, অহংকার করতে নেই, কেননা মানুষ যদি কোন নেক আমল করেও তবে তাতে মানুষের কৃতিত্ব নেই, আল্লাহ পাকই এ সৌভাগ্য দান করেন। এক আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত নেক আমল করাও সম্ভব নয়, অতএব যদি নেক আমলের তৌফিক হয় তবে প্রধানতম কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার থাকা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ۞ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى

"(হে রসূল!) আপনি কি তাকে দেখেছেন যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? সে দান করে অত্যন্ত সামান্যই এবং পরে বন্ধ করে দেয়"।

আলোচ্য আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে সত্যের কাছাকাছি এসেও সত্য থেকে বিমুখ হয়েছে এবং আল্লাহর রাহে অত্যন্ত সামান্য দান করেছে, অবশেষে তা বন্ধ করে দিয়েছে।

শানে নুযুল

এবনে জরীর এবনে যায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। তখন একজন কাফের তাকে বলে, তুমি কি তোমার পূর্ব পুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিলে? আর তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করলে? সে ব্যক্তি বললো, আমি আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় করি, আর এজন্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি। ঐ কাফের বললো যদি তোমার প্রতি কোন আযাব আসে, তবে তা আমি নিজে মাথা পেতে নেব, অবশ্য এজন্যে তোমাকে কিছু অর্থ-সম্পদ দিতে হবে। তখন এ ব্যক্তি একথাকে লিপিবদ্ধ করে তার উপর সাক্ষীও রাখলো এবং তাকে কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে দিল, সে বাড়তি কিছু চাইলে তাও তাকে দেয়া হল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আস এবনে ওয়ায়েল সাহমী সম্পর্কে। এ ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমর্থক ছিল, আর কোন কোন বিষয়ে বিরোধিতা করতো।

মোহাম্মদ এবনে কাব কারযী বলেছেন, এ আয়াতে নাযিল হয়েছে আবু জেহেল সম্পর্কে। আবু জেহেল বলেছিল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নৈতিক গুণাবলী অর্জনে শিক্ষা দেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে ঈমান আনেনি।

وَاَعْطٰى قَلِيْلًا(সে কম দিল) কথাটির এটিই অর্থ যে, সে ইসলামের কোন কোন কথা মেনে নিল, অতঃপর وَّاَكْدٰى (সে বন্ধ করে দিল) অর্থাৎ সে ঈমান আনল না।

আর যারা এ মত পোষণ করেন যে এ আয়াত নাযিল হয়েছে ওলীদ এবনে মুগীরা সম্পর্কে তাদের মধ্যে মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ওলীদ মৌখিক স্বীকার করেছিল, কিন্তু অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে সামান্য দিয়ে বন্ধ করে দিল।[১]

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى

'তবে কি তার নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা সে দেখতে পায়'?

অর্থাৎ তার নিকট কি গায়বী এলম আছে? যার মাধ্যমে সে জানতে পারে যে আমি যদি ঐ ব্যক্তিকে আরও অর্থ-সম্পদ দিয়ে দিই তবে সে আমার শেরকের শাস্তি নিজের উপর তুলে নেবে। অথচ এটি অসম্ভব, অচিন্তনীয়। কেয়ামতের দিন কেউ কারো গুনাহর বোঝা নিতে পারবে না। একজনের অন্যায়ের জন্যে আরেকজনকে শাস্তি ভোগ করানো হবেনা, কেননা এটি অবিচার, কেয়ামতের দিন কারো প্রতি অবিচার করা হবেনা। একথার ঘোষণা ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট প্রেরিত সহীফাতেও রয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۝ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

'তাকে কি অবগত করা হয়নি, যা রয়েছে মুসার কিতাবে এবং ইব্রাহীমের সহীফায় যিনি তাঁর কথা সত্যে পরিণত করেছিলেন, কোন বাহকই যে অন্যের বোঝা ওঠাবে না'।

صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ

অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ কিতাব তওরাত এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট প্রেরিত সহীফা।

الَّذِي وَفَّىٰ

অর্থাৎ যিনি আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধান সঠিকভাবে পালন করেছেন, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর কথাকে তিনি সত্যে পরিণত করেছিলেন, যখন আল্লাহ পাক তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করার হুকুম দিয়েছিলেন, তখন ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আল্লাহ পাকের মহান বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে ছিলেন, মানুষ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৬৯-৭০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৬৪

তাঁকে চরম কষ্ট দিয়েছে, তিনি তাতে সবর অবলম্বন করেছেন, এমনকি নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছে, তিনি তাতেও সবর অবলম্বন করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى এর সম্পর্কে বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দিনের শুরুতে চার রাকাআত নামায আদায় করতেন।

এবনে জরীর ও এবনে আবি হাতেম হযরত মাআজ এবনে আনাস (রাঃ)-এর সূত্র বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রতি দিন সকাল সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ

যাহোক, আসমানী কিতাব সমূহে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

একের বোঝা অন্যকে বহন করতে হবেনা। যে যা করবে তার ফল বা শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। কেউ নেক আমল করলে যেমন অন্য কেউ তার ফল ভোগ করবে না, ঠিক তেমনি কেউ মন্দ কাজ করলে অন্য কেউ তার শাস্তি ভোগ করবে না।

আল্লামা বগভী (রঃ) একরামা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্বে লোকেরা একজন অপরাধীর স্থলে অন্যকে পাকড়াও করতো এবং তাকে শাস্তি দিত। একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেয়ার এ প্রথা ছিল সম্পূর্ণ জুলুম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মানুষকে এ কুপ্রথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

'আর মানুষ নিজে যা করে তারই ফল সে ভোগ করে'।

অর্থাৎ মানুষ মাত্রকে তার কর্মের ফলই দেয়া হবে, অপরের অপরাধের শাস্তিও কাউকে দেয়া হবেনা এবং অপরের নেক আমলের সওয়াবও কাউকে দেয়া হবে না।

তফসীরকার একরামা (রঃ) লিখেছেন, এ বিধান হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উম্মতের জন্যে ছিল। তবে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য হল এই, একজন আরেকজনের জন্যে নেক আমল করে তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে পারে এবং সে ব্যক্তি তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মৃত্যুর পরও উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা

এ মর্মে কয়েকখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আবু নাঈম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ পাক যখন কোন বন্দার রুহ কবজ করিয়ে নেন, তখন দু'জন ফেরেশতা তাকে নিয়ে আসমানে হাযির হয় এবং আরজ করে হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে এ মোমেনের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলে, এখন তুমি তাকে ডেকে নিয়েছ, তাই আমাদেরকে এখন অনুমতি দান কর, আমরা যেন যমীনে অবস্থান করতে পারি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, যমীন আমার বন্দাদের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাই তোমরা উভয়ে এ বন্দার কবরে অবস্থান কর, আর আমার তসবীহ তাহলীল এবং তাকবীর পাঠে কেয়ামত পর্যন্ত মশগুল থাক, আর এ মোমেন বন্দার জন্যে তার সওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাক।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেঃ অর্থাৎ যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি পথ খোলা থাকে (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) যে এলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি কোন দ্বীনি কিতাব রচনা করে যায় এবং মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়, (৩) যদি মৃত ব্যক্তির নেককার সন্তান তার জন্যে দোয়া করে। মৃত ব্যক্তি এ তিনটি পন্থায় উপকৃত হতে পারে।

এভাবে ইমাম আহমদ (রঃ) লিখেছেন, যদিও সদকায়ে জারিয়া এবং উপকারী এলম মানুষের নিজের আমলের ফলশ্রুতি কিন্তু নেককার সন্তানের দোয়ায় তার কোন মেহনত থাকেনা, এতদসত্ত্বেও এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

তেবরানী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ পাক জান্নাতে তাঁর নেককার বন্দাদের মর্তবা বুলন্দ করবেন। বন্দা আরজ করবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! কিভাবে আমার মর্তবা বুলন্দ হল? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমার পুত্র তোমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেছে, এজন্য তোমার মর্তবা বুলন্দ হল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কবরের ভেতর মানুষের এমন অবস্থা হয়, যেমন কোন ডুবন্ত ব্যক্তির অবস্থা, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি তথা আপনজনদের কাছে সে আশা করে এবং অপেক্ষা করে তাদের দোয়ার জন্যে, যদি কেউ তার জন্যে দোয়া করে তবে সে দোয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর সব কিছু থেকে তার কাছে প্রিয় হয়।

পৃথিবীর অধিবাসীদের দোয়ার কারণে কবরবাসীদেরকে আল্লাহ পাক পাহাড়ের সমান সওয়াব দান করেন। মৃতদের জন্যে জীবিতদের এ হাদীয়া হয় এস্তেগফার। (বায়হাকী)

তেবরানী অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের প্রতি দয়া করা হয়েছে, আমার উম্মত গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে এবং বেগুনাহ হয়ে কবর থেকে বের হবে। মোমেনগণ তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবে, ফলে সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে দোযখ থেকে বের হবে।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) বলেছেন, জীবিতদের দোয়ায় মৃতদের উপকার হয়। কোরআনে করীমের একখানি আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়।

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

'আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে মাগফেরাত দান কর, আর আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে'।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম!) আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন, তিনি কোন ওসিয়ত করে যেতে পারেননি, আমার ধারণা হল, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে তিনি কিছু দান খয়রাত করতেন, আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তবে কি তিনি সওয়াব পাবেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ হ্যাঁ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর মায়ের ইন্তেকাল হল। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার মাতার ইন্তেকাল হয়েছে, আমি উপস্থিত ছিলাম না, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে দান খয়রাত করি তা কি তাঁর নিকট পৌঁছবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। সাদ (রাঃ) আরজ করলেন, তবে আমি আপনাকে স্বাক্ষী করছি যে আমার বাগানটি আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে খয়রাত করলাম। (বোখারী)

ইমাম আহমদ (রঃ) লিখেছেন, হযরত সা'দ এবনে ওবাদা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম!) আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে এখন

তাঁর জন্যে কোন্ জিনিষের খয়রাত সবচেয়ে উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, পানি। একথা শ্রবণ করে হযরত সা'দ (রাঃ) একটি কূপ খনন করালেন এবং বললেন, এটি সা'দের মায়ের জন্য। তেবরানী এই হাদীস হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে সংকলন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নফল খয়রাত করে তবে সে যেন তার পিতা মাতার পক্ষ থেকে করে। এর সওয়াব তার পিতা-মাতা পাবে। আর তার নিজের সওয়াবেও কম করা হবেনা।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে বাড়িতে কারো মৃত্যু হয়, এরপর সে মৃত ব্যক্তির জন্য দান খয়রাত করা হয়, তবে জীব্রাঈল (আঃ) নূরের একটি পাত্রে সেই দান নিয়ে মৃত ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলেন, হে কবরের অধিবাসী, তোমার বাড়ীর লোকেরা তোমার জন্যে এ তোহফা প্রেরণ করেছেন, তুমি তা গ্রহণ কর। এভাবে সেই মৃত ব্যক্তি তোহফা গ্রহণ করে এবং খুশি হয়। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী কবরের অধিবাসীর জন্য কোন কিছু প্রেরিত না হওয়ার কারণে সে চিন্তিত হয়। (তেবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব করে, আল্লাহ পাক তার পিতা-মাতার জন্যে দোযখ থেকে নাজাত লিপিবদ্ধ করে দেন, তাদের জন্য হজ্জ্ব পরিপূর্ণ হয়, আর যে হজ্ব করলো তার সওয়াবও কম করা হয়না।

আবু আবদুল্লাহ সাকাফী হযরত যায়েদ এবনে আরকামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম, যার পিতা-মাতা হজ্জ্ব করতে পারেনি, সে যদি তাদের জন্য হজ্জ্ব করে তবে কি হুকুম? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তার পিতা-মাতা আজাদ হয়ে যাবে, আর আসমানে তাদের রুহগুলোকে সুসংবাদ দেয়া হবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে নেকী লিপিবদ্ধ হবে।

হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন স্ত্রীলোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ্ব করতে পারি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি বল যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকতো আর তুমি তা তোমার মায়ের তরফ থেকে আদায় করতে, তবে কি তা আদায় হয়ে যাবে? স্ত্রীলোকটি আরজ করলো, জ্বী হ্যাঁ অবশ্যই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব করার আদেশ দিলেন। (তেবরানী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে হজ্ব করবে, সে এত সওয়াবই পাবে যা মৃত ব্যক্তিকে দেয়া হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ফাতেহা, সূরা এখলাস এবং সূরা তাকাছুর পাঠ করে বলে যে এ সূরা সমূহের সওয়াব এ কবরস্থানের সকল নারী পুরুষকে বখশিশ করলাম, তাহলে আল্লাহ পাকের দরবারে ঐ কবরস্থানের সকলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থান অতিক্রম করে এবং এগারো বার কুল হুয়াল্লাহ শরীফ পাঠ করে এবং কবরস্থানের মুর্দাদের তা বখশিশ করে, তবে আল্লাহ পাক ঐ কবরস্থানের সকলের সংখ্যা মোতাবেক তাকে সওয়াব দান করবেন।[১]

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ
رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ
أَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ
إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَ
أَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَ
ثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ
وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ
الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا
الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ
سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾ السجدة

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৭৭-৮১
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৬৬

তরজমা

(৪০) আর নিশ্চয় তার চেষ্টা তাকে দেখানো হবে।

(৪১) এরপর তাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান দেয়া হবে।

(৪২) আর নিশ্চয় (সকলকে) অবশেষে আপনার প্রতিপালকের নিকটই পৌঁছতে হবে।

(৪৩) আর নিশ্চয় আল্লাহ পাকই (আনন্দে) হাসান (দুঃখে) তিনিই কাঁদান।

(৪৪) আর নিশ্চয় তিনিই মারেন এবং তিনিই বাঁচান।

(৪৫) আর তিনিই নর-নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন।

(৪৬) এমন এক ফোটা শুক্রবিন্দু থেকে, যা ফোটা ফোটা করে ফেলা হয়ে থাকে।

(৪৭) আর দ্বিতীয়বার উত্থিত করাও এক আল্লাহ পাকেরই কাজ।

(৪৮) আর তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন।

(৪৯) আর নিশ্চয় তিনিই শে'রা নামক নক্ষত্রেরও মালিক।

(৫০) আর নিশ্চয় তিনিই প্রাচীন আদ জাতিকে (তাদের নাফরমানীর কারণে) ধ্বংস করেছিলেন।

(৫১) এবং তিনিই সামুদ জাতিকে এমনভাবে (ধ্বংস করেছেন) যে তাদের কাউকেই বাকী রাখেননি।

(৫২) আর এদের পূর্বে নূহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছেন)। নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত সীমা লংঘনকারী এবং অবাধ্য।

(৫৩) আর (লুত সম্প্রদায়ের) উল্টানো আবাসভূমিকে সজোরে নিক্ষেপ করেছিলেন।

(৫৪) এরপর ঐ আবাসগুলোকে আচ্ছন্ন করেছিল সর্বগ্রাসী শাস্তি।

(৫৫) অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?

(৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এ নবীও একজন সতর্ককারী।

(৫৭) সেই আসন্ন বিষয় (কেয়ামত) নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।

(৫৮) আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তার অপসারণকারী নেই।

(৫৯) তবে কি তোমরা এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছো?

(৬০) এবং হাসি ঠাট্টা করছো? ক্রন্দন করছো না?

(৬১) আর তোমরা তো উদাসীন।

(৬২) অতএব, আল্লাহ্ পাককে সেজদা কর এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মানুষ তার চেষ্টার ফলশ্রুতি পাবে অর্থাৎ যা আমল করবে তার ফলই পাবে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى

'আর নিশ্চয় মানুষকে তার চেষ্টার ফল অতি সত্বর দেখানো হবে'।

একথার তাৎপর্য হলো, কেয়ামতের দিন যখন মোমেন মাত্রেরই আমলের পরিমাপ হবে তখন প্রত্যেকে তার জীবন-সাধনার ফল দেখতে পাবে।

কিন্তু কাফেরদের আমল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কেননা আমল কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান ও এখলাস পূর্ব শর্ত। ঈমান না থাকলে আখেরাতে কোন আমলেরই ফল পাওয়া যাবেনা। দ্বিতীয়তঃ এখলাস হল শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করা। যদি কেউ জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে, তবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই যারা মোমেন নয়, তাদের সাধনা ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত, যারা ঈমান ও এখলাস ব্যতীত সৎ কাজ করে, দুনিয়াতেই তারা সুনাম অর্জন করে ফেলে, আখেরাতে তাদের কোন প্রাপ্য থাকেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, سعى শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হল, দ্রুতগতিতে চলা। আর কোন কাজের চেষ্টা করার অর্থ বোঝানোর ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে মানুষ তাই পাবে, যার জন্যে সে কাজ করেছে এবং যে উদ্দেশ্যে করেছে। একথার তাৎপর্য হলো প্রত্যেকের কর্মের নিয়ত মোতাবেকই তার ফল হবে, যেমন বোখারী শরীফে সংকলিত প্রথম হাদীসেই রয়েছে ঃ

انما الاعمال بالنيات (الحديث)

অর্থাৎ আমলের ফল নিয়ত মোতাবেকই হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যার সে নিয়ত করেছে, অতএব যে হিজরত করেছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের দিকে, নিঃসন্দেহে তার হিজরত হবে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে, আর যে হিজরত করবে জাগতিক কোন লক্ষ্যে বা কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যের জন্যেই হবে, যার জন্যে সে হিজরত করেছে। অতএব, আলোচ্য আয়াতের মর্ম তাই, যা এই হাদীসের মধ্যে রয়েছে।

ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۞ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى

"এরপর তাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান দেয়া হবে। আর নিশ্চয় (সকলকে) অবশেষে আপনার প্রতিপালকের নিকটই পৌঁছতে হবে"।

অর্থাৎ মোমেন বন্দাকে তার জীবনের যাবতীয় সৎ কাজের পরিপূর্ণ উত্তম বদলা দান করা হবে, যা তার প্রাপ্য তা থেকে সামান্যও কম করা হবেনা। আর নিশ্চয় সকলকে অবশেষে (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের নিকটই পৌঁছতে হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى। এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী নিয়ে তোমরা চিন্তা করবে না, অর্থাৎ সকল চিন্তা ও গবেষণা এখানে এসে শেষ হয়ে যাবে।

এই হাদীসের মর্ম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও রয়েছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা কর, স্রষ্টার পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা করোনা, কেননা স্রষ্টার ব্যাপার মানব-জ্ঞানের উর্দ্ধে।

আবুশ শেখ এবং আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বিষয়েই চিন্তা কর কিন্তু আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বার ব্যাপারে চিন্তা করোনা, কেননা সপ্ত আসমানের উপরে আল্লাহ পাকের কুরসী পর্যন্ত সাত হাজার নূরের পর্দা রয়েছে, আর আল্লাহ পাক সর্বোচ্চে। এ হাদীসের তাৎপর্য হল, মানবীয় চিন্তা আল্লাহ পাকের কুরসী পর্যন্তই পৌঁছতে পারেনা, আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার তো প্রশ্নই ওঠেনা, তিনি যে সর্বোচ্চে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা কর, স্রষ্টার ব্যাপারে চিন্তা করোনা, কেননা সে সম্পর্কে তোমরা কোন ধারণাই করতে পারবে না। হযরত আবুজর (রাঃ) থেকেও এ মর্মের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। চিন্তা ও গবেষণার তাৎপর্য হল, অজানাকে জানার চেষ্টা করা, আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ, তাঁর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করা যায়, কিন্তু আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা করা যায় না।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى

'আর নিশ্চয় আল্লাহ পাকই (আনন্দে) হাসান, (দুঃখে) তিনি কাঁদান'।

তফসীরকারগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

(১) বন্দা যে কাজই করে, তার স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ পাকই, এমনকি তার হাসি-কান্নাও আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি। আর এজন্যেই আতা এবনে আবি মুসলিম বলেছেন, আল্লাহ পাকই মানুষকে আনন্দিত করেন, তিনিই চিন্তিত করেন।

(২) মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাকই জান্নাতের মধ্যে জান্নাতবাসীকে হাসাবেন, আর তিনিই দোযখবাসীকে দোযখে কাঁদাবেন।

(৩) যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল, যখন আল্লাহ পাক যমীনে সবুজ বৃক্ষ-লতা সৃষ্টি করেন তখন মনে হয় সমগ্র বিশ্ব হাসে, আর তিনিই আসমান থেকে বারিপাত করে তাকে কাঁদান।

(৪) আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত যাবের এবনে সামুরার (রাঃ) সূত্রে লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বসে পরস্পর কবিতা আবৃতি করতেন এবং জাহেলী যুগের কথা বলে হাসতেন এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে মুচকি হাসতেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) "শরহে সুন্নাহে" কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম কি হাসতেন? হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ যদিও তাদের অন্তরে ঈমান ছিল পাহাড়ের চেয়ে মজবুত।

বেলাল এবনে সাদ বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম দিনের বলা বিভিন্ন কাজে মশগুল থাকতেন, কিন্তু রাত্রিকালে তারা দুনিয়াত্যাগী এবাদত গুজার হয়ে যেতেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি কখনও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অট্টহাসি দিতে দেখিনি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু মুচকি হাসতেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত জরীর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার কাছে কোন কিছুই গোপন রাখেননি, আর যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন মুচকি হেসেছেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যাঁর কুদরতী হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তবে অধিক পরিমাণে কাঁদতে, হাসতে অনেক কম।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا

"আর নিশ্চয় তিনিই মারেন এবং তিনিই বাঁচান"।

অর্থাৎ যা কিছু প্রাণহীন বা অস্তিত্বহীন তাকে তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং প্রাণবন্ত করেন, যেমন একটি প্রাণহীন বীজকে একটি মহীরুহে পরিণত করেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, اَمَاتَ وَاَحْيَا কথাটির অর্থ হল আল্লাহ পাকই মানুষকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিকে জীবন দান করেন।

অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহ পাকই কাফেরদেরকে অজানার অচেনার, মূর্খতার মৃত্যু দিয়ে থাকেন আর মোমেনকে তিনিই মা'রেফাতের জীবন দান করেন থাকেন।

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر مثل الحى والميت

'যে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে এবং যে তাঁকে স্মরণ করেনা, তার দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের ন্যায়'।

যে জীবনের মালিক আল্লাহ পাককে স্মরণ করে সে থাকে জীবন্ত, আর যে আল্লাহ পাককে স্মরণ করেনা, সে হয় মৃত। যার মধ্যে হেদায়েত থাকে সে যেন জীবনী শক্তি লাভ করে, আর যে পথভ্রষ্ট এবং বিভ্রান্ত অবস্থায় জীবন কাটে, সে যেন থাকে মৃত। এজন্যেই মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেন ঃ

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق

ثبت است برجريدهٔ عالم دوام ما

'যার অন্তরে আল্লাহ পাকের এশক ও মহব্বত থাকে কখনও তার মৃত্যু হয় না, পৃথিবীতে আল্লাহ ওয়ালাগণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন'।

যাহোক, এ আয়াতের অর্থ হল, জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ পাকেরই হাতে, তিনি যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা মৃত্যুমুখে পতিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দান করেন, জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ পাকেরই বিস্ময়কর কুদরতের অপূর্ব মহিমা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে'।

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى۞ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى

'আর নিশ্চয় তিনিই নর-নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এমন এক শক্র বিন্দু থেকে যা ফোটা ফোটা করে ফেলা হয়ে থাকে'।

মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা এক আল্লাহ পাকেরই কাজ, শুধু তাই নয়; পুনরায় মৃতদেরকে জীবিত করাও তাঁরই কাজ। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى

'আর দ্বিতীয়বার উত্থিত করাও এক আল্লাহ পাকেরই কাজ'।

অবশেষে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে। আল্লাহ পাকই মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং কেয়ামতের ময়দানে হাযির করবেন। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের পক্ষে এটি কোন কঠিন কাজ নয়। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'এবং ভয় কর সেদিনকে যেদিন তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে, তখন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবেনা'।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى

'আর তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন'।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্ পাকেরই দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে অধিক পরিমাণে দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে অভাবগ্রস্ত করেন।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ

'আর আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক কমিয়ে দেন'।

অতএব, ধন-দৌলত, দারিদ্র্য এবং দৈন্য সব এক আল্লাহ্ পাকেরই হাতে।

তফসীরকারগণ বলছেন, اَقْنٰى শব্দটি اَغْنٰى শব্দের সমার্থক, তবে তার পূর্বে افقر শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সম্পদশালী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে দারিদ্র্য-পীড়িত করেন তথা পর মুখাপেক্ষী করেন। যেহেতু এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সকলেই এ সম্পর্কে অবগত, তাই اَفْقَرَ শব্দটির উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়নি।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, اَغْنٰى শব্দের অর্থ স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা তথা অর্থ-সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ পাক মানুষকে সম্পদশালী করে দেন, আর اَقْنٰى শব্দটির অর্থ হলো উষ্ট্র, গাভী, মহিষ, বকরী, প্রভৃতি দ্বারা আল্লাহ্ পাক কোন কোন লোককে ধনী করেন।

তফসীরকার কাতাদা এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন اَقْنٰى শব্দটির অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকই মানুষকে খেদমতগার দান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, اَغْنٰى ও اَقْنٰى এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাক মানুষকে স্বচ্ছলতা দান করেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, اَقْنٰى শব্দটির অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক যাকে কিছু দান করেন, তার উপর গ্রহীতাকে সন্তুষ্ট করেন।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন اَغْنٰى অর্থ তিনি অনেক কিছু দান করেন, আর اَقْنٰى অর্থ হলো, তিনি কম দান করেন।

এবনে যায়েদ (রঃ) এ ব্যাখ্যা করার পর يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন।

আখফাশ (রঃ) اقنى শব্দটির অর্থ করেছেন এভাবে যে, আল্লাহ পাকই মানুষকে অভাবগ্রস্ত করেন।[১]

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, اَقْنٰى শব্দটির অর্থ হল اَعْطٰى وَاَرْضٰى অর্থাৎ আল্লাহ পাকই মানুষকে দান করেন এবং তিনিই মানুষকে সন্তুষ্ট করেন।

বর্ণিত আছে যে, নাফে এবনুল আরযাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে اغنى ও اقنى শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল اغنى من الفقر অর্থাৎ আল্লাহ পাক দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করেন এবং সম্পদশালী করেন এবং اقنى অর্থ হল, যা কোন লোককে দান করেন, তার প্রতি তাকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং অধিক সম্পদ অর্জনের লোভ থেকে রক্ষা করেন।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এ সম্পর্কে তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন اغنى অর্থাৎ আল্লাহ পাকই ধন-সম্পদ দান করেন এবং প্রদত্ত সম্পদে তুষ্ট করেন।

কাতাদা এবং যাহ্যাক (রঃ)-ও অনুরূপ মতই পোষণ করেন।

আবুশ শেখ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اغنى অর্থ হল, আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে সম্পদশালী করেন এবং অন্য মানুষকে তার মুখাপেক্ষী করেন।[২]

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى

'আর নিশ্চয় তিনিই শে'রা নামক নক্ষত্রেরও মালিক'।

শে'রা একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন গোত্র এ নক্ষত্রটির পূজা করতো। তাদের ধারণা বিশ্ব-ব্যবস্থায় এ নক্ষত্রটির বিরাট প্রভাব রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের সতর্ক করে এরশাদ হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ পাকই শে'রা নামক নক্ষত্রের প্রতিপালক, তিনিই সৃষ্টি করেছেন, কেন তোমরা তার পূজা করছো? বণী খোজাআ গোত্রের লোকেরাই প্রধানত এ নক্ষত্রের পূজারী ছিল। যদিও নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সকলের প্রতিপালক এক আল্লাহ পাকই। আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮৭
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা- ১৪৫

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক শে'রা নক্ষত্রের প্রতিপালক। আল্লাহ পাক একথা বলে এ সত্য প্রকাশ করেছেন, তোমরা যে শে'রা নামক তারকার পূজা কর অথচ এ শে'রা নামক তারকাটি আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি, তাই তা এবাদতের উপযুক্ত নয়, যেমন লাত ও উজ্জা এবাদতের উপযুক্ত নয়, তেমনি শে'রাও। সম্ভবত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে লোকেরা শে'রার পূজা করতো এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ সহীফায় বিশেষভাবে শে'রা নামক নক্ষত্রের উল্লেখ রয়েছে।

وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادًا ِالْاُوْلٰى

'আর নিশ্চয় তিনিই প্রাচীন আদ জাতিকে (তাদের নাফরমানীর কারণে) ধ্বংস করেছিলেন'।

প্রাচীন আদ ছিল হযরত হুদ (আঃ)-এর জাতি। হযরত নূহ (আঃ)-এরউম্মতের পর সর্ব প্রথম অবাধ্য আদ জাতিকে তুফান দ্বারা ধ্বংস করা হয়। এদের বংশধরই ছিল সামুদ জাতি। তারাও ছিল অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, তাই তাদের সম্পর্কেও ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে–

وَثَمُوْدَاْ فَمَآ اَبْقٰى

'এবং তিনিই সামুদ জাতিকে এমনভাবে (ধ্বংস করেছেন) যে তাদের কাউকেই বাকি রাখেননি'।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতিকেই সামুদ জাতি বলা হয়। ভয়ংকর আওয়াজ দ্বারা আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। সামুদ জাতিকে "দ্বিতীয় আদ" বলা হয়।

فَمَآ اَبْقٰى

অর্থাৎ সামুদ জাতির সকলকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, তাদের কাউকে অবশিষ্ট রাখেননি।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى

'আর এদের পূর্বে নূহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছেন), নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত সীমা লংঘনকারী এবং অবাধ্য'।

অর্থাৎ আদ ও সামুদ জাতির পূর্বে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতিকেও ধ্বংস করেছেন। হযরত নূহ (আঃ) তাদেরকে সাড়ে নয়শত বছর যাবত আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের এবং দ্বীন ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানের সাড়া দেয়নি শুধু তাই নয়; বরং

তারা হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতো, তিনি সঙ্গাহীন হয়ে পড়ে থাকতেন। এ অবস্থায় তারা তাঁকে ছেড়ে চলে যেত, বস্তুতঃ নূহ (আঃ)-এর জাতি ছিল অত্যন্ত বড় জালেম এবং অতীব সীমা লংঘনকারী, তারা ছিল অবাধ্য।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ۞ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى

'আর (লুত সম্প্রদায়ের) উল্টানো আবাস ভূমিকে তিনি সজোরে নিক্ষেপ করে ছিলেন। এরপর ঐ আবাসগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সর্বগ্রাসী শাস্তি'।

সদুমবাসী যখন হযরত লুত (আঃ)-এর হেদায়েত মেনে নিতে প্রস্তুত হলোনা তখন তাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হয়। প্রথমতঃ আসমান থেকে তাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। যে ব্যক্তির প্রতি প্রস্তরর নিক্ষিপ্ত হবে তার নামটি ঐ পাথরে লিপিবদ্ধ থাকে। এরপর ঐ জমিনটিকে উল্টে দেয়া হয় আর এভাবে সদুমবাসীকে ধ্বংস করা হয়।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى

'অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে'?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবে, "অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে মিথ্যা জ্ঞান করবে? মূলতঃ এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে যে, তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে তুমি অস্বীকার করবে তথা কারো জন্যেই উচিত নয় আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করা, মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের নেয়ামত, তাই কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর মহান দরবারে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى

'অতীতের সতর্ককারী নবী রসূলগণের ন্যায় এ নবীও একজন সতর্ককারী'।

অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবেই প্রেরিত হয়েছেন, যেভাবে ইতিপূর্বে বহু নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানব জাতির হেদাযেতের লক্ষ্যে আল্লাহ পাক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। এটি তো নতুন কথা নয়। পূর্বের নবী রসূলগণের ন্যায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও সর্বকালের মানুষের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। অতএব, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নে ও তাঁর অনুসরণেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ, পরিপূর্ণ সাফল্য।

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ

'সেই আসন্ন বিষয় (কেয়ামত) নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তার অপসারণকারী নেই'।

অর্থাৎ কেয়ামত সমাগত, যদিও কেয়ামতের সঠিক সময় এবং নির্দিষ্ট মুহূর্তটির কথা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কেয়ামত অতি নিকটবর্তী হয়েছে, কেয়ামতের বহু নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং কেয়ামতকে প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা কারোই নেই।

তফসীরকার আতা (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা এবং তার বিপদাপদ থেকে আল্লাহ পাক ব্যতীত মোমেনদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।[১]

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা দেখ, অযোগ্য লোকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা কর।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার এবং কেয়ামতের দৃষ্টান্ত এমন, এরপর তিনি তাঁর শাহাদাতের আঙ্গুল এবং মধ্যের আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছেন, যতখানি তফাত এবং দূরত্ব রয়েছে এ দু' আঙ্গুলের মধ্যে ততখানি তফাত এবং দূরত্ব রয়েছে তাঁর এবং কেয়ামতের মধ্যে।

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۞ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۞ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ

'তবে কি তোমরা এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছো? এবং হাসি-ঠাট্টা করছো? ক্রন্দণ করছো না?

অর্থাৎ তবে কি তোমরা আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে ক্রন্দণ করছোনা? আর তোমরা অহংকার করছো, কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা এবং তা নিকটবর্তী হয়েছে একথা জেনেও তোমরা এতটুকু বিচলিত হওনা? বিনীত হয়ে ক্রন্দণ করার স্থলে তোমরা হাসি-ঠাট্টা করছো? যা কোন অবস্থাতেই তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। নিজেদের কৃত গুনাহর জন্যে ক্রন্দণ করছো না? তোমাদের কর্তব্য হলো আখেরাত সম্পর্কে গাফলত পরিত্যাগ করা, আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৭১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড- ১১, পৃষ্ঠা-১৮৯

একরামা (রঃ) বলেছেন, সামেদুন শব্দটির অর্থ হলো গান বাজনায় লিপ্ত হওয়া, কেননা যখন মক্কার কোরায়শরা কোরআনে করীম শ্রবণ করতো তখন তারা গান-বাজনায় লিপ্ত হতো, তাই এরশাদ হয়েছে, তোমরা ক্রন্দণ করছো না এবং গান-বাজনায় লিপ্ত থাক।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, "সামেদুন" অর্থ অহংকারী, মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ক্রোধের সাথে প্রত্যাখ্যানকারী।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো অহংকারী এবং যে নিজেকে বড় মনে করে।

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস (রাঃ) এ মতও পোষণ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামায আদায় করতেন তখন কাফেররা গর্ব প্রকাশ করে স্থান ত্যাগ করতো, আর তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ঃ

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا

'অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে সেজদা কর এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী কর'।

অর্থাৎ অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর মহান দরবারে বিনীতভাবে, হাযির হও, তাঁর পক্ষ থেকে সওয়াব প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে এবং শাস্তি প্রদানের সতর্কবাণীতে পরিপূর্ণ একীন কর। উপদেশ বাণী শ্রবণ করে তা বিশ্বাস করা এবং তা গ্রহণ করে কল্যাণ অর্জন করা বুদ্ধিমান মানুষেরই কর্তব্য। আর কারো সতর্কবাণী শ্রবণ করে সে অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করাও কল্যাণকামী মানুষের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু এ সূরার বিভিন্ন আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আলো-আঁধার, জীবন-মৃত্যু এক কথায় সব কিছুই এক আল্লাহ পাকের হাতে, যখন তোমরা এ সত্যের সন্ধান পেয়েছ তখন তোমাদের কর্তব্য হলো সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে সেজদারত হওয়া এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী করা, তাঁর দরবারে অত্যন্ত বিনীতভাবে হাযির হওয়া।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে, আবু দাউদ ও নেসায়ী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, এ সূরা নাযিল হবার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেজদা করেন, এবং এক ব্যক্তি ব্যতীত উপস্থিত সকলে সেজদা করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেছেন, নামাযে তিনি সূরা আন্ নজম পাঠ করে তাতে সুদীর্ঘ সেজদা করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কমর

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ① وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا

سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ② وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ③

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

(২) তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, এ-তো প্রচলিত যাদু মাত্র।

(৩) আর তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশী মতে চলে, আর প্রত্যেকটি কাজেরই একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।

সূরা কমর প্রসঙ্গে

সূরা কমর মক্কায় অবতীর্ণ, এতে ৫৫ আয়াত, ৩৪২ বাক্য এবং ১,৪০৩টি অক্ষর রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এ সূরার ফজিলত

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) এ মর্মে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা কমর পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন এ অবস্থায় সে হাযির হবে যে, তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড–৬, পৃষ্ঠা- ১৪৭

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফেতরের নামাযে সূরা ক্বাফ এবং সূরা কমর পাঠ করতেন।

এ সূরার আমল

সূরা কমরকে জুমআর দিন নামাযের পূর্বে লিপিবদ্ধ করে আমামার ভেতর রাখা হলে ঐ ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি পায়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে থাকবে, সে যাদু সহ সকল বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

মূল বক্তব্য

এ সূরার প্রারম্ভেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ মোজেযার উল্লেখ রয়েছে, যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এ সূরায় কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ সূরায় তৌহীদ এবং রেসালতের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, ঈমান ও নেক আমলের জন্যে পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি নাফরমানীর শাস্তি সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এমনিভাবে এ সূরায় মানুষের পুনর্জীবনের কথাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে কোরআনে করীমকে সহজ করা হয়েছে, পূর্বকালে যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে, তাদের কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তা-ও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউনের দলবল প্রভৃতিকে তাদের নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তার উল্লেখ এ সূরায় রয়েছে।

শানে নুযুল

মক্কায় কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে বললো, যদি আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ পাকের নবী হন, তবে তার প্রমাণ উপস্থাপন করুন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি প্রমাণ দেখতে চাও? তখন কাফেররা বললো, যদি আপনি এ চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। কাফেরদের ওয়াদা করার কারণে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন এবং তাঁর দোয়া কবুল হলো।

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হলো

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতে চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দিলেন। মক্কার কাফেররা স্বচক্ষে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলো। চন্দ্রের অর্ধেক সাফা নামক পাহাড়ের উপর চলে গেল। বাকি অর্ধেক চলে গেল কিকাআন নামক পাহাড়ের দিকে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দেখে নাও। এ বিরাট এবং বিশেষ মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে এ সূরার প্রারম্ভে, আর এটিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিল প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সূরার পরিসমাপ্তিতে পথভ্রষ্ট লোকদের বঞ্চিত এবং ধ্বংস হওয়ার কথা ঘোষণার পাশাপাশি ঈমানদার, মোত্তাকী পরহেযগারদের শুভ-পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মক্কার অধিবাসীরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজী পেশ করলো, আপনার কোন মোজেযা প্রদর্শন করুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখিয়ে দিলেন। হেরা পর্বতের এক দিকে এক খন্ড, আর অন্য দিকে আরেক খন্ড। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মক্কাতে দেখেছি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে কাফেররা বললো, চন্দ্রের উপর যাদু করা হয়েছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

আল্লামা বগভী বোখারী শরীফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। এক খন্ড পাহাড়ের উপর, আর এক খন্ড পাহাড়ের নিচে চলে যায়।

কিন্তু এমন প্রকাশ্য মোজেযা দেখেও মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি। ঈমান আনা তো দূরের কথা; বরং তারা একথাও বলেছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যাদু করেছেন। অথবা চাঁদকে যাদু করেছেন। অথচ এ চন্দ্র বিদারণের ঘটনাটি কেয়ামতের সম্ভাবনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন একদিন আসবে যেদিন এ বিশ্ব বিদীর্ণ হয়ে যাবে, চন্দ্র বিদারণের এ ঘটনা দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

'কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'।

কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

'তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, এ-তো প্রচলিত যাদু মাত্র'।

অর্থাৎ কাফেররা যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কোন মোজেযা ও অলৌকিক ঘটনা দেখে, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা এ মন্তব্য করে যে, এটি ভিত্তিহীন যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মুজাহেদ ও কাতাদা (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কিন্তু আবুল আলীয়া ও যাহ্যাক (রাঃ) বলেছেন, مستمر শব্দটির ব্যাখ্যা হল, শক্তিশালী মজবুত যাদু, যা সকল যাদুকরদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, سحر مستمر অর্থ হলো, যে যাদু অব্যাহত থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হল, তার একটি অংশ পাহাড়ের পেছনে চলে গেল, তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এ হাদীস সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে।

ইসলামের সত্যতার এত বড় প্রমাণ দেখার পরও কাফেররা এ সত্যকে গ্রহণ করলো না, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ

'আর তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশি মত চলে, আর প্রত্যেকটি কাজেরই একটি সময় নিদৃষ্ট রয়েছে'।

অর্থাৎ কাফেরদের এ অন্যায় অনাচারের শাস্তির সময় নিদৃষ্ট রয়েছে, যথা সময়ে তারা অবশ্যই সে শাস্তি ভোগ করবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হল পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের ব্যর্থতা এবং সাফল্য, সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য নিদৃষ্ট রয়েছে, আর তা নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই হবে।

অথবা এর অর্থ হল, প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটি শেষ পর্যায় আছে। কাফেরদের এ দৌরাত্মও যথাসময়ে শেষ পর্যায়ে পৌঁছবে। তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ ব্যাখ্যা করেছেন।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল, প্রত্যেকটি কাজের জন্যে আল্লাহ পাকের সময় নিদৃষ্ট আছে, আর তা যথা সময় হবেই হবে। আল্লাহ পাক যে কথার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি সত্যতা রয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু করে, আখেরাতে তার ফল অবশ্যই সে ভোগ করবে। আর আখেরাতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা কিছু হবে তা যথাসময়ে জানানো হবে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যা কল্যাণকর তা কল্যাণকামী মানুষের নিকট অবশ্যই আসবে, আর যা মন্দ ও অকল্যাণকর তা মন্দ লোকের নিকট অবশ্যই যাবে। কল্যাণের পরিণতি জান্নাত, আর মন্দ ও অকল্যাণের পরিণতি দোযখ। তাই কল্যাণকর কাজ কল্যাণকামী মানুষের জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে, আর তাই জান্নাত হবে তাদের চির আবাস-স্থল। আর মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ, মন্দ ও অকল্যাণের কেন্দ্র দোযখে যাওয়ার কারণ হবে, মন্দ লোকেরা দোযখে চিরকাল বাস করবে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতায় বিশ্বাস করেছে এবং যারা বিশ্বাস করেনি, তাদের প্রত্যেকের কথাই স্ব-স্ব স্থানে ঠিক থাকবে এবং আখেরাতে এ বিশ্বাসই সওয়াব ও জান্নাতে রূপান্তরিত হবে এবং অবিশ্বাস শাস্তি ও দোযখে রূপান্তরিত হবে।[১]

আলোচ্য আয়াতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর তফসীরে রুহুল মাআনীতে লিখেছেন, এটি হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। একবার মক্কার মুশরেকরা একত্রিত হয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তাদের মধ্যে ছিল ওলীদ এবনে মুগীরা, আবু জেহেল, আস এবনে ওযায়েল, আস এবনে হেশাম, আসওয়াদ এবনে আবদে ইয়াগুস, আসওয়াদ এবনে আবদুল মুত্তালেব, জামকা এবনুল আসওয়াদ, নজর এবনে হারেস গয়রহ। তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ আরজী পেশ করে যে, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আপনার নবুওয়্যতের বিশেষ কোন নিদর্শন আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা বলেছিল, চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করে দেখিয়ে দেন। চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র তখন বিশ্বকে আলোকিত করে রেখেছিল। হযরত রসূলে করীম

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৯৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছিলেন, যদি আমি তা দেখিয়ে দেই তবে ঈমান আনবে তো? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ আমরা ঈমান আনবো। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন এবং তাঁর আঙ্গুল মোবারক দ্বারা চন্দ্রের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ফলে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হলো। এর একটি অংশ আবু কোবায়েস পাহাড়ের দিকে চলে গেল, আর দ্বিতীয় অংশটি কিকাআন পাহাড়ের দিকে ছিল। লোকেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তা দেখতে লাগলো। মানুষের অবস্থা এই ছিল যে, তারা নিজেদের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলনা, তাই কাপড় দিয়ে চোখ মুছছিল, আর চন্দ্রের দিকে বার বার দেখছিল, সকলেই দেখলো চাঁদ দু' ভাগ হয়েছে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে লোকেরা! তোমরা সাক্ষী থাক। আছর মাগরিবের মধ্যে যতটুকু সময় থাকে ততখানি সময় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত অবস্থায় ছিল। এরপর পুনরায় তেমনি হয়ে যায়, যেমনটি ছিল। মক্কার মুশরেকরা বললো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের প্রতি যাদু করেছেন, উত্তম হল তোমরা বাইরের মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি বাইরে থেকে আগত লোকেরাও ঘটনা দেখে থাকে তবে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার কথা সত্য, আর যদি বাইরের লোকেরা বলে, চন্দ্রের দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা আমরা দেখিনি, তবে তোমরা একথা মনে করো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের প্রতি যাদু করেছেন। তাই বিদেশ থেকে আগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তারা বললো, হ্যাঁ আমরা চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত হতে দেখেছি। এ সাক্ষ্য পাওয়ার পরও ইসলামের দুশমনরা ঈমান আনেনি আর তারা বলেছে, এ হল একটি প্রচলিত যাদু। আর এ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۙ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا
تُغْنِ النُّذُرُ ۙ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۙ﴿٦﴾
خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ﴿٧﴾
مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ﴿٩﴾
فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৭৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭০

তরজমা

(৪) তাদের নিকট এসেছে এমন খবর সমূহ, যাতে রয়েছে সতর্কবাণী।

(৫) এটি পরিপূর্ণ যুক্তি সঙ্গত কথা, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।

(৬) অতএব (হে রসূল!) আপনি তাদের থেকে দূরে থাকুন, যেদিন তাদেরকে কোন আহবায়ক এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে ডাকবে।

(৭) সেদিন তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা কবর থেকে বের হয়ে আসবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।

(৮) তারা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল অবস্থায়, কাফেররা বলবে, এদিন বড়ই কঠিন।

(৯) এদের পূর্বে নূহের জাতিও মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, আমার বন্দার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং বলেছিল, এ-তো এক পাগল, আর তাঁকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল।

(১০) তাই নূহ তাঁর প্রতিপালকের নিকট আরজি পেশ করেছিলেন, আমি যে আর পারিনা, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।

(১১) এরপর আমি আসমানের দুয়ার খুলে দিলাম প্রবল বারি বর্ষণে।

(১২) আর মাটি থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবন, পরিণামে সকল পানিই মিলিত হলো এক পরিকল্পনা মোতাবেক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মক্কাবাসী তাদের খেয়াল-খুশি মত চলে। এজন্যেই তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস করেনি এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতায়ও ঈমান আনেনি। এমনকি তাদের দাবী মোতাবেক যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলী হেলনে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হল, তখনও তারা ঈমান আনেনি।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মক্কাবাসীর নিকট পবিত্র কোরআন পূর্ববর্তী জাতি সমূহের এমন জ্ঞানগর্ভ তথ্য সমৃদ্ধ যুক্তি সঙ্গত বাণী উপস্থাপন করেছে, যা চির সত্য, যাতে রয়েছে সতর্কবাণী। সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্যে তাতে রয়েছে যথেষ্ট উপদেশ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসী এসব ঘটনা দেখে উপদেশ গ্রহণ করেনি। তাই (হে রসূল!) আপনি তাদের থেকে বিমুখ থাকুন, তাদেরকে কেয়ামতের দিনের জন্যে ছেড়ে দিন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

"তাদের নিকট এসেছে এমন খবর সমূহ যাতে রয়েছে সতর্কবাণী, এটি পরিপূর্ণ যুক্তি সঙ্গত কথা, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসেনি, অতএব (হে রসূল!) আপনি তাদের থেকে দূরে থাকুন, আপনি তাদের কথা ভাববেন না, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন।

কোরআনে করীমে তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কোন উপদেশই গ্রহণ করেনি। তাদের কঠিন হৃদয়ে কোন সতর্কবাণীই দাগ কাটেনি। তাই (হে রসূল!) আপনি তাদের কথা ভাববেন না, তাদের থেকে দূরত্বে থাকুন।

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىْءٍ نُّكُرٍ

যেদিন তাদেরকে কোন আহবায়ক এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে ডাকবে, সেদিন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ

'সেদিন তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা কবর থেকে বের হয়ে আসবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়'।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি হবে, তারা ভয়ে চোখ তুলে চাইতেও পারবেনা।

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۭ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

'তারা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহবল অবস্থায়, কাফেররা বলবে, এদিন বড়ই কঠিন'।

প্রত্যেকে নিজ নিজ পাপাচারের কথা মনে করে মহা সংকটের সম্মুখীন হবে, তাই কাফেররা বলবে, আজকের দিন বড়ই কঠিন।

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ

অর্থাৎ তারা কেয়ামতের আহবানকারীর দিকে ছুটে যাবে।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, তারা আহবানকারীর আওয়াজ শ্রবণের জন্যে উদগ্রীব হয়ে সেদিকেই দ্রুত ছুটে যাবে। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল তারা আহবানকারীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ছুটে যাবে। সেদিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং কঠিনতম দিন।[১]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড- ২৭, পৃষ্ঠা-৮১

'এদের পূর্বে নূহের জাতিও মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, আমার বন্দার প্রতি তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং বলেছিল, এ-তো এক পাগল, আর তাঁকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি বিরাট মোজেযার উল্লেখ ছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। কিন্তু কাফেররা এতদসত্ত্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করে।

আর এ আয়াত থেকে ইতিপূর্বে যে সব জাতি তাদের নিকট প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল তাদের নাফরমানীর অবস্থা এবং ভয়াবহ পরিণতির উল্লেখ রয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এতে একদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে রসূল!) মক্কার কাফেররা আপনাকে যে মিথ্যাজ্ঞান করছে, তা নতুন কিছু নয়, ইতিপূর্বে যে নবী রসূলগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন তাদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশেষে কাফেরদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে। আর মক্কার যে কাফেররা আপনার বিরোধিতা করছে তাদের শাস্তিও রয়েছে অবধারিত।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত সমূহে পূর্বকালের কাফেরদের যে ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাতে শিক্ষা রয়েছে মক্কা সহ পৃথিবীর অন্য কাফেরদের জন্যে।

পূর্বকালের নবী রসূলগণের বিবরণের এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে হযরত নূহ (আঃ)-এর কথা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

"এদের পূর্বে নূহের জাতিও মিথ্যাজ্ঞান করেছিল"।

অর্থাৎ (হে রসূল!) ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তারা আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করে। সুদীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বছর যাবত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে হেদায়েত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর সকল উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে। তাঁকে তারা পাগল বলে আখ্যা দেয়। তারা বলে, তাঁর প্রতি জ্বীনের আছর হয়েছে। তারা শুধু তাঁকে পাগল বলেই ক্ষ্যান্ত হয়নি; বরং তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতনও করতো। তাঁর জাতির দূরাত্মা কাফেররা বলতো, যদি তুমি তোমার কাজে বিরত না হও তবে তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করবো।

আবদ এবনে হোমায়েদ মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কোন কোন দূরাত্মা তাঁর গলা টিপে ধরতো এবং তিনি সঙ্গাহীন হয়ে পড়ে যেতেন। যখন চেতনা ফিরে আসতো তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমার কারণে আমার জাতির গুনাহ মাফ করে দিও, তারা জানেনা তাদের নাফরমানীর পরিণাম কত ভয়াবহ!

ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আজ্ জোহদে" হযরত মুজাহেদ (রঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে হযরত নূহ (আঃ)-কে কাফেররা মেরে ফেলতে সংকল্প করে। তখন তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফরিয়াদ করেন,

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

হে পরওয়ারদেগার! আমি অসহায়, তুমি এর প্রতিবিধান কর। তখন আকাশ থেকে বারি বর্ষিত হয়, আর পাতাল বিদীর্ণ হয়ে পানির ফোয়ারা ছোটে। অবশেষে মহাপ্লাবন আসে। সমস্ত কাফের নিমজ্জিত হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট ওহী এসেছিল, যারা ঈমান এনেছে, এরপর আর কেউ ঈমান আনবেনা, তখন হযরত নূহ (আঃ) এ বদদোয়া করেছিলেন,

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"হে আমার পরওয়ারদেগার! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা"।

এরপর নূহ (আঃ)-এর জাতির উপর আযাবের সিদ্ধান্ত হয়।

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ

"এরপর আমি আসমানের দুয়ার খুলে দিলাম প্রবল বারি বর্ষণে"।

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا

"আর মাটি থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবন"।

فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

"পরিণামে সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা মোতাবেক"।

অর্থাৎ একদিকে আসমানের দ্বার খুলে দেয়ার কারণে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। অন্য দিকে পাতাল থেকে পানি উৎসারিত হল, এভাবে আকাশ পাতালের পানি মিলিত হয়ে মহা প্লাবনে পরিণত হল।

বর্ণিত আছে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকে, সারা পৃথিবী পানিতে সয়লাব হয়ে যায়।

فَالْتَقَى الْمَاءُ

অর্থাৎ আকাশ ও পাতালের পানি মিলিত হল।

عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

আল্লাহ পাক পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্বে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সে সিদ্ধান্ত মোতাবেকই আকাশ পাতালের পানি একত্রিত হল।

অথবা এর অর্থ হল, নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য জাতির ধ্বংস হওয়ার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে মোতাবেকই আকাশ পাতালের পানি মিলিত হয়। এভাবে নূহ (আঃ)-এর জাতির মূলোৎপাটন হল। হযরত নূহ (আঃ) এর প্রতি যে চল্লিশ জোড়া মানুষ ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর তরীতে আরোহন করেছিলেন, শুধু তাঁরাই ঐ মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। ছয় মাস ভাসমান তরীতে অবস্থানের পর তাঁরা জুদী পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করেছিলেন।

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ
كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ
وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ
عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا
صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ
نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾
فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(১৩) আর আমি তাকে (নূহকে) আরোহন করিয়ে দেই একটি কাষ্ঠ নির্মিত, পেরেক যুক্ত নৌযানে।

(১৪) যা চলতো আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, তা পুরষ্কার সে ব্যক্তির জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

(১৫) নিশ্চয় আমি তা নিদর্শন স্বরূপ রেখে দেই, তাই কেউ কি উপদেশ গ্রহণকারী আছে?

(১৬) অতএব, কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

(১৭) আর নিশ্চয় আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে, আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

(১৮) আদ জাতিও মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, পরিণামে কত কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

(১৯) নিশ্চয় আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু, এক অশুভ দিনে।

(২০) উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের শেকড়ের ন্যায় তা লোকদেরকে উৎখাত করেছিল।

(২১) কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

(২২) আর নিশ্চয় আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

(২৩) সামুদ জাতিও সতর্ককারীদের মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

(২৪) এবং তারা বলেছে, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করবো? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদ রূপে পরিগণিত হবো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির দূরাত্মাদের শাস্তির নিমিত্তে আল্লাহ পাক মহা প্লাবনের আযাব নাযিল করেছেন, এর পাশাপাশি হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের হেফাজতের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ.

'আর আমি তাঁকে (নূহকে) আরোহন করিয়ে দেই একটি কাষ্ঠ নির্মিত, পেরেক যুক্ত নৌযানে'।

ইতিপূর্বে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে একটি তরী নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি যথাসময়ে তৈরী করেছিলেন। ঐ তরীতে আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে আরো চল্লিশ জোড়া মানুষ

আরোহন করেছিলেন, যাঁরা হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا

ঐ তরীটি আমার তত্ত্বাবধানে চলতো, অর্থাৎ আল্লাহ পাক ঐ তরীটির হেফাজত করছিলেন, তাই তা নিমজ্জিত হওয়ার কোন আশংকা ছিলনা।

جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ

(সে ব্যক্তির জন্যে পুরষ্কার স্বরূপ যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।)

তফসীরকারগণ লিখেছেন, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের জন্যে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত এবং নেয়ামত রূপেই আগমন করেন। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের নেয়ামত ছিলেন, কিন্তু তাঁর জাতি এ নেয়ামতের সঠিক মূল্যায়ন করেনি; বরং তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে। আল্লাহ পাকের এ নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি; বরং অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তাদের এ অকৃতজ্ঞতার পরিণতি স্বরূপ তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয় এবং হযরত নূহ (আঃ) ও মোমেনদেরকে তরীতে আরোহন করিয়ে রক্ষা করা হয়। যারা হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল এটি ছিল তাদের শাস্তি, আর হযরত নূহ (আঃ)-এর জন্যে এটি ছিল পুরষ্কার।

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

'নিশ্চয় আমি তা নিদর্শন স্বরূপ রেখে দেই, আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী'?

হযরত নূহ (আঃ)-এর এ ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, তাঁর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানেই তারা লাভ করে কল্যাণ, শান্তি এবং সাফল্য। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান না আনে, নবী রসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন না করে, অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের শাস্তি অবধারিত। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই এ শাস্তি ভোগ করতে হয়।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ

'অতএব,কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী'।

আযাবের ভয়াবহতা প্রকাশার্থেই একথাটি এরশাদ হয়েছে।

মূলতঃ পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দয়ামায়া যেমন অনন্ত অসীম, তেমনি তাঁর আযাবও ভয়াবহ, যারা তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করেও অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের শাস্তি হয় কঠোর। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

'(হে রসূল!) আমার বন্দাগণকে জানিয়ে দিন, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময় আর নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক'।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

'আর নিশ্চয় আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে, আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী'?

উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনকে সহজ করে দেয়া হয়েছে, কেননা পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী এবং প্রাঞ্জল ভাষা মানুষের মনে রেখাপাত করে, কখনও সৎ কাজে উৎসাহ দান, কখনও মন্দ কাজের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের পদ্ধতি উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অবস্থা এবং তাদের নাফরমানীর পরিণতির ঘটনাবলী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কোরআনে করীম থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে কোরআনে করীমকে সহজ করে দিয়েছি। কিন্তু যে জন্মান্ধ অথবা যে চক্ষুষ্মান ইচ্ছা করেই চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে, তার সম্মুখে সূর্য উদিত হওয়া-না হওয়া সমান, যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তার জন্যেই উপদেশ গ্রহণ করা সহজ। আর যে উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় তার জন্যে কখনও তা সহজ হয়না, যেমন যে চক্ষু বন্ধ করে রাখে তার পক্ষে সূর্যের আলো দেখা সহজ হয়না।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ

'আদ জাতিও (তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে) মিথ্যা জ্ঞান করেছিল, পরিণামে কত কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী'।

আদ জাতির ঘটনা

আদ জাতির নিকট হযরত হুদ (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা তাঁর হেদায়েত মেনে নেয়নি। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, কিন্তু তারা তাতেও সতর্ক হলোনা। এরপর কেমন হয়েছিল তাদের প্রতি আমার আযাব?

আদ জাতির ধ্বংসের এ ঘটনা নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়। পরবর্তী আয়াতে আদ জাতির প্রতি আপতিত আযাবের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

'নিশ্চয় আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু, এক অশুভ দিনে'।

বর্ণিত আছে যে, দুর্ধর্ষ আদ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে যে ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করা হয় তা অব্যাহত থাকে সাত রাত আট দিন পর্যন্ত। ক্ষণিকের জন্যেও এতে কোন বিরাম দেয়া হয়নি। অবাধ্য আদ জাতির জীবনে এ দিনগুলো ছিল অত্যন্ত অশুভ, কেননা এ অবাধ্য জাতির সমুচিত শাস্তিস্বরূপ এ ভয়াবহ ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

مستمر শব্দটির অর্থ হলো ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু ততদিন অব্যাহত ছিল, যতদিন আদ জাতির একটি মানুষও জীবিত ছিল।

অথবা এর অর্থ হলো, সে আযাবের দিনগুলো এত অশুভ ছিল যে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কাউকে রেহাই দেয়নি, সকলকে ধ্বংস করেছে।

অথবা এর অর্থ হলো, চরম দুঃখজনক এবং চরম কষ্টদায়ক শাস্তি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আদ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে যেদিন ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত হয়, সেদিন ছিল বুধবার এবং মাসের শেষ তারিখ।

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ

'উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের শেকড়ের ন্যায় তা লোকদেরকে উৎখাত করেছিল'।

অর্থাৎ যেভাবে প্রবল বায়ু খেজুর বৃক্ষকে শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে, সেভাবে গজবী ঝঞ্ঝা বায়ু অবাধ্য আদ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের গৃহ থেকে বের করে আছড়ে ফেলে, তাদের ঘাড় ভেঙ্গে যায়। আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, সে সংকটময় মুহূর্তে কেউ কেউ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু গজবী ঝঞ্ঝা বায়ু তাদেরকে সেখান থেকে বের করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আপতিত গজবী বায়ু আদ জাতির লোকদের ধরকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারা ছিল শক্তিশালী দেহের অধিকারী। কিন্তু ধ্বংসের পর মনে হলো উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে ধরাশায়ী হয়েছে।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

'কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আযাবের ভয়াবহতা প্রকাশ করতেই একথাটিকে বার বার বলা হয়েছে। যেভাবে তারা দুনিয়াতে তাদের অন্যায় অনাচার এবং অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করেছে ঠিক তেমনি আখেরাতেও তারা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ۞ فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ

'সামুদ জাতিও সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং তারা বলেছে, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করবো? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদ রূপে পরিগণিত হবো'।

সামুদ জাতির ঘটনা

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আদ জাতির শিক্ষণীয় ঘটনার বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত থেকে সামুদ জাতির ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সামুদ জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু অবাধ্য সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর রেসালতকে অস্বীকার করে, তাঁর বিরোধিতা করার কোন যুক্তি তাদের নিকট ছিলনা, তাই তারা বললো, আমরা কি আমাদেরই একজন লোকের কথা মেনে চলবো? তাঁর নির্দেশেই ওঠা-বসা করবো? এমন তো হতে পারেনা। এমন কাজ করলে আমরা পথভ্রষ্ট এবং পাগল বলে বিবেচিত হবো।

ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ
غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ
كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হল? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

(২৬) আগামীকালই তারা জানবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

(২৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে প্রেরণ করছি উষ্ট্রী, অতএব তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর অবলম্বন কর।

(২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত রয়েছে, আর প্রত্যেকে তার পানির অংশের জন্যে পালাক্রমে উপস্থিত হবে।

(২৯) এরপর তারা তাদের এক সাথীকে আহবান করলো, সে তাকে ধরে হত্যা করলো।

(৩০) অতএব কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

(৩১) নিশ্চয় আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করি একটি মাত্র গুরু গর্জন, পরিণামে তারা দলিত-মথিত কাঁটাবনের ন্যায় রয়ে যায়।

(৩২) আর নিশ্চয় আমি বুঝবার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

(৩৩) লুত সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সামুদ জাতির অবাধ্যতার বিবরণ ছিল। এ আয়াতেও তাদের নাফরমানী এবং ধৃষ্টতার উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছেঃ

ءَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا

সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-কে কটাক্ষ করে বলে, আমাদের মধ্যে কি নবুওয়্যতের যোগ্য একমাত্র তিনিই ছিলেন? যত প্রত্যাদেশ, উপদেশ তাঁর নিকটই অবতীর্ণ হচ্ছে অথচ আমাদের মধ্যেও ওহী লাভের যোগ্য অনেক লোকই রয়েছে, তবে কি আমরা কোন কাজেরই নই? মূলতঃ তাঁর নবুওয়্যতের দাবী সত্য নয়।

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

'বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'।

সে বড়াই করে বেড়ায়। নবুওয়্যতের দাবী করে সে আমাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হতে চায়। এভাবে সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি নৈতিক দুর্বলতার অপবাদ দেয়।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ

'আগামীকালই তারা জানবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক'।

এ আগামীকাল কথাটির অর্থ হল, যেদিন তাদের উপর আযাব নাযিল হবে সেদিন তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

আর তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ কেয়ামতের দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিনই তারা জানতে পারবে যে কে মিথ্যাবাদী, কে দাম্ভিক।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল মৃত্যুর পরই জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, কে দাম্ভিক।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

'আমি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে প্রেরণ করছি উষ্ট্রী, অতএব তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর অবলম্বন কর'।

সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট তাঁর নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ মোজেযা প্রদর্শনের দাবী উত্থাপন করলো এবং তারাই প্রস্তাব করলো, এ পাথরের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গাভীন লাল বর্ণের উষ্ট্রী বের করে আনুন, তাহলে আমরা আপনার নবুওয়্যতের সত্যতায় বিশ্বাস করবো। তখন আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আঃ)-কে বললেন,

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

নিশ্চয় আমি উষ্ট্রী প্রেরণ করছি, তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতএব, তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং দেখ তারা (ঐ উষ্ট্রীর সাথে) কী করে। তাদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করতে থাক, আর তারা তোমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে, এর উপর সবর অবলম্বন কর। আল্লাহ পাকের আদেশ না আসা পর্যন্ত তাদের প্রতি আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলোনা।[১]

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

'এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত রয়েছে, আর প্রত্যেকে তার পানির অংশের জন্যে পালাক্রমে উপস্থিত হবে'।

অর্থাৎ পানি বন্টন করা হয়েছে, একদিন সামুদ জাতির জন্যে, আরেক দিন হযরত সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রীর জন্যে।

মুজাহেদ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী পানি পান করে চলে গেলে সামুদ জাতির লোকেরা আসবে এবং তাদের উষ্ট্রী পানি পান করবে। কিন্তু এ হতভাগা সামুদ জাতি ঐ উষ্ট্রীটির জন্যে একদিন নির্দিষ্ট হবে, তা সইতে পারেনি। হিংসায় ক্রোধে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং তাদের এক সাথী উষ্ট্রীটির শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ

'এরপর তারা তাদের এক সাথীকে আহবান করলো, সে তাকে ধরে হত্যা করলো'।

১। তফসীরে আলবাহরুল মুহীত, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৮১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ ব্যক্তির নাম ছিল কাদার এবনে সালেফ।[১]

তখন সামুদ জাতি আল্লাহ পাকের আযাবে পতিত হলো।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ

'অতঃপর কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী'।

বর্ণিত আছে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) এত জোরে গর্জন করেন যে, সামুদ জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির কলিজা ফেটে যায়, তারা দলিত মথিত কাঁটাবনের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পবিত্র কোরআন এ ঘটনার উল্লেখ করেছে এভাবেঃ

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ

নিশ্চয় আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করি একটি গুরু গর্জন, পরিণামে তারা দলিত-মথিত কাঁটাবনের ন্যায় রয়ে যায়।

অর্থাৎ ক্ষণিকের মধ্যেই তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর একটি হুংকারই যথেষ্ট ছিল।

كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ

এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, محتظر সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে তার বকরীর হেফাজতের জন্যে বৃক্ষ ডালা এবং কাঁটা একত্রিত করে, যাতে করে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে তার বকরীর হেফাজত করতে পারে। সে বৃক্ষ-শাখা এবং কাঁটা দ্বারা যে দেয়াল তৈরী করে, তার কোন অংশ যদি ভেঙ্গে পড়ে আর বকরীরা সেগুলো দলিত মথিত করে, তবে সেগুলোকে هشيم বলে।

যাহোক, সামুদ জাতি আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করেছিল, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তাই তাদের শাস্তি হয়েছে এবং তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে, তাদের ঘটনা পৃথিবীর অন্য মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর নিশ্চয় আমি বুঝবার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী"।

পবিত্র কোরআন পূর্বকালের বিভিন্ন জাতির এসব শিক্ষামূলক ঘটনার বিবরণ দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিতে চায়, সরল-সহজ পথ প্রদর্শন করে, যারা উপদেশ গ্রহণ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৬

করতে ইচ্ছুক হয়, তাদের জন্যে এভাবে উপদেশ গ্রহণ করা এবং কল্যাণের পথ অবলম্বন করা সহজ হয় (এ সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে)।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

'লুত সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল'।

লুত সম্প্রদায়ের ঘটনা

ইতিপূর্বে আদ এবং সামুদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে হযরত লুত (আঃ)-এর ঘটনার বর্ণনা শুরু হয়েছে। তারাও তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত নবীকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তিনি তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত হওয়ার জন্যে আহবান করেছেন এবং আখেরাতের আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তারা হযরত লুত (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আর একজন নবীকে অস্বীকার করা দুনিয়ার সকল নবী রসূলগণকে অস্বীকার করার নামান্তর, তাই তাদেরকেও আল্লাহ পাকের আযাব পাকড়াও করেছে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ
كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا
بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا
عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا
فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَٰئِكُمْ
أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৩৪) নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের উপর প্রস্তর-বাহী প্রচন্ড ঝড়, তবে লুত পরিবারের উপর নয়, তাদেরকে আমি শেষ রাতে রক্ষা করেছিলাম।

(৩৫) আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, এভাবেই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(৩৬) নিশ্চয় লুত তাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলো।

(৩৭) এবং তারা লুতের নিকট থেকে তার মেহমানদেরকে নিয়ে যেতে চায়, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম এবং বললাম, অতএব, আমার আযাব এবং ভয় প্রদর্শনের পরিণাম ভোগ করতে থাক।

(৩৮) অতি প্রত্যুষে তাদের উপর নির্দিষ্ট আযাব আঘাত হানে।

(৩৯) এবং আমি বললাম, অতএব ভোগ কর তোমরা আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শনের পরিণাম।

(৪০) আমি উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ কর দিয়েছি, অতএব আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

(৪১) ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারীগণ।

(৪২) কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শনকেই মিথ্যাজ্ঞান করে। এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, পরাক্রমশালী এবং সর্বশক্তিমান রূপে এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলাম।

(৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের অপেক্ষা উত্তম? অথবা তোমাদের জন্যে কোন মুক্তি-পত্র রয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে?

(৪৪) অথবা তারা কি বলে? আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে লুত-সম্প্রদায়ের নাফরমানীর কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ

'নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের উপর প্রস্তর-বাহী প্রচন্ড ঝড়, তবে লুত পরিবারের উপর নয়, তাদেরকে আমি শেষ রাতে রক্ষা করেছিলাম'।

হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় অত্যন্ত মন্দ, অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল। হযরত লুত (আঃ) তাদের হেদায়েতের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় অন্যায় অনাচারে

লিপ্ত থাকে, তাঁর রেসালতকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাদের অবাধ্যতা ও অশ্লীল কর্মকান্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন তাদের প্রতি আযাবের সিদ্ধান্ত হয়, হযরত লুত (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাদের আগমন হয়, তাঁরা সকলেই অল্পবয়সী বালকদের আকৃতি ধারণ করেছিলেন। জীব্রাঈল (আঃ) তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। লুত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর মেহমানদেরকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তিনি গৃহের দ্বার বন্ধ করে দেন, কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়, হযরত লুত (আঃ) অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়লেন। তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আত্মপ্রকাশ করলেন এবং হযরত লুত (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই, তারা আমাদের নিকট আসতে পারবেনা। তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) তাঁর একটি ডানা দিয়ে তাদের প্রতি আঘাত করলেন। পরিণামে তৎক্ষণাত লুত-সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্ধ হয়ে গেল। তারা ঘরের ভেতর ঘোরাফেরা করতে শুরু করলো। বের হওয়ার পথ পেল না। অবশেষে হযরত লুত (আঃ) অন্ধ অবস্থায় এ ঘৃণ্য চরিত্র বিশিষ্ট লোকদেরকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। এরপর শুরু হল সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতি আসমানী গজব। প্রথমে প্রস্তর-বাহী ঝড় প্রবাহিত হতে লাগল এবং ঐ ঝড়ের সময় দূরাত্মা কাফেরদের প্রতি প্রস্তর বর্ষিত হলো। প্রত্যেকটি প্রস্তরের মধ্যে সে ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যার প্রতি ঐ প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল। অবশ্য এ আযাব শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্ পাক দয়া করে হযরত লুত (আঃ) ও তাঁর পরিবারের লোকদেরকে (তাঁর স্ত্রী ব্যতীত) আযাবের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে বের করে নিলেন। এটি ছিল তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ

'আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ তাদেরকে নাজাত দিলাম, যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, এভাবেই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি'।

লুত-সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা তাতে সন্দেহ পোষণ করে এবং পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ

'নিশ্চয় লুত (আঃ) তাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলো'।

আল্লাহ্ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, নবী রসূলগণ মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করেছেন এবং মন্দ পথ বর্জন করার

তাগিদ করেছেন, অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো, সতর্ক হওয়া এবং মন্দ কাজ পরিহার করা। কিন্তু লুত-সম্প্রদায় সতর্ক হওয়ার স্থলে আরো বেশী অবাধ্য হলো এবং হযরত লুত (আঃ) -এর নিকট যে ফেরেশতাগণ মানবাকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন, তাঁদেরকে তারা অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে চাইল। পরিণামে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ

'এবং তারা লুতের নিকট থেকে তাঁর মেহমানদেরকে নিয়ে যেতে চায়, তখন আমি তাদের দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম এবং বললাম, অতএব আমার আযাব এবং ভয় প্রদর্শনের পরিণাম ভোগ করতে থাক।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এবনে এসহাক এবং এবনে আসাকের, এবনে জরীর এবং মোকাতেল (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন দুস্কৃতকারীরা হযরত লুত (আঃ)-এর মেহমানদের নিয়ে যেতে চাইল, লুত (আঃ) তখন তাঁর গৃহের দ্বার বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলো, তখন ফেরেশতাগণ হযরত লুত (আঃ)-কে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না, আমরা আল্লাহ পাকের ফেরেশতা। তারা আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা। এরপর তাদেরকে অন্ধ করে দেয়া হলো। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে অন্ধ অবস্থায় বের করে দিলেন।

فَطَمَسْنَآ অর্থ হলো, আমি তাদের চক্ষুগুলোকে চেহারার সঙ্গে সমান করে দিলাম। অধিকাংশ তফসীরকারগণ আলোচ্য শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং অন্ধ হওয়ার কারণে তারা ফেরেশতাগণকে দেখতে পায়নি। অতএব, আমার আযাব ভোগ করতে থাক।[১]

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ

عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ 'অতি প্রত্যুষে তাদের উপর নির্দিষ্ট আজাব আঘাত হানে'।

স্থায়ী আযাব। অর্থাৎ এমন আযাব যা মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। দুনিয়াতে তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করা হয় এবং তাদের বস্তিকে উল্টে দেয়া হয়। মৃত্যুর পর তাদের প্রতি কবরের আযাব হয়। এরপর দোযখের চিরস্থায়ী আযাব।

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৭

অতএব, ভোগ কর তোমরা আমার আযাব এবং ভয় প্রদর্শনের পরিণাম। আমি উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ

'ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারীগণ, কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করে। এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, পরাক্রমশালী এবং সর্বশক্তিমানরূপে এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলাম'।

ফেরাউন ও তার দলবলের ঘটনা

আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার দলবলের হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের তথা তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করলো, তাঁর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করলো। আলোচ্য আয়াতের اٰيٰت শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি যে নয়টি বিধান জারী করা হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এরশাদ করেন, তা হলো (১) কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করোনা। (২) চুরি করোনা। (৩) ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়োনা। (৪) যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, তাকে হত্যা করোনা। (৫) কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে বিচারকের নিকট নিয়ে যেওনা। (৬) যাদু করোনা। (৭) সুদ গ্রহণ করোনা। (৮) কোন চরিত্রবতী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দিওনা। (৯) জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করোনা।

আর ইহুদীদের জন্যে একটি বিশেষ হুকুম ছিল, শনিবার দিনের সম্মান রক্ষা কর, সেদিন দুনিয়ার কাজ করোনা।

যে দু'জন ইহুদী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একথাটি জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা উভয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কদম মোবারক চুম্বন করলো এবং বললো, আপনি আল্লাহ পাকের সত্য নবী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, তবে আমার অনুসরণ থেকে কে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে? তারা বললো, আমরা যদি আপনার অনুসারী হই তবে ইহুদীরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

فَاَخَذْنٰهُمْ

এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, তাদেরকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিলাম এবং দোযখের শাস্তি দিলাম।

اَخْذَ عَزِيْزٍ

অর্থাৎ এমন পরাক্রমশালী শক্তি তাদেরকে পাকড়াও করলেন, যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁর চেয়ে অধিক শক্তি কারো নেই, যিনি সর্বময় শক্তির অধিকারী।

مُّقْتَدِرٍ

অর্থাৎ তিনি এমন শক্তিশালী যে, তিনি যখন কাউকে শাস্তি দেন, তখন কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা, কেউ তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়না, তাই ফেরাউনের দলের একটি প্রাণীও সেদিন রক্ষা পায়নি।

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ

'তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের অপেক্ষা উত্তম, অথবা তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে কোন মুক্তি-পত্র রয়েছে কি'?

এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সে যুগের মুসলমানদেরকে এ মর্মে যে, এ পর্যন্ত আদ, সামুদ, লুত এবং ফেরাউন জাতির নাফরমানী ও তাদের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এখন প্রশ্ন হলো, পূর্বের কাফেরদের এ ভয়াবহ পরিণতি দেখার পরও হে মুসলমানগণ! তোমাদের এ যুগের কাফেররা, বিশেষতঃ মক্কাবাসী কোরায়শরা আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি অতীতের কাফেরদের তুলনায় উত্তম? যে আল্লাহর আযাব থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাবে, এমন তো নয়; বরং যে কেউ এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করবে, তার শাস্তি অবধারিত।

اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ

হে মক্কার কাফেররা! তবে কি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে মুক্তি-পত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে? যে তোমরা যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হও, তাঁর রসূলকে অস্বীকার কর তবে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা? এমন মুক্তি-পত্রও তোমাদেরকে দেয়া হয়নি।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ تُنْتَصِرٌ

অথবা তারা কি একথা বলে যে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? আমরা সর্বদা সংরক্ষিত থাকব, কেউ আমাদের প্রতি বিজয়ী হওয়ার কথা চিন্তাও করবেনা। এমনও তো নয়; অবশেষে তোমাদের প্রতি শাস্তি আ পতিত হবে এবং তোমাদের পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ .....اكفاركم বলে এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে মক্কাবাসীর প্রতি, আর সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানগণকে, আর اولٰئكم

বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালেহ (আঃ) ও লুত (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের জাতি সমূহের প্রতি ও ফেরাউনের দলবলের প্রতি এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, হে মুসলমানগণ! তোমাদের যুগের কাফেররা কি উল্লেখিত কাফেরদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী? বেশী সম্পদশালী? বা সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে পূর্বেকার কাফেরদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন? এমন তো নয়; বরং এ যুগের কাফেররা পূর্ব যুগের কাফেরদের ন্যায়ই, অথবা তাদের চেয়েও অধিক মন্দ, অতএব পূর্বকালের কাফেরদের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে একই অপরাধে অপরাধী হলেও এ যুগের কাফেরদের কি শাস্তি হবে না!

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
أَدْهٰى وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ
فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ
بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَ
كُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿٥٤﴾
فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

তরজমা

(৪৫) এ দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে।

(৪৬) বরং কেয়ামতই তাদের শাস্তির জন্যে নির্ধারিত সময়। আর কেয়ামত হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও তিক্ততর।

(৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত।

(৪৮) যেদিন তাদেরকে উপুড় করে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে, দোযখের শাস্তির স্বাদ ভোগ করতে থাক।

(৪৯) নিশ্চয় আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি পূর্ব নির্ধারিত পরিমাপে।

(৫০) আর আমার কাজ চোখের পলকের ন্যায় এক মুহূর্তেই হয়ে যায়।

(৫১) আর নিশ্চয় আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের সঙ্গী সাথীদেরকে, অতএব কেউ তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

(৫২) তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(৫৩) ছোট বড় সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(৫৪) নিশ্চয় পরহেযগারগণ থাকবে ঝর্ণামালায় বিধৌত জান্নাতে।

(৫৫) যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে অতীতের অনেক পথভ্রষ্ট জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে তারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং কিভাবে তারা কোপগ্রস্ত হয়েছে, তার বিবরণের পর মক্কাবাসীকে তাদের অবস্থা মূল্যায়ন করার আহ্বান করা হয়েছে এ মর্মে যে, তোমরা কি পূর্বের কাফেরদের চেয়ে উত্তম? যে অপরাধে তাদের শাস্তি হয়েছে, সে অপরাধে তোমরা অপরাধী হওয়া সত্বেও তোমাদের কি শাস্তি হবেনা? অথবা তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মুক্তি-পত্র প্রদান করা হয়েছে? অথবা তোমরা কি এমন অপরাজেয় শক্তিশালী দল যে তোমাদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা করা যাবেনা?

আর এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

অর্থাৎ অচিরেই এ দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, মক্কার কাফেররা যত দৌরাত্মই করুক না কেন, অচিরেই তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হবে। তারা পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন থেকে পৃষ্ঠ-পদর্শন করে পালিয়ে যাবে, তখন তাদের প্রকৃত অবস্থা তারা দেখতে পাবে। দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে এবং পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধে পবিত্র কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।[১]

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

'বরং কেয়ামতই তাদের শাস্তির জন্যে নির্ধারিত সময়, আর কেয়ামত হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও তিক্ততর'।

অর্থাৎ বদর এবং খন্দকে কাফেরদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং যে অপমান ও লাঞ্ছনা তারা ভোগ করেছে, এটিই শেষ নয়; বরং তাদের আসল শাস্তি হবে

১। তফসীরে আল বাহরুল মুহীত, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৮৩

কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে, যেদিন বড়ই বিপজ্জনক এবং কঠিনতর। দুনিয়াতে তারা যে শাস্তি পেয়েছে, আখেরাতের আযাবের তুলনায় তা কোন শাস্তিই নয়, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের কঠিন শাস্তির ভূমিকা স্বরূপ, আখেরাতের শাস্তি বর্ণনাতীত।

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ

'নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত'।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা কাফের মুশরেক, যারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা পথহারা দিশেহারা, তারা সত্য থেকে দূরে তাই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর আখেরাতে দোযখের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা কাফের, মুশরেক তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকার গ্রস্ত, তারা এমন অন্যায় কাজে লিপ্ত যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ, তারা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল, আখেরাত সম্পর্কে বে-খবর। অথচ ভয়াবহ পরিণতি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।[১]

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ

'সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে দোযখের শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর'।

অর্থাৎ যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন উপুড় করে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা মর্মে মর্মে অনুভব করবে যে দুনিয়ার জীবনে তারা ছিল অপরাধী, সে অপরাধেরই শাস্তি তারা ভোগ করবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الْمُجْرِمِيْنَ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার সকল কাফেরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইতিপূর্বে اَكُفَّارُكُمْ বলে শুধু মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

'নিশ্চয় আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি পূর্ব নির্ধারিত মাপে'।

শানে নুযুল

মুসলিম শরীফ এবং তিরমিজী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, কোরায়শ গোত্রের কয়েকজন মুশরেক

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৯৩

ব্যক্তি তকদীর সম্পর্কে বিতর্কের নিমিত্তে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়, তখন اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ থেকে بِقَدَرٍ পর্যন্ত নাযিল হয়।[১]

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

'আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে পূর্ব নির্ধরিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি'।

তকদীর প্রসঙ্গে

"আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে পূর্ব নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি"। কখন কি ঘটবে আর কখন কি ঘটবেনা, কখন কি সৃষ্টি করা হবে আর কখন কি সৃষ্টি করা হবেনা, সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট পূর্বে স্থিরকৃত। পূর্বে যে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, তার বরখেলাফ হয়না কখনো। "কদর" শব্দটির অর্থ হলো, সৃষ্টির পূর্বে কোন বস্তু সম্পর্কে আন্দাজ করা।

অথবা এর অর্থ হলো, সেই নির্দিষ্ট বিষয় যা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকেন।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, "কদর" শব্দটির অর্থ হলো প্রত্যেকটি বস্তুর সেই বিশেষ পরিমাপ যা সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ পাকের হেকমত এবং মর্জি মোতাবেক হয় যে, এ বস্তুটি এমনই হওয়া উচিৎ এবং তাই হয়ে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার পূর্বে আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি বস্তুর পরিমাপ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা বগভী (রঃ) তাউস এবনে মুসলিমের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, তাঁরা বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি বস্তুই তার আন্দাজ মোতাবেক হয়, এমনকি বুদ্ধি এবং নির্বুদ্ধিতাও।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেউ যদি চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনে, তবে সে বন্দা মোমেন হতে পারবেনা। (১) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, (২) আমি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ পাক আমাকে সত্য রসূল হিসেবে প্রেরণ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২০৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৯৪

করেছেন। (৩) আর এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দেয়া হবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে হাযিরী দিতে হবে। (৪) তকদীরের প্রতি ঈমান রাখা। (তিরমিজী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ফেরকায়ে কাদরিয়া যারা আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তকদীরকে অস্বীকার করে, আর মনে করে করে মানুষের ভাল-মন্দ কাজের স্রষ্টা মানুষ নিজেই, তারা এ উম্মতের মজুসী (মজুসীরা দু'জন স্রষ্টাকে মানে, মন্দ কাজের স্রষ্টা যাকে তারা "আহরেমান" বলে, আর ভাল কাজের স্রষ্টাকে তারা "ইয়াজদান" বলে)। যদি তারা অসুস্থ হয় তবে দেখতে যেওনা। আর যদি তাদের মৃত্যু হয়, তবে জানাযায় শরীক হয়োনা। (আহমদ, আবু দাউদ)

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এ আয়াত দ্বারা তকদীরের কথা প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ পাকের তকদীরের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

তাবেয়ীনদের যুগে কিছু লোক তকদীরকে অস্বীকার করে বসে। সাহাবায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে কেরাম এ আয়াত দ্বারা তাদের বক্তব্যের প্রমাণ পেশ করেন।

আতা এবনে আবি রোবাহ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এমন সময় উপস্থিত হলাম, যখন তিনি জমজমের পানি বের করছিলেন, আমি আরজ করলাম, হে এবনে আব্বাস! কিছু লোক তকদীর প্রসঙ্গে আপত্তিকর কথাবার্তা বলে, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আলোচ্য আয়াত

ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۞ اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আর তারাই হলো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে মন্দ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই মজুসী রয়েছে, এ উম্মতের মজুসী হলো সে সব লোক, যারা তকদীরকে অস্বীকার করে।

মূলতঃ তকদীর ইসলামের মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত ও এর উপর ঈমান আনা একান্ত জরুরী, তকদীরকে অস্বীকার করা পথভ্রষ্টতা এবং কুফর। এ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিকে আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কান্দলভী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭৯

'আর আমার কাজ চোখের পলকের ন্যায় এক মুহূর্তেই হয়ে যায়। আর নিশ্চয় আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের সঙ্গী সাথীদেরকে, অতএব কেউ তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি'?

অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমাদের ন্যায় অনেক কাফেরকে আল্লাহ্ পাক ধ্বংস করেছেন, কেউ তাতে বাধা দিতে পারেনি, এসব কথা শুনেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহন করবেনা? আর আল্লাহ্ পাকের কাজ তো চোখের পলকের ন্যায় ক্ষণিকের মধ্যেই হয়ে যায়, তাঁর ইচ্ছা হলেই তা বাস্তবায়িত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কেয়ামত আসবে চোখের পলকের ন্যায়। (কালবী)

اَشْيَاعَكُمْ

হে মক্কাবাসী! ইতিপূর্বে তোমাদের অনেক সঙ্গী-সাথীকে আল্লাহ্ পাক নিপাত করেছেন, অতএব, তা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, অনুরূপ শাস্তি তোমাদের জন্যেও হতে পারে।

وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ

'তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ আমলনামায় রয়েছে, ছোট বড় সবই লিপিবদ্ধ রয়েছে'।

কেরামুন কাতেবীন নামক দু'জন ফেরেশতা প্রত্যেকটি মানুষের ডান এবং বাম কাঁধে কর্তব্যরত রয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখা হচ্ছে, আর তাই আমলনামা হিসেবে কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে দেয়া হবে এবং সে আমলনামার ভিত্তিতেই পুরষ্কার বা শাস্তি হবে। ছোট-বড় যাবতীয় কীর্তিকলাপই আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সকল বিবরণই সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রয়েছে, যথা সময়ে তা পেশ করা হবে। প্রত্যেকটি মানুষের হাতে তার আমলনামা দিয়ে বলা হবে,

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

(বণী ইসরাঈল ঃ আয়াত-১৪)

'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে যথেষ্ট'।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۞ فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

'নিশ্চয় পরহেযগারগণ থাকবে ঝর্ণামালায় বিধৌত জান্নাতে, যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেক এবং তকদীরে অবিশ্বাসী লোকদের কীর্তিকলাপ এবং তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে নেককার পরহেযগার বন্দাগণের শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এ জীবনে যারা জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে, তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন করে, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে জীবনকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং আমানত মনে করে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়, তারা বেহেশতের বাগানে সম্মান এবং মর্যাদার আসনে অবস্থান করবে, আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে, মনের আনন্দে সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে।

মসনদে আহমদে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ন্যায় বিচার কায়েমকারী নেককার লোকেরা আল্লাহ পাকের নিকট নূরের মিম্বরে আসীন হবে। তারা সে সব লোক, যারা নিজেদের পরিবারবর্গের মধ্যে আর যা কিছু তাদের কাছে রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাকের হুকুমের বরখেলাফ কিছু করেনা; বরং তারা সুবিচার কায়েম করে এবং সুবিচারের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ করে। (মুসলিম শরীফ)

তফসীরকারগণ বলেছেন, مَقْعَد صِدْق (সত্যবাদিতার স্থান) কথাটির তাৎপর্য হলো এমন স্থান যেখানে কোন গুনাহ বা অহেতুক কথা হবেনা, এর দ্বারা জান্নাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক "মকাম" শব্দের গুণ বর্ণনা করেন صِدْق শব্দ দ্বারা, এর তাৎপর্য হলো যারা সত্যবাদী, তারাই সেখানে আসন পাবে।১

(হে আল্লাহ! তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তুমি মহান দাতা, তুমি যা ইচ্ছা কর তাই হয়, এ আয়াতে যে স্থানের কথা ঘোষণা করেছ, সে স্থানে আমাকেও তোমার নৈকট্য-ধন্য হওয়ার তৌফিক দিও। যারা তফসীরে নূরুল কোরআন পাঠ করে বা এর সহযোগিতা করে, তাদেরকেও এ স্থান দান কর। আমাদের পিতা-মাতা এবং সন্তান সন্ততিকেও এ স্থান দান কর। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা কমরের তফসীর সমাপ্ত হলো (১৩-২-৯৭)

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৯৬
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আর রাহমান

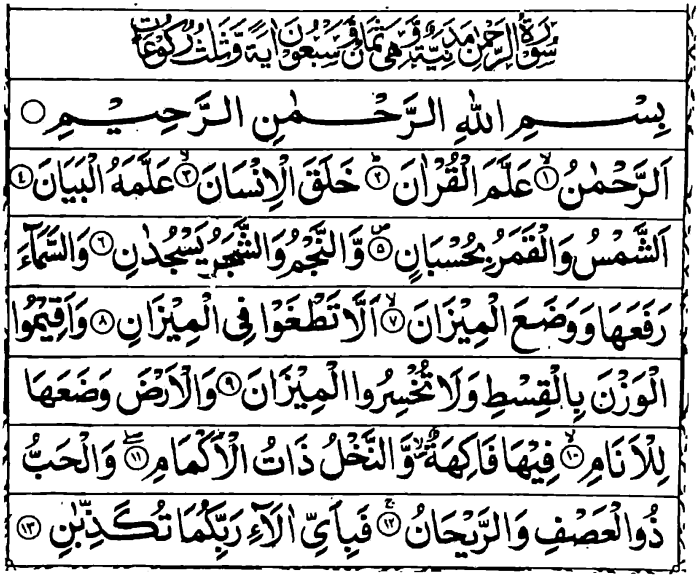

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) দয়াময় আল্লাহ পাক,

(২) তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনে করীম।

(৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে।

(৪) তিনিই তাকে কথা-বার্তা বলাও শিখিয়েছেন।

(৫) সূর্য ও চন্দ্রের জন্যে একটি নির্দিষ্ট হিসাব রয়েছে।

(৬) তৃণলতা ও বৃক্ষগুলো আল্লাহ পাকের অনুগত রয়েছে।

(৭) এবং আকাশকে তিনিই করেছেন সুউচ্চ এবং তিনিই স্থাপন করেছেন দাঁড়িপাল্লা।

(৮) যেন তোমরা পরিমাপে কম বেশী না কর।

(৯) ন্যায্য ভাবে ওজনের মান ঠিক রেখ এবং ওজনে কম দিওনা।

(১০) এবং সৃষ্ট জীবের জন্যে তিনি যমীনকে বিছিয়ে রেখেছেন।

(১১) তাতে ফলমূল, খেজুর বৃক্ষ রয়েছে যার ফল আবৃত থাকে।

(১২) আর তাতে রয়েছে ভূষিযুক্ত তরি-তরকারী এবং সুগন্ধি পুষ্পও।

(১৩) অতএব, (হে জ্বীন ও মানব, এত অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও) স্বীয় পরওয়ারদেগারের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

সূরায়ে আর রাহমান প্রসঙ্গে

নামকরণ

সূরা আর রাহমানের অন্য একটি নাম হলো উরুসুল কোরআন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি সৌন্দর্য আছে, এ সৌন্দর্য্যের কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়, আর কোরআনে করীমের সৌন্দর্য হলো সূরা আর রাহমান। সূরা আর রাহমানের আয়াত সংখ্যা ৭৮, বাক্য সংখ্যা ৩৫১ আর অক্ষর হলো ১,৬৩৬।

আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর "তফসীরে রুহুল মাআনীতে" লিখেছেন, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ মত পোষণ করেন যে, সূরা আর রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এবনুন নুহাস হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বায়হাকী "দালায়েলে" লিখেছেন যে, এ সূরা মদীনায়ে মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) তাঁর "তফসীরে আদ দুররুল মানসুরে" উভয় মতের উল্লেখ করেছেন।[১]

তফসীরকার হাসান বসরী (রঃ), ওরওয়া (রঃ), একরামা (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মত হলো, এ সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা কমরে নবুওয়্যতের সত্যতার দলিল হিসেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযার উল্লেখ রয়েছে। এরপর অতীতের বিভিন্ন জাতির

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৯৬

নাফরমানীর উল্লেখ করে তাদের উপর যে আযাব এসেছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

এ সূরার বৈশিষ্ট্য

সূরা আর রাহমান আপন বৈশিষ্ট্য এবং মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ সূরার ভাব ও ভাষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী। এ সূরার মিষ্টি মধুর শব্দ চয়ন এবং আশাব্যঞ্জক ভাব মানুষ মাত্রকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতের আশীষে মানুষ আশান্বিত হয়। মানব-মন কৃতজ্ঞ হয়। এ সূরাটির ছন্দের মাধুর্য, সুর লহরী এবং ভাষার অলংকারে মুগ্ধ হয়ে পৌত্তলিকরা পর্যন্ত সৎ কাজে অনুপ্রাণিত হতো।

ইমাম তিরমিযী (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে আগমন করেন এবং এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। সাহাবায়ে কেরাম নীরব থেকে মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতে থাকেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে লোকসকল! আমি এ সূরা জ্বীনদেরকে শুনিয়েছি, আমি যখনই এ আয়াত فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ তেলাওয়াত করেছি তখন জ্বীনেরা এই বলে জবাব দিয়েছে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করিনা, তোমারই জন্যে রয়েছে সকল প্রশংসা। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কিন্তু তোমরা এ সূরা শ্রবণ করে নীরব রইলে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরা নামাজ ব্যতীত অন্য সময় যদি তেলাওয়াত বা শ্রবণ করা হয়, তবে সুন্নত হলো উল্লেখিত আয়াতের পর জবাব প্রদান করা। আর নামাজের অবস্থায় জবাব দেয়া যাবেনা, তবে বিষয়টি চিন্তায় আসতে পারে।[১]

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা আর রাহমান পাঠ করছে, সে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা অথবা বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিবেশী হবে।

এ সূরার আমল

যে কেউ এ সূরা পাঠ করবে, সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের অশেষ কল্যাণ লাভ করবে। যে ব্যক্তি সূরা আর রাহমান এগার বার পাঠ করবে, আল্লাহ পাকের রহমতে তার মকসুদ হাসিল হবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-২১০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮১

নিয়মিত ভাবে যে এ সূরা পাঠ করে, কেয়ামতের দিন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

চক্ষু রোগীর জন্যেও এ সূরার আমল উপকারী হয়।

শানে নুযুল

যখন এ আয়াত قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেরদের মধ্যে আবু জেহেল, ওলীদ, ওতবা, শায়বা গং বলতে লাগল, রহমান কে? আমরা তা জানিনা, তখন সূরা আর রাহমান নাযিল হলো এবং দয়াময় আল্লাহ পাকর অনেক গুণাবলী বর্ণিত হলো। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা, সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত সমূহের কথা উল্লেখ করা হলো।[১]

বস্তুতঃ মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দানের কোন সীমা নেই, শেষও নেই। মানুষের অস্তিত্ব, জীবন, যৌবন, জীবনের যাবতীয় উপকরণ এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের মহান দান। এ অসীম দানের মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য সূরায় এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তফসীরুল কোরআন

اَلرَّحْمٰنُ

আর রাহমান শব্দটি মোবালেগা, অর্থাৎ এতে রহমতের আধিক্য বোঝায়। আল্লাহ পাক মোমেন, কাফের, ভাল-মন্দ সকলের প্রতি অতীব দয়াবান।

রহমান শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, আল্লাহ পাক সর্বাবস্থায় তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়াবান। প্রত্যেকটি নেয়ামত তিনিই দান করেন। রহমান শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের জন্যেই ব্যবহৃত হয়, আর কারো জন্যে নয়।

পক্ষান্তরে, রহীম শব্দটি অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বিশ্ববাসীর প্রতি যিনি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়। রহমান এবং রহীম উভয় শব্দই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, রহমান তিনি, যাঁর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করেন, আর রহীম তিনি, যাঁর নিকট কিছু চাওয়া না হলে তিনি রাগান্বিত হন।

রহমান তিনি, যিনি মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করেন, যিনি মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, যিনি দুনিয়ার জীবনের সকল বিপদাপদ দূর করেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪৫০

দয়াময়ের সর্ব শ্রেষ্ঠ দান

পরম করুণাময় আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর কালাম পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, যা মহান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যা তিনি দয়া করে মানব জাতিকে দান করেছেন। দয়াবান আল্লাহ পাকই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তার মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি দান করেছেন। মানুষের অস্তিত্ব, তার জীবন যৌবন সবই আল্লাহ পাকের দান, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো পবিত্র কোরআন, আর মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয় পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে, তাই মানুষকে সৃষ্টি করার কথা ঘোষণার পূর্বে পবিত্র কোরআন দানের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় নেয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো পবিত্র কোরআন। যাবতীয় কল্যাণ সম্পৃক্ত রয়েছে পবিত্র কোরআনের সাথে। যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হলো পবিত্র কোরআন। সমস্ত আসমানী গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কোরআন। মানব-অন্তরের যাবতীয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ হলো পবিত্র কোরআন। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পন্থা হলো পবিত্র কোরআন। মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম হলো পবিত্র কোরআন।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক সব কিছুর এলম পবিত্র কোরআনেই দান করেছেন। আমাদের জন্যে পবিত্র কোরআন সব কিছু বর্ণনা করেছে। পূর্বের এবং পরবর্তী কালের সকল জ্ঞান পবিত্র কোরআনেই একত্রিত করা হয়েছে। আর সে জ্ঞান পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর নিকট থেকে সাহাবায়ে কেরাম সেই জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ পর্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদ্বীন তাঁদের উপর ফজিলত অর্জন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের পর তাঁদের নিকট থেকে তাবেয়ীনগণ সে এলম হাসিল করেছেন। তাঁদের নিকট থেকে তাবে তারয়ীনগণ ঐ জ্ঞান অর্জন করেছেন। জ্ঞানের এ সাধনা আজো অব্যাহত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। তবে যুগের আবর্তন বিবর্তনে জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা হ্রাস পাচ্ছে, অথচ কোরআনে করীমের জ্ঞান ভান্ডার রয়েছে পরিপূর্ণ, এটি নিঃসন্দেহে দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান দান। এ দান লাভের জন্যে যারা সাধনায় রত হয়, আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে তা দান করেন। কিন্তু যারা গাফলত করে, তারা এ দান থেকে বঞ্চিত হয়। সারা বিশ্বে যে যখন ঈমান নিয়ে আন্তরিক ভক্তি নিয়ে, একনিষ্ঠ ভাবে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-ভান্ডার থেকে জ্ঞান লাভ করতে চেয়েছে, আল্লাহ পাক তার জন্যে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-ভান্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মানব-জীবনে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান পবিত্র কোরআনে

নেই। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তিকে সুরক্ষিত করতে হলে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। তাই নিখিল বিশ্বের শান্তির শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ এবং যাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে তথা শান্তি দূত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের অনুসরণ। যারা এ উপায় গ্রহণ করে, তাদের এ জীবন ও পরজীবন সার্থক ও সুন্দর হয়।

পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে বিমুখ হয়, তাদের জীবন-সাধনা হয় ব্যর্থ। কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করতো, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য অনেক কিছুর পূজা করতো, আল্লাহ পাকের অগণিত নেয়ামত ভোগ করা সত্বেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকতো, এমন কি তারা "রহমান কে? আমরা তা জানিনা" এমন ঔদ্ধত্বপূর্ণ মন্তব্যেও দ্বিধাবোধ করতোনা। তাদের উদ্দেশ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, রহমান তিনিই, যিনি তোমাদের হেদায়েতের জন্যে সার্বিক কল্যাণের প্রতীক পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। আর এ সূরায় ৩১ বার আল্লাহ পাকের নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ

দয়াময় আল্লাহ পাক হেদায়েতের মূল উৎস পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, এ মহা সত্য যদি উপলব্ধি করতে না পার, তবে হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তোমার অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য কর, তোমার নিজের দিকে নজর দাও, তোমাকে সেই দয়াময় আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, তুমি ইতিপূর্বে এ পৃথিবীতে ছিলেনা, তোমাকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই লালন-পালন করছেন, তিনিই তোমাকে শক্তি সামর্থ্য দান করছেন, তোমার যাবতীয় গুণাবলী তাঁরই দান, তোমার দেহ মন, তোমার অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই দান। সত্যোপলব্ধির জন্যে, সত্য পথ লাভের জন্যে তোমাকে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন দান করেছেন, পবিত্র কোরআনই বলবে, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? তোমার জীবন চলার পথ কি, পাথেয় কি?

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

আর দয়াময় আল্লাহ পাকই তোমাকে দান করেছেন তোমার মনের ভাব প্রকাশ করার শক্তি। পবিত্র কোরআন পাঠ করতে হলে এর প্রয়োজন অনেক বেশী। বাকশক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পায় মনের অভিব্যক্তি। এসব কিছুই মানুষের প্রতি দয়াময় আল্লাহ পাকের মহান দান। তবে এসব দানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কোরআন, এমনকি মানুষের জীবনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, কেননা পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ব্যতীত জীবন শুধু ব্যর্থ নয়, বিপজ্জনকও, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে ভোগ করতে

হবে দোযখের কঠিন শাস্তি। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের ময়দানে আদম সন্তান একটু নড়াচড়াও করতে পারবেনা, যে পর্যন্ত না সে পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেবে (১) আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন কি কাজে ব্যয় করেছ? (২) যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছ? (৩) অর্থ-সম্পদ কি কি পন্থায় রোজগার করেছ? (৪) আর তা কি কি কাজে ব্যয় করেছ ? (৫) যা তুমি জানতে পেরেছিলে তার উপর কতখানি আমল করেছ?

যারা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, তারাই সাফল্যমন্ডিত হবে। পক্ষান্তরে যারা এর জবাব দিতে পারবেনা, তারাই হবে বিপদগ্রস্ত। অতএব, দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়া মায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর মহান বাণী পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করা কল্যাণকামী বাস্তববাদী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের الانسان শব্দ দ্বারা আদম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে পৃথিবীর সব কিছুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক সাত লক্ষ ভাষার জ্ঞান দান করেছিলেন (জাতিসংঘের হিসাব মোতাবেক বর্তমান বিশ্বে ৬,০০০ ভাষা প্রচলিত রয়েছে)।

তফসীরকার আবুল আলীয়া এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الانسان শব্দ দ্বারা শুধু আদম (আঃ) নয়; বরং সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলার, লেখার, বুঝবার এবং বোঝাবার ক্ষমতা দিয়েছেন। এভাবে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ সহ্য করার এবং কোরআনের বাহক হওয়ার যোগ্য হয়েছে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক জাতিকে তার ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, الانسان শব্দ দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর البيان দ্বারা কোরআনে করীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে পথ-প্রদর্শক এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হবে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে নবী রসূলগণ এ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের বর্ণনা তারই অনুরূপ।[১]

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৬৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১২

'তিনিই তাকে কথাবার্তা বলাও শিখিয়েছেন'।

আলোচ্য আয়াতের البيان শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হালাল হারামের বিস্তারিত বিবরণ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

কাতাদা (রঃ)-এর আরেকটি মত হলো, আল্লাহ পাক ভাল-মন্দ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যা করণীয় এবং যা বর্জনীয় তারও শিক্ষা দিয়েছেন।

আর এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষকে আল্লাহ পাক তার মনের কথা প্রকাশ করার শক্তি দান করেছেন।[১]

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষকে বাক শক্তি দান করেছেন, যেন সে আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারে, শিখতে পারে, তেলাওয়াত করতে পারে, কেননা বাক শক্তি না থাকলে পবিত্র কোরআন পাঠ করা সম্ভব হতোনা। আর এ বাক শক্তির মাধ্যমেই মানুষ অন্য লোকদের নিকট পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা করতে পারে, সত্যের দিকে আহবান জানাতে পারে এবং মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাকশক্তির কারণেই মানুষ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে।

এটিও নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দান।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের এলম দান করেছেন।

আর যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক মানুষকে ভাল-মন্দের এলম দান করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে পৃথিবীর সব কিছুর নাম এবং গুণাবলী শিক্ষা দিয়েছেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার শক্তি দান করেছেন।

আর ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক মানুষকে এস্‌মে আজম শিক্ষা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সব কিছু পাওয়া যায়।[৩]

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৬৭
২। তফসীরে মাআরুফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কান্দলভী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৩
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৯৯

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

সূর্য ও চন্দ্রের জন্যে একটি নির্দিষ্ট হিসাব রয়েছে। ঐ হিসাব মোতাবেকই তারা চলমান থাকে।

অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের জন্যে গতিবেগ সুনির্দিষ্ট রয়েছে। সে হিসাব অনুযায়ীই তারা পরিক্রমণ করে, আর ঐ হিসাব মোতাবেকই পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত রয়েছে। মাস ও বছর তা দিয়েই নির্ধারিত হয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি কাজের সময় ঐ হিসাব মোতাবেকই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ

কান্ডবিহীন বৃক্ষ এবং কান্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ উভয়ই আল্লাহ পাকের অনুগত রয়েছে। অর্থাৎ উভয়ই আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদার, যেভাবে মানুষ সেজদা করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, ঠিক সেভাবে বৃক্ষ-তরুলতাও আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত থাকে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, বৃক্ষের ছায়া আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়।

একথা সর্বজনবিদিত, চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতিকে আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র সূর্যের উদয়-অস্ত আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এক আল্লাহ পাকের নির্দেশ ক্রমেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে চন্দ্র-সূর্য তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে চলেছে। তাই সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

'আর সূর্য পরিভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ'।

যেভাবে উর্দ্ধলোকে সব কিছু আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, ঠিক তেমনি অধলোকে তথা পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ যখন বিশাল সৃষ্টির কোন কিছুকে ব্যবহার করতে চায় তখন তা মানুষের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ করে, কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন।

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ۞ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ

'আকাশকে তিনিই করেছেন সুউচ্চ, তিনিই স্থাপন করেছেন দাঁড়ি পাল্লা, যেন তোমরা পরিমাণে কম বেশী না কর'।

অর্থাৎ আকাশমন্ডলী আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই নির্দেশক্রমে আসমানকে সুউচ্চে রাখা হয়েছে। তিনি স্থাপন করেছেন (দুনিয়াতে) দাঁড়ি পাল্লা।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ميزان শব্দের অর্থ যদিও দাঁড়ি পাল্লা করা হয় কিন্তু এর তাৎপর্য হলো ন্যায় বিচার করা। আল্লাহ পাক ন্যায় বিচার কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন এবং প্রত্যেককে ন্যায় বিচার কায়েম করার ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর এভাবেই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সঠিক হয়েছে।

কাতাদা এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে ميزان শব্দ দ্বারা কোন কিছুর পরিমাণ জানার বাহনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ওজন করার আভিধাণিক অর্থ হলো আন্দাজ করা।

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

যেন তোমরা পরিমাপে কম বেশী না কর।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক দাঁড়ি পাল্লা এজন্যে রেখেছেন, যেন তোমরা সীমা লংঘন না কর, কারো হক্ব বিনষ্ট না কর।

ন্যায় বিচার বা ইনসাফ কায়েম করা প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য, আর ইনসাফ কায়েমের প্রশ্ন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্থিত হয়। দুনিয়াতে মানুষকে ন্যায় বিচার কায়েম করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আখেরাতে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতেই মানুষকে পুরষ্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। আর এজন্যেই দুনিয়াতে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে ওজন করার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

(ন্যায্য ভাবে ওজনের মান ঠিক রেখ এবং ওজনে কম দিওনা।)

সঠিক ওজন দেয়ার এবং কারো প্রতি অবিচার না করার এবং মানুষের হক্ব বিনষ্ট না করার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে।

আলোচ্য আয়াতের একথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কথা বলার সময় হক্ব কথা বলা, হক্ব কথার বিরোধিতা না করা, হক্ব কথা গোপন না করা, হক্ব কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত না রাখা, হক্ব বা সত্যের উপর আমল করা, বন্দার হক্ব থেকে আল্লাহ পাকের হক্ব পর্যন্ত যথা নিয়মে আদায় করা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার কায়েম করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

'তোমরা ওজনে কম দিওনা'।

এ সম্পর্কে পুনরায় তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে যে, কখনো কোন অবস্থাতেই ওজনে কম দিওনা। যদি তা কর, তবে কেয়ামতের দিন তোমাদের আমল যখন পাল্লায় পরিমাপ করা হবে তখন তোমরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

'এবং সৃষ্ট জীবের জন্যে আল্লাহ পাক যমীনকে বিছিয়ে রেখেছেন। তাতে ফলমূল, খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, যার ফল আবৃত থাকে। আর তাতে রয়েছে ভূষিযুক্ত তরি-তরকারী এবং সুগন্ধি পুষ্পও'।

পরম করুণাময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সৃষ্ট জীবের বসবাসের জন্যে যমীনকে বিছিয়ে রেখেছেন এবং তাতে রেখেছেন রকমারী ফল ফলারী, তরি-তরকারী এবং সুগন্ধি ফুলের বিপুল সমারোহ। আর এসব মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا

"তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর সব কিছু"।

এজন্যে মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অতএব, (হে জ্বীন ও মানব জাতি! এত অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও) স্বীয় পরওয়ারদেগারের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের কোন নেয়ামতকেই অস্বীকার করা যায়না। আমরা তাঁর নেয়ামতকে অস্বীকার করিনা, তিনি মহান দাতা, সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ
مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ
وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির পাত্রের ন্যায় খনখনে মাটি থেকে।

(১৫) এবং তিনি অগ্নি-শিখা থেকে জ্বীন সৃষ্টি করেছেন।

(১৬) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(১৭) তিনিই দু' মাশরেক (পূর্ব) এবং দু' মাগরেবেরই (পশ্চিম) মালিক।

(১৮) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(১৯) তিনিই প্রবাহিত করেছেন দু'টি সাগরকে, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে বয়ে চলে।

(২০) কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমন একটি বাধা আছে, যা তারা অতিক্রম করতে পারেনা।

(২১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(২২) উভয়ের মধ্য হতে মণি-মুক্তা এবং মারজান নামক দামী পাথর বের হয়।

(২৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(২৪) সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় উঁচু জাহাজগুলো তাঁরই।

(২৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(২৬) পৃথিবীর সকল বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

(২৭) এবং শুধু তোমার মহান ও সর্বগৌরবের অধিকারী প্রতিপালকের অস্তিত্বই বাকী থাকবে।

(২৮) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তফসীরুল কোরআন

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, এরপর মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করা হয়েছে, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পার? অর্থাৎ কোন নেয়ামত অস্বীকার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আলোচ্য সূরায় বিভিন্ন নেয়ামতের উল্লেখ করে ৩১ বার এ প্রশ্ন করা হয়েছে। এর দ্বারা মহান দাতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের অগণিত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাঁর শোকর গুজার হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। লব্ধ নেয়ামতের হক্ব আদায়ের পন্থা হলো নেয়ামতদাতার বিধি-নিষেধ পালন করা, তাঁর বিধানের বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা এবং সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আর আলোচ্য আয়াতে মানব জাতি ও জ্বীন জাতির সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহ পাক পোড়া মাটির পাত্রের ন্যায় খনখনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অগ্নি-শিখা থেকে। আর ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে।

আল্লামা আবু হাইয়ান লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের الانسان শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। جان শব্দ দ্বারা ইবলিসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

মাটি থেকে সৃষ্টি করা মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন। তাকে দান করেছেন তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত। আল্লাহ পাক মানব জাতিকে তাঁর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, আর মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর বন্দেগীর জন্যে

১। তফসীরে আল বাহরুল মুহীত, খড়-৮, পৃষ্ঠা-১৮৭

নির্দিষ্ট করেছেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যেই সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার পরিচয় লাভ করে, আমার মা'রেফাত হাসিল করে এবং শুধু আমার বন্দেগীতে মশগুল হয়।

অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রবর্তিত বিধি-নিষেধ পালনে তৎপর হওয়া।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থাৎ হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

তিনি দু' মাশরেক (পূর্ব) এবং দু' মাগরেবেরই (পশ্চিম) মালিক।

দু' মাশরেক, দু' মাগরেব দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের, শীত-গ্রীষ্মের উদয় ও অস্ত যাওয়ার দু'টি স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ব মানবের অনেক হিত সাধিত হয়, তাই এর পরিবর্তনও আল্লাহ্ পাকের একটি নেয়ামত।

এ নেয়ামতের উপলব্ধি করে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও মানুষের কর্তব্য।

অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ্ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

তিনিই প্রবাহিত করেছেন দু'টি সাগরকে, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে বয়ে চলে।

আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রবহমান দু'টি সাগরের মাঝে একটি অদৃশ্য অন্তরাল রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করতে পারেনা। একটির পানি লবনাক্ত, আর অন্যটির পানি মিষ্ট। উভয়টিই পাশাপাশি মিলে মিশে থাকে, কিন্তু একটি আরেকটির মাঝে প্রবেশ করতে পারেনা, একটি অন্যটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। একত্রিত হয়ে প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পানির বর্ণ ও স্বাদে পার্থক্য বর্তমান থাকে। মহান আল্লাহ্ পাকের হুকুমের প্রতি উভয় সাগরই আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছে।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অতএব, (হে জ্বীন ও মানব জাতি!) এ সমুদ্র সমূহের সৃষ্টিতে তোমাদের যে বিশেষ এবং অনেক উপকার রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের যে বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, তার কোন্ কোন্টিকে তোমরা অস্বীকার করতে পার?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

'উভয় সমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা এবং মারজান নামক মূল্যবান পাথর বের হয়'।

সমুদ্র-গর্ভের মণি-মুক্তা এবং সমুদ্রের উপরে চলমান নৌযান আল্লাহ পাকের দান স্বরূপই মানুষ লাভ করে। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

বছরের প্রথম বৃষ্টিপাত যখন হয় তখন সমুদ্রের ঝিনুকগুলো তাদের মুখ খুলে রাখে, ঝিনুকের মুখে বৃষ্টির প্রথম ফোটাটি যদি পড়ে তবে তা মুক্তায় রূপান্তরিত হয়।

আলোচ্য আয়াতের اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ এর ব্যাখ্যায় এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, لؤلؤ হলো বড় বড় মুক্তা, আর مرجان হলো ছোট মুক্তা।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, لؤلؤ হলো ছোট মুক্তা, আর مرجان হলো বড় মুক্তা।

এবনে ওহাব (রঃ) বলেছেন, مرجان হলো বড় বড় মুক্তা।[১]

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় উঁচু জাহাজগুলো তাঁরই। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমুদ্রগামী জাহাজগুলো মানুষই তৈরী করে এবং সমুদ্রের বুক চিরে মানুষই দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করে। কিন্তু জাহাজ নির্মাণের কৌশল এবং জাহাজ পরিচালনার ক্ষমতা এবং সাহস নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকেরই দান। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১৯

সমুদ্র বক্ষের পর্বত-প্রমাণ উঁচু জাহাজগুলো তাঁরই, এমনিভাবে সমুদ্রের তলদেশে সংরক্ষিত বহু মূল্যবান মণি-মুক্তাগুলোও তাঁরই দান। হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের মহান সত্ত্বা'।

অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছুই কেয়ামতের দিন ধ্বংস হবে।

অথবা যখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হবে তখন সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

অথবা এর অর্থ হলো, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু আপন অস্তিত্বের দিক থেকে নশ্বর, ধ্বংসশীল, কারোই নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের দান, যা স্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী বা অবিনশ্বর শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা, যিনি, চিরস্থায়ী, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কখনো যাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই অথচ সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে, ক্ষয় আছে। তিনি সর্বদা আছেন, সর্বদা থাকবেন, তিনি মৃত্যু বা লয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ পাক ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা "ইয়া জাল জালালে ওয়াল ইকরাম" সর্বদা পাঠ করতে থাক।

হেসনে হাসীন কিতাবে রয়েছে, এক ব্যক্তি "ইয়া জাল জালালে ওয়াল ইকরাম" পাঠ করছিল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমার দোয়া কবুল হবে, তুমি যা কিছু চাওয়ার থাকে চেয়ে নাও।

বস্তুতঃ মানুষ ও জ্বীন জাতির প্রতি এটিও আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ দান যে, তিনি তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার তওফিক দান করেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁর আরেকটি দান হলো দুনিয়াতে যাদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ রহমতে আখেরাতে চিরস্থায়ী অস্তিত্ব দান করবেন। এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটবে সত্য, কিন্তু আখেরাতে প্রত্যেককে তিনি চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? [১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৫৭

ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, যখন তুমি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পাঠ কর, তখন সঙ্গে সঙ্গে وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ পাঠ করবে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রথমে বিশ্বসৃষ্টির অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন, এরপর আলোচ্য আয়াতে সৃষ্টি জগতের লয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি দোয়া উল্লেখযোগ্য, তিনি এভাবে দোয়া করতেন ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلَا اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۝٢٩ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٠
سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝٣١ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٢ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝٣٣ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرٰنِ ۝٣٥ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٦ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۗءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝٣٧ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٨

তরজমা

(২৯) আসমান যমীনের প্রত্যেকেই তাঁর নিকটই প্রার্থনা করে, তিনি প্রত্যেক দিন নুতন নুতন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

(৩০) অতএব হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৩১) হে জ্বীন ও মানব জাতি! অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো।

(৩২) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৩৩) হে জ্বীন ও মানব জাতি! যদি তোমরা আসমান ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে যেতে পার, তবে বের হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা তা পারবেনা শক্তি ব্যতীত।

(৩৪) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৩৫) তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে মারা হবে অগ্নি শিখা ও ধুম্রকুন্ড, তোমরা তখন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেনা।

(৩৬) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৩৭) যেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্ত রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে।

(৩৮) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তফসীরুল কোরআন

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যেখানেই যা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, তাঁর দানের মোহতাজ। জ্বীন, মানুষ, ফেরেশতা, সকলেই তাঁর দ্বারের ভিখারী, সকলের আবেদন এবং করজোড়ে বিনীত প্রার্থনা এক আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই, তাঁর দানে সকলেই ধন্য, তার দয়ায় সকলেই মুগ্ধ, সমগ্র সৃষ্টি জগৎই তাঁর রহমতের কাঙ্গাল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আসমান যমীনের প্রত্যেকে তাঁর নিকটই প্রার্থনা করে থাকে। রহমত, মাগফেরাত, রিয্ক, দৌলত, এবাদত করার তৌফিক-এক কথায় সব কিছুর জন্যেই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সকলেই সর্বদা আরজী পেশ করতে থাকে।

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ

তিনি প্রত্যেক দিন নুতন নুতন কার্যে রত। প্রতি দিনই আল্লাহ পাকের স্বতন্ত্র কাজ, নতুন নতুন শান এবং নতুন নতুন সাজ। কাউকে তিনি সৃষ্টি করেন আর কারো মৃত্যু ঘটান। কোন ব্যক্তি বা জাতিকে সম্মানিত করেন, আর কাউকে অপমানিত করেন। কোন রিয্ক প্রার্থীকে রিয্ক দান করেন, আর কাউকে অভাবগ্রস্ত করেন। কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করেন, আর কাউকে করেন অসুস্থ। কারো বিপদ দূর করে দেন, আর কাউকে করেন বিপদগ্রস্ত, দয়া প্রার্থীকে দান করেন, মোমেনকে করেন ক্ষমা, আর কাফেরদেরকে দোযখের আদেশ প্রদান করেন। যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযিরীর বিষয়কে ভয় করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্মানিত করেন এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের শান হলো এই যে, তিনি গুনাহ মাফ করে দেন, বিপথগ্রস্ত মানুষের বিপদ দূর করে দেন, কোন জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় অসীন করেন, আর কোন জাতিকে অপমানিত করেন। (এবনে মাজা, এবনে হাব্বান)

হোসায়েন এবনুল ফজল আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের শান হলো, তিনি পৃথিবীর সব কিছু যা তকদীরে লিপিবদ্ধ আছে, সঠিক সময়ে স্ব-স্ব স্থানে পৌঁছে দেন।

সোলায়মান এবনে উয়াইনাহ বলেছেন, সময়কে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। পৃথিবীর শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কে একদিন বলা যায়। আর দ্বিতীয় দিন হলো কেয়ামতের দিন। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাক কোন কাজ করার এবং কোন কাজ না করার আদেশ দিয়ে থাকেন। তিনিই দান করেন জীবন, আর তিনিই মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের অবসান ঘটান। কোন লোককে তিনি রিয্ক বাড়িয়ে দেন, কোন লোকের রিয্ক তিনি হ্রাস করে দেন। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের শান হবে আমলের প্রতিদান দেয়া, হিসাব গ্রহণ করা এবং সওয়াব বা আযাব দেয়া।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ পাকের শান হলো, আল্লাহ পাক প্রত্যেক দিনই এক দল লোককে পৃথিবীতে পৌঁছে দেন, আরেক দল লোককে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন। অবশেষে একদিন সকলকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আল্লাহ পাক শনিবার দিন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না, তাদের এ ভিত্তিহীন মন্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক দিনই নুতন নুতন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকেন এবং প্রত্যেক দিনই তাঁর নুতন শান, নুতন সাজ, নুতন কাজ।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১০৮-০৯
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১১০-১১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২২১-২২

'অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়মতকে অস্বীকার করবে?'

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ

'হে জ্বীন ও মানব জাতি! অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

অর্থাৎ অচিরেই দুনিয়ার সকল কর্মব্যস্ততার অবসান ঘটবে, আল্লাহ পাক সমগ্র মানব ও জ্বীন জাতির যাবতীয় হিসাব গ্রহণ করবেন। অবাধ্য কাফেররা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে এবং ঈমানদার ও নেককারগণ চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভ করবে।

আলোচ্য আয়াতের سنفرغ শব্দটির ব্যাখ্যায় জুযাজ (রঃ), কাসায়ী (রঃ), এবনুল আরাবী এবং আবু আলী ফারসী (রঃ) এবং আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটিতে যে فراغ কথাটি রয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ পাক কোন কাজে বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন, পরে অবসর পাবেন, বরং এতে রয়েছে সতর্কবাণী এ মর্মে যে, অচিরেই আমি তোমাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব গ্রহণ করবো। তখন তোমাদের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ তার বিচার হবে, কেননা আল্লাহ পাকের একটি শান আরেকটি শানকে বাধা দিতে পারেনা; তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করেন, যেহেতু মানব ও জ্বীন জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন রয়েছে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মানব ও জ্বীন জাতির ওপরে, প্রকৃতপক্ষেই এটি বিরাট বোঝা, বিশেষ আমানত, তাই জ্বীন ও মানুষ সম্পর্কে ثقلٰن শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

(১) হে মানব ও জ্বীন জাতি! তোমাদেরকে শাস্তি অথবা পুরষ্কার দেয়ার জন্যে অদূর ভবিষ্যতে আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো।

(২) একথাটি দ্বারা মানব ও জ্বীন জাতিকে তাদের জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশের জন্যে সতর্ক করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

(৩) হে মানব ও জ্বীন জাতি! বর্তমানে তোমাদেরকে যেভাবে অবকাশ দেয়া হয়েছে ভবিষ্যতে আর এ অবকাশ দেয়া হবেনা। অচিরেই তোমাদের এ অবকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় হিসাব প্রদানের জন্যে দাঁড়াতে হবে এবং অচিরেই আমি তোমাদের বিষয়ে ফয়সালা করে দেব।

১। তফসীরে হক্কানী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৩৯

(৪) আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে নেক্‌কারদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং অপরাধীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, আমার পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির ঘোষণা কার্যকর হবে।

হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এ ব্যাখ্যা করেছেন।

মানব ও জ্বীন জাতির ব্যাপারে ثقلٰن শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো, ثقل শব্দটি হলো বোঝা, মানুষ ও জ্বীন জীবিত হোক কি মৃত যমীনের উপর একটি বোঝা স্বরূপ, ইমাম জাফর আস সাদেক (রাঃ) বলেছেন, যেহেতু মানব ও জ্বীন জাতি গুনাহর বোঝা নিয়ে চলে, তাই তাদেরকে ثقلٰن বলা হয়েছে।

কোন্ কোন্ তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যার মর্তবা উচ্চে তাকে ثقلٰن বলা হয়। যেমন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে রয়েছে–

انى تارك فيكم ثقلين كتاب اللّٰه وعطرتى

(আমি তোমাদের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি একটি আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কোরআন) এবং আর একটি আমার আহলে বায়েত।)

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'টি বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ মর্তবার কারণে এ পর্যায়ে ثقلين শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ثقلين শব্দটির এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে অচিরেই তোমাদের বিষয়ে আমি মনোনিবেশ করবো, তোমাদের হিসাব গ্রহণ করবো। বর্ণিত আছে হযরত আবুজর (রাঃ) আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কেয়ামতের দিন আমরা কি কোন আড়াল ব্যতীত মহান আল্লাহ পাকের দিদার লাভ করতে পারবো, তিনি জবাবে এরশাদ করলেন, কেন নয়? তখন আমি আরজ করলাম, সৃষ্টি জগতে এর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রকে তোমরা বিনা বাধায় দেখতে পার না? আমি আরজ করলাম অবশ্যই। তখন তিনি এরশাদ করলেন, চন্দ্রতো আল্লাহর একটি সৃষ্টি মাত্র, আল্লাহ পাকের শান মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব সর্বোচ্চে। (আবু দাউদ)

যেহেতু এ আয়াতে কেয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে আর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করাও একটি নেয়ামত, যাতে মানুষ পূর্বোই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হে মানব ও জ্বীন জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ

হে জ্বীন ও মানব জাতি! যদি তোমরা আসমান ও যমীনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যেতে পার তবে বের হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতীত।

আসমান যমীনে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে এক আল্লাহ পাকেরই আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। নিখিল বিশ্বের এমন কিছুই নেই যা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, যদি আল্লাহ পাকের বিধান অপছন্দনীয় হয় তবে আসমানের নীচ থেকে যমীনের উপর থেকে তোমরা বের হয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহর দুনিয়া থেকে বের হয়ে আত্মরক্ষার কোন স্থান নেই। কোন কোন তফসীরকার বর্ণনা করেছেন, আসমান ও যমীনের প্রান্ত অতিক্রম করে যদি মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করতে পার তবে বের হয়ে যাও তবে মনে রেখ যেখানেই তোমরা থাক, মৃত্যু তোমাদের নিকট পৌঁছবেই। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ কথাগুলো কেয়ামতের দিন হবে।

এবনে জরীর, এবনে মোবারক যাহ্যাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বর্ণিত আছে যে মানব ও জ্বীন জাতিকে কেয়ামতের দিন একথাটি বলা হবে, আল্লাহ পাকের হুকুমে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান ফেটে যাবে, ফেরেশতাগণ আসমানের প্রান্ত সমূহে থাকবে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে তারা পৃথিবীতে অবতরণ করবে। আর পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীদেরকে চর্তুদিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। এরপর একের পর এক সাতটি আসমানের ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে যাবে (এবং পৃথিবীর সকল অধিবাসীদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে) এরপর স্বয়ং মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন আত্ম প্রকাশ করবেন, বাম দিকে দোযখ থাকবে, দোযখকে দেখে যমীনের অধিবাসীগণ পলায়নপর হবে, কিন্তু যমীনের যে প্রান্তেই পৌঁছবে সেখানেই দেখবে ফেরেশতাদের সাতটি দল তাদেরকে ঘেরাও করে আছে, তখন বাধ্য হয়ে যে যেখান থেকে পলায়ন করেছিল সেখানে ফিরে আসবে, আর একথাই কোরআনে করীমের ওয়াল ফাজরে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞ وَجِآءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۞ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى

'এবং (হে রসূল!) যখন আপনার প্রতিপালকের শুভাগমন হবে এবং ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত থাকবে, আর সেদিন দোযখকে আনা হবে, সেদিন মানুষ সত্য উপলব্ধি করবে কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে'?

কেয়ামতের সে কঠিন দিনেই মানব ও জ্বীন জাতিকে সম্বোধন করে ঘোষণা করা হবে,

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

হে জ্বীন ও মানব জাতি! যদি তোমরা পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে যেতে পার তবে বের হয়ে যাও, তবে বের হতে পারবেনা শক্তি ব্যতীত।

আর এ শক্তি সেদিন কারোই হবেনা, কেননা মানুষের যা শক্তি আছে তা-তো আল্লাহ পাকেরই দান।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অর্থাৎ "অতএব, আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার"?

কোরআনে করীমের মাধ্যমে এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতিকে কেয়ামতের কঠিন দিনের ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে, যেন সে বিপদের দিনের জন্যে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, নিঃসন্দেহে মানব জাতির জন্য এটিও আল্লাহ পাকের রহমত, অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের একথাটি আখেরাতে বলা হবে। যখন দোযখের আযাব দেখে মানুষ পলায়নের চেষ্টা করবে এবং চতুর্দিকে অগণিত ফেরেশতার প্রহরা দেখবে তখন তারা বুঝবে, আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পলায়নের শক্তি নেই।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছন, এ আয়াতের মর্ম দুনিয়ার ব্যাপারেও হতে পারে, আখেরাতের ব্যাপারেও হতে পারে, দুনিয়ার ব্যাপারে হলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এভাবে হে মানব জাতি! যদি মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে পার, তবে পলায়ন কর কিন্তু তা অসম্ভব, অচিন্তনীয়।

যদি আয়াতের মর্ম আখেরাতের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়, তবে এর অর্থ হবে এই যে, কেয়ামতের দিন অগণিত ফেরেশতাগণ বিশ্ববাসীকে ঘেরাও করে রাখবে, তাদের পলায়নের কোন পথ থাকবেনা। তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, কেয়ামতের পূর্বক্ষণে লোকেরা যখন হাট-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকবে, এমন সময় কেয়ামতের ঘোষণা হবে। ফেরেশতাগণ অবতরণ করবে, এমন অবস্থায় মানুষ পলায়নের কোন পথই পাবেনা।[৩]

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২২৫-২৬
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১১৩
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১১২

তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে মারা হবে অগ্নি শিখা ও ধুম্রকুন্ড তোমরা তখন প্রতিরোধ করতে অক্ষম হবে না, অর্থাৎ হে জ্বীন ও মানব জাতি! কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে মারা হবে অগ্নি শিখা এবং নিক্ষেপ করা হবে ধূম্রকুন্ড।

আলোচ্য আয়াতের شواظ এর অর্থ হলো এমন অগ্নিশিখা যাতে ধুম্র না থাকে, অধিকাংশ তফসীরকারগণ শব্দটির এ ব্যাখ্যা করেছেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, شواظ বলা হয় সেই সবুজ অগ্নি শিখাকে যা বন্ধ হওয়ার পর বের হয়ে আসে।

সাঈদ এবনে যুবায়ের এবং কালবী (রহঃ) نحاس শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন ধুম্র।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এ ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই, কখনো তাদের প্রতি অগ্নি শিখা নিক্ষেপ করা হবে আর কখনো ধুম্র ছুঁড়ে মারা হবে।

এবনে জরীর লিখেছেন, অগ্নি শিখা এবং ধুম্র একই সঙ্গে ছাড়া হবে, আর মুজাহেদ (রহঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, نحاس হলো গলানো তামা যা কাফেরদের মাথার উপর ঢালা হবে।

উফী (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না বা এর অর্থ হলো তোমরা তখন কোন সাহায্যকারী পাবে না।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে গমনের সময় কাফেরদের প্রতি অগ্নি শিখা নিক্ষেপ করা হবে। সেই কঠিন বিপদের সময় তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না যে তাদেরকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

যে সব কারণে কেয়ামতের দিন আযাব হবে সেগুলো সম্পর্কে সাবধান করা নিঃসন্দেহে রহমত আর এ রহমত লাভ করার পর ইচ্ছা করলে মানুষ আত্মরক্ষা করার পথ অবলম্বন করতে পারে, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পার?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

যেদিন আসমান বিদীর্ণ হয়ে রক্তে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে, অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে।

যখন আসমান বিদীর্ণ হবে, সেদিন আসমানের বর্ণ রক্তে রঞ্জিত লাল চামড়ার ন্যায় হবে, আসমান বিদীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ফেরেশতাগনের অবতরণের পথ হবে, এদিকে সমগ্র মানব জাতিকে কবর থেকে উঠানো হবে, সেদিন আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম ভয়-ভীতি প্রকাশ পাবে।

কেয়ামতের সে ভয়াবহ অবস্থার কারণেই আসমানের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তখন আসমানের বর্ণ হবে লাল চামড়ার ন্যায়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আসমানের বর্ণ গোলাপী হবে।

আবু সালেহ (রহঃ) বলেছেন, আসমানের বর্ণ প্রথমে গোলাপী হবে এরপর লাল হয়ে যাবে।

আজকে আকাশের বর্ণ নীল আর সেদিন হয়ে যাবে লাল, এভাবে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হবে।[১]

অতএব হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

আলোচ্য আয়াতের وردة শব্দটির তরজমা সম্পর্কে বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তা হবে লাল গোলাপের ন্যায় বা লাল চামড়ার ন্যায়। যাহ্যাক (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা হবে লাল চামড়ার ন্যায়, কালবী (রহঃ) এ তরজমাই করেছেন। কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আসমানের বর্ণ এখন যা আছে কেয়ামতের দিন তা পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেদিন তা লাল বর্ণের হবে।

যাহ্যাক (রহঃ), মুজাহেদ (রহঃ), কাতাদা (রহঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আতা এবনে আবি রুবাহ (রহঃ) বলেছেন, আসমানের বর্ণ পরিবর্তন হতে থাকবে আর তা যয়তুনের তেলের ন্যায় হয়ে যাবে। আর এবনে যুরায়েজ (রহঃ) বলেছেন, আসমান যয়তুনের তেলের ন্যায় হয়ে যাবে আর তা হবে দোযখের আগুনের প্রতিক্রিয়া।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৬০
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২২৮
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা- ১০৬৪

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ
الْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ
بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا
عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ
فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾

তরজমা

(৩৯) সেদিন কোন জ্বীন বা মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা।

(৪০) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৪১) সেদিন পাপীষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে তাদের পা এবং কপালের চুল্ ধরে।

(৪২) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৪৩) এটি সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা জ্ঞান করতো।

(৪৪) তারা দোযখের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির সমুদ্রের মধ্যে ছুটোছুটি করবে।

(৪৫) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৪৬) আর যে কেউ তার প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে দু'টি বাগান রয়েছে।

(৪৭) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৪৮) উভয় বাগানই বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

(৪৯) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৫০) উভয় বাগনের মধ্যেই দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত রয়েছে।

(৫১) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৫২) উভয় বাগানেই রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়া জোড়া।

(৫৩) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াত সমূহে কেয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ

"সেদিন কোন জ্বীন বা মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা"।

অর্থাৎ একথা জিজ্ঞাসা করা হবেনা, এ কাজটি কি তুমি করেছিলে? বা এ কাজটি তুমি করনি? কেননা, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত, কে কি করেছে আর কে কি করেনি।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকের আমলনামায় তার কর্মজীবনের ছোট-বড় যাবতীয় কথা লিপিবদ্ধ থাকবে। ফেরেশতাগণ প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র জীবনের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখছেন।

তৃতীয়তঃ যদি কোন ব্যক্তি আমলনামায় লিপিবদ্ধ বিবরণকে অস্বীকার করে এবং বলে যে আমি এ কাজ করিনি, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

আজকের দিনে আমি তাদের মুখ মোহর করে দেব, তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, আর তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো'।

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের মর্মের বিরোধী নয়, কেননা মানুষকে একথা জিজ্ঞাসা করা হবেনা যে এ কাজটি সে করেছে কি-না? বরং একথা জিজ্ঞাসা করা হবে যখন তোমাদের জন্যে এ কাজটি নিষিদ্ধ ছিল, তবু কেন তা তুমি করেছ? অথবা জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাকে অমুক আদেশ দেয়া হয়েছিল কেন তা পালন করোনি?

একরামা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, কেয়ামতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন কোন স্থানে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করেছ? সে স্থানের জন্যেই ঘোষণা করা হয়েছে,

لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে)

আর এমনও স্থান থাকবে যেখানে জিজ্ঞাসা করা হবেনা, সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

তফসীরকার আবুল আলীয়া বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো কোন অপরাধী ব্যক্তির কর্মকান্ড সম্পর্কে অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। এতদ্ব্যতীত ফেরেশতাগণ মানুষের চেহারা দেখেই চিনে ফেলবে কে ঈমানদার ও নেককার, আর কে বেঈমান ও পাপীষ্ঠ। আর হাদীস শরীফে একথাও উল্লেখিত আছে, মানুষের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজু করার সময় ধৌত করা হয়; সেগুলো কেয়ামতের দিন চাঁদের ন্যায় চমকদার হবে।[১]

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ

'সেদিন পাপীষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারাতে, তখন পাকড়াও করা হবে তাদেরকে তাদের পা এবং কপালের চুল ধরে'।

পাপীষ্ঠদের পরিণতি

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, সেদিন মানুষ ও জ্বীনকে তাদের পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, কেন জিজ্ঞাসা করা হবেনা, এর জবাবেই যেন এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কেয়ামতের দিন পাপীষ্ঠদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই হবেনা, কেননা তাদের চেহারা থেকেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। অপরাধের চিহ্ন থাকবে তাদের চেহারায়, যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৬১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২২৮

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ.....هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

(সূরা আলে এমরানঃ আয়াত ১০৬)

'সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কিছু মুখ হবে কালো, যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলে? অতএব, তোমরা শাস্তি ভোগ কর, তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে, আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের মধ্যে থাকবে, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে'।

যাহোক, কেয়ামতের দিন নাফরমানদের চেহারাতেই তাদের পরিচয় ফুটে উঠবে, তাদেরকে দেখলেই বুঝতে বাকী থাকবেনা যে, তারা অপরাধী। তখন তাদের পা এবং কপালের চুল একত্রিত করে বেধে ফেলা হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, পিঠের দিক থেকে জিঞ্জির দিয়ে ঘাড় এবং পা একত্রিত করে বেধে দেয়া হবে এবং কোমর ভেঙ্গে দেয়া হবে ও দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জীব্রাঈল (আঃ) আমাকে জানিয়েছে (আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন) মুসলমানের মৃত্যুর সময়, কবরে অবস্থানের সময় এবং কবর থেকে বের হওয়ার সময় কলেমায়ে তৈয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ভয়-ভীতি লাঘব হওয়ার কারণ হবে। হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! (আপনি বিস্মিত হবেন) যখন দেখবেন যে, (কেয়ামতের দিন) লোকেরা মাথার মাটি ঝেড়ে কবর থেকে বের হচ্ছে এবং কেউ বলছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল হামদুলিল্লাহ। আপনি দেখবেন, তার চেহারা উজ্জ্বল। আর অন্য একজন বলবে, হায়! আক্ষেপ! আল্লাহ পাকের বিষয়ে আমি বড় অপরাধ করেছি, এসব লোকদের চেহারা হবে কৃষ্ণ বর্ণের।

আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যারা সুদখোর, তারা কেয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় হাযির হবে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে, তারা ছিল দুনিয়াতে সুদখোর।

এবনে আবি শায়বা, এবনে আবি হাতেম এবং আবু ইয়ালা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, তাদের মুখ থেকে অগ্নি-শিখা বের হতে থাকবে। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)!

এরা কারা? তিনি এরশাদ করলেন, এরা সে সব লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

"যারা এতীমের অর্থ-সম্পদ জুলুম করে হজম করে, তারা মূলতঃ অগ্নি দ্বারা উদর পূর্ণ করে"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকৃতি দিয়ে হাযির করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে অর্থ-সম্পদ চেয়ে ফিরবে, কেয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় হাযির হবে, তার চেহারায় জখম থাকবে।

এবনে মাজা শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস শরীফ সংকলিত হয়েছে। যে ব্যক্তি মোমেনের হত্যাকান্ডে অর্ধেক বাক্য উচ্চারণ করেও সাহায্য করবে, সে (কেয়ামতের দিন) এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে যে তার দু' চক্ষুর মাঝে লেখা থাকবে, "আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ"।

আবু নায়ীম হযরত ওমর (রাঃ) থেকে এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এমনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তি (মসজিদের) কেবলার দিকের দেয়ালে তার নাকের ময়লা নিক্ষেপ করবে, কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, নাকের ঐ ময়লাটি তার চেহারায় লেগে থাকবে।

তেবরানী 'আল আওসাতে' হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে সে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, তার দু'টি আগুনে চেহারা থাকবে।

তেবরানী এবং এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দুনিয়াতে যে দ্বিমুখী কথা বলে, আল্লাহ পাক তাকে কেয়ামতের দিন দু'টি আগুনে জিহ্বা দিয়ে দেবেন।

হাকেম এবং এবনে হাব্বান হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তির দু' স্ত্রী থাকবে এবং সে তাদের মাঝে সমান ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে, কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, তার একটি পাঁজর ঝুঁকে থাকবে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের হাশর দশটি দলের সঙ্গে হবে যাদের মধ্যে একদল বানরের আকৃতিতে হাযির হবে।

অন্য হাদীসে একথাও রয়েছে, যারা দুনিয়াতে কোন মানুষের হক্ব অন্যায়ভাবে নিয়ে যায়, কেয়ামতের দিন তা ঐ লোকদের ঘাড়ে চড়িয়ে দেয়া হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যারা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ থেকে চুরি করবে, কেয়ামতের দিন ঐ চুরি করা বস্তু তার ঘাড়ের উপর চড়িয়ে দেয়া হবে।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ۞ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

'এটিই সেই জাহান্নাম, যাকে পাপীষ্ঠরা মিথ্যাজ্ঞান করতো, তারা অগ্নি এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফেরদেরকে কপালের চুল ধরে অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে পায়ের সঙ্গে বেধে এবং তাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ তখন তাদেরকে বলা হবে, এটিই সেই জাহান্নাম যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে, নবী রসূলগণ যখন তোমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন তখন তোমরা তাঁদেরকে মিথ্যা জ্ঞান করতে, এখন সে দোযখের আগুন ভোগ কর এবং ফুটন্ত পানির স্বাদ গ্রহণ কর।

আলোচ্য আয়াতের اٰنٍ শব্দের অর্থ হলো, অত্যন্ত গরম পানি।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিরমিযী এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন কাফেররা জঠর জ্বালায় চিৎকার করবে এবং খাদ্যের জন্যে ফরিয়াদ করতে থাকবে। তাদেরকে তখন এমন খাবার দেয়া হবে যাতে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হবেনা, তাদের দেহও পুষ্ট হবেনা, আর সে খাদ্য তাদের গলায় আটকে যাবে। তখন তারা স্মরণ করবে, দুনিয়াতে গলায় খাবার আটকে গেলে পানির সাহায্যে সে কষ্ট দূর করতো, তাই তারা তখন পানির জন্যে ফরিয়াদ করবে, আর তখন তাদেরকে এত গরম পানি দেয়া হবে যে, তাদের চেহারা ঝলসে যাবে এবং পেটের ভেতর যখন ঐ পানি পৌঁছবে তখন নাড়ি-ভুঁড়ি কেটে বের হয়ে পড়বে।

কাবে আহবার বলেছেন, اٰنٍ হলো দোযখের একটি উপত্যকা, যাতে দোযখীদের রক্ত, পূজ একত্রিত হবে এবং তাতে দোযখীদের কি নিমজ্জিত করা হবে। পরিণামে তাদের দেহের প্রত্যেকটি জোড়া ছুটে যাবে, এরপর দোযখীদেরকে ঐ উপত্যকা থেকে বের করা হবে এবং তাদের দেহ নতুন করে সৃষ্টি করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আলোচ্য আয়াত يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ এর এটিই ব্যাখ্যা।

فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দোযখের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে, যাতে করে মানুষ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে এবং আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমেই আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। তাই আলোচ্য আয়াত সমূহের সতর্কবাণীও আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত, আর এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'আর যে কেউ তার প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

শানে নজুল

এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ আতা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) কেয়ামতের কঠিন দিন, হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাত ও দোযখের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমার জন্মই না হতো! হায়! যদি আমি ঘাষ হয়ে জন্ম নিতাম, তবে কোন চতুঃষ্পদ জন্তু আমাকে খেয়ে নিত। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধান যথাযথভাবে পালন করে। যারা কখনো আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়না, যারা প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, যারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লোভে মোহে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে ভুলে যায় না, যারা দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের চিন্তা করে অধিক পরিমাণে, যারা আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যারা অবশেষে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হিসাব নিকাশের জন্যে দন্ডায়মান হতে হবে বলে চিন্তা করে এবং সে অবস্থাকে অত্যন্ত বেশী ভয় করে, তাদের জন্যে জান্নাতে দু'টি বাগান রয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ দু'টির মধ্যে একটি হলো জান্নাতে আদন, আরেকটি হলো জান্নাতে নায়ীম। হাদীস শরীফে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, দু'টি জান্নাত রৌপ্যের, আর দু'টি হবে স্বর্ণের, রৌপ্যের জান্নাতে যা কিছু থাকবে তৈজষপত্র সহ সবই রৌপ্যের হবে। আর স্বর্ণের তৈরী জান্নাতের সব কিছুই স্বর্ণের হবে। জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে আদনে আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন।

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

"উভয় বাগানই বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

افنان শব্দটি فنن শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, বৃক্ষ-শাখা থেকে যে প্রশাখা বের হয়, যা দ্বারা বৃক্ষের ছায়া হয়। তফসীর মুজাহেদ (রহঃ) এবং কালবী (রঃ)افنان এর এ ব্যাখ্যাই করেছন।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, فنن বৃক্ষ শাখার সে ছায়াকে বলা হয় যা বাগানের দেয়ালে পড়ে।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হল ছায়া বিশিষ্ট বৃক্ষ।

আর তফসীরকার সায়ীদ এবনে যুবায়ের এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, জান্নাতের এ বৃক্ষ সমূহে বিভিন্ন আকৃতির, স্বাদের রকমারী ফল থাকে। একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ব্যাখ্যা করেছেন।

অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

"উভয় বাগানের মধ্যেই দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত রয়েছে। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে"?

অর্থাৎ জান্নাতে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে। এ নহর পানিরও হবে, দুধেরও হবে এবং মধুর নহরও থাকবে। সারাবান তহুরার নহরও থাকবে, পানির ফোয়ারা গুলোতে স্বচ্ছ নির্মল পানি থাকবে যা কখনও শুস্ক হবেনা, তাতে কখনও ময়লা দেখা দেবেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত হাসান (রঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতে চারটি নহর থাকবে তন্মধ্যে দু'টি আরশের নীচ থেকে প্রবাহিত হবে, আর দু'টি হল সালসাবিল ও তাসনীম। একটিতে স্বচ্ছ পানি রয়েছে, আরেকটিতে সুস্বাদু, নেশাবিহীন শরাব রয়েছে।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

উভয় বাগানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়া জোড়া। ফলগুলো দেখতে মানুষের পরিচিত হবে, কিন্তু তার স্বাদ হবে বিস্ময়কর যার কথা কেউ শোনেনি, দুনিয়াতে যা কেউ কল্পনাও করেনি।

অতএব হে মানব ও জ্বীন জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে যত মিঠা কড়া ফল রয়েছে, সবই জান্নাতে থাকবে।

এবনে জরীর ও বায়হাকী বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে যা কিছু রয়েছে দুনিয়াতে শুধু তার নামই রয়েছে, স্বাদ, অবস্থা প্রকৃতি জান্নাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।১

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍ

بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَآنٌّ ۚ ﴿٥٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ
الْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ
اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৫৪) তারা জান্নাতের দু' বাগানে এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যার আস্তর রেশমের তৈরী এবং উক্ত দু'টি বাগানের ফল থাকবে তাদের নিকটবর্তী।

(৫৫) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৫৬) তাদের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না রমণী, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করেনি।

(৫৭) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৫৮) তারা যেন রক্তবর্ণ হিরক ও মুক্তা।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২২৫-৩৬

(৫৯) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৬০) উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?

(৬১) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৬২) ঐ দু'টি বাগান ব্যতীত আরও দুটি বাগান রয়েছে।

(৬৩) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৬৪) গাঢ় সবুজ ঐ দু'টি।

(৬৫) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৬৬) ঐ দু'টি বাগানে রয়েছে দু'টি উচ্ছ্বসিত ঝর্ণা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জান্নাতবাসীগণের জন্যে জান্নাতে যে অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াত সমূহেও জান্নাতের আরো অনেক নেয়ামতের বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

'তারা জান্নাতের দু' বাগানে এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যার আস্তর রেশমের তৈরী এবং উক্ত দু' বাগানের ফল থাকবে তাদের নিকটবর্তী।

জান্নাতের কয়েকটি নেয়ামত

যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, যারা একথায় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাকের সম্মুখে একদিন দাঁড়াতে হবে, তারা জান্নাতে রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় পরম সুখে হেলান দিয়ে বসবে। এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ পাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, আল্লাহ পাক তাদের জন্যে রেখে দিয়েছেন রেশমের আস্তর বিশিষ্ট আরামদায়ক বিছানা, যাতে তারা হেলান দিয়ে মহা আনন্দে বসবে এবং জান্নাতের ফলমূল তাদের নিকটবর্তী হবে। হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) আরো বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার শুধু আস্তরের কথা বলা হয়েছে, অতঃপর বিছানার উপরের সৌন্দর্য কত বেশী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার আস্তরের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা রেশমের কাপড় দ্বারা তৈরী হবে কিন্তু বিছানা কেমন হবে তা বলা হয়নি; কেননা এ পৃথিবীতে সে মূল্যবান বিছানা সম্পর্কে কেউই অবগত নয় এবং তা কত সুন্দর হবে তা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতের বিছানা নূরের হবে।

আবু নায়ীম সায়ীদ এবনে যোবায়েরের তরফ থেকেও এ বিবরণেরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর জান্নাতীদের জন্যে ফল নিকটবর্তী হবে, তারা দন্ডায়মান থাকুক, অথবা উপবিষ্ট কিংবা শায়িত, সকল অবস্থায় তারা জান্নাতী ফল হাতের কাছেই পাবে অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই জান্নাতী ফল তাদের নাগালের বাইরে থাকবেনা।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীগণ জান্নাতের ফল সর্বাবস্থায় স্বহস্তে ছিঁড়ে খাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ফলের বৃক্ষগুলো জান্নাতবাসীগণের এত নিকটবর্তী হবে, আল্লাহর প্রিয় বন্দা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তা খেতে পারবে।[১]

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

'তাদের মাঝে রয়েছে বহু আনত-নয়না রমণী, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করেনি'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, ইতিপূর্বে জান্নাতী বিছানার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াতে জান্নাতীদের পবিত্র সহধর্মিনীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা হবে আনত-নয়না, স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করবেনা, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমাকে আপনার সহধর্মিনী করেছেন এবং আপনার খেদমতের সুযোগ দান করেছেন। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ইতিপূর্বে কেউ তাঁদেরকে স্পর্শ করবেনা, কেননা আল্লাহ পাক তাঁর ঈমানদার ও নেককার বন্দাদের জন্যে জান্নাতেই তাদেরকে সৃষ্টি করবেন। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৩৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৬৪

'তারা যেন রক্তবর্ণ হীরক ও মুক্তা। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

সৌন্দর্যে, স্বচ্ছতায় জান্নাতের হুরগণ ইয়াকুত এবং মারজান পাথরের ন্যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হুরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে যে, হুরগণ চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় চমকদার হবে। তারা থুথু ফেলবেনা, তাদের নাক থেকে কোন প্রকার ময়লা বের হবেনা, তাদের মল-মূত্র ত্যাগেরও কোন প্রয়োজন হবেনা।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তারা কখনো অসুস্থ হবেনা। তাদের তৈজষপত্র, তাদের চিরুনি প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্যের হবে। তাদের দেহের ঘাম হবে কস্তুরী, প্রত্যেকের এমনি দু'জন স্ত্রী থাকবে। তারা হবে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। জান্নাতে কোন প্রকার মতভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবেনা। তারা এক মনের অধিকারী হবে। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকবে।

তিরমিযী এবং বায়হাকী হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে যে দলটি সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে, তারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর হবে। আর দ্বিতীয় দলও আসমানের সুন্দরতম নক্ষত্রের ন্যায় হবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে দু'জন জীবন-সঙ্গিনী হবে।

ইমাম আহমদ (রঃ), এবনে হাব্বান (রঃ) এবং বায়হাকী (রঃ) হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো হুরদের চেহারা এত সুন্দর হবে যে, পর্দার আড়াল থেকেও আয়নার ন্যায় পরিচ্ছন্ন দেখা যাবে। আর তারা যে মুক্তা পরিধান করবে তা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত আলোকময় করে তুলবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে এরশাদ করেছেনঃ দেখ! ইয়াকুত একটি পাথর, আল্লাহ পাক তার মধ্যে এমনি পরিচ্ছন্নতা রেখেছেন যে, তার মধ্যখান দিয়ে যদি কোন সুতা ব্যবহার হয় তবে তার বাইরে থেকে তা দেখা যাবে। (এবনে আবি হাতেম)

তিরমিযী শরীফেও এ বিবরণ সংকলিত হয়েছে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৬৫
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৩৮

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরষ্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে? অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ দুনিয়াতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আখেরাতে তারা অবশ্যই এর শুভ-পরিণতি লাভ করবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ তেলাওয়াত করে এরশাদ করেন, তোমরা কি জান যে, তোমাদের প্রতিপালক কি এরশাদ করেছেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যাকে আমি তৌহীদের নেয়ামত দান করেছি তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে তার মর্মের অঙ্গীকার করবে এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে জীবন-বিধান নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করবে, তার বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ- فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'ঐ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার কথা স্মরণ রাখবে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করবে, তার জন্যে চারটি জান্নাত থাকবে, দু'টির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টির কথা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইতিপূর্বে জান্নাতের যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা মর্তবার দিক থেকে এ আয়াতে উল্লেখিত বাগান দু'টি থেকে উচ্চতর।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৩৯

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বাগান দু'টি পূর্বে বর্ণিত বাগানগুলো থেকে কম মর্তবার।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেছেন, ইতিপূর্বে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো স্বর্ণের আর সে বাগানগুলো তাদের জন্যে যারা সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে যে দু'টি বাগানের কথা বলা হয়েছে, তা সে সব লোকদের জন্যে যারা পূর্ববর্তী লোকদের অনুসরণ করেছে, আর এ বাগান দু'টি হবে রৌপ্যের।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাকের আরশ ছিল পানির উপর, এরপর আল্লাহ পাক নিজের জন্যে জান্নাত তৈরী করেছেন, এরপর তাতে দ্বিতীয় জান্নাত তৈরী করেছেন এবং এই জান্নাতকে একটি মুক্তা দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেনঃ

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ

(এ দু'টি বাগান ব্যতীত আরো দু'টি বাগান রয়েছে।)

ইমাম কেসায়ী (রঃ) من دونهما শব্দের তরজমা করেছেন এভাবে, "ঐ দু'টি বাগানের সম্মুখে দু'টি বাগান রয়েছে"।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, দু'টি বাগান স্বর্ণের আর দু'টি বাগান ইয়াকুত পাথরের। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বোল্লেখিত বাগানগুলোর চেয়ে পরে উল্লেখিত বাগান দু'টির মর্তবা কম নয়; কেননা স্বর্ণ নির্মিত বাগানগুলোর চেয়ে ইয়াকুত পাথরের তৈরী বাগানের মর্তবা কম হতে পারেনা।

مُدْهَامَّتٰنِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'গাঢ় সবুজ ঐ দু'টি বাগান। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

গাঢ় সবুজ হওয়ার কারণে বাগান দু'টির বর্ণ প্রায় কালো হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, পূর্বোল্লেখিত দু'টি বাগানেই বৃক্ষ এবং ফল অধিক পরিমাণে থাকবে, আর এ কারণেই পূর্বোল্লেখিত বাগানগুলোর মর্তবা পরে উল্লেখিত বাগানগুলো থেকে অধিকতর হবে।

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ

'ঐ দু'টি বাগানে রয়েছে দু'টি উচ্ছ্বসিত ঝর্ণা'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ ঐ ঝর্ণার পানি কখনও বন্ধ হয়না, সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে।[১]

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৮৯
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৪০
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দূ) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৬৫

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِاَيِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

তরজমা

(৬৭) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৬৮) ঐ দু' বাগানে রয়েছে নানা প্রকার ফল এবং খেজুর ও আনার।

(৬৯) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৭০) ঐ বাগান দু'টিতে সুশীলা, সুন্দরী রমণীগণ থাকবে।

(৭১) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৭২) তারা তাঁবুর মধ্যে অবস্থানকারী হুরগণ।

(৭৩) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৭৪) তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করেনি।

(৭৫) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৭৬) তারা সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট হবে।

(৭৭) অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(৭৮) কত বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহান এবং মহিমময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, জান্নাতে আরো দু'টি বাগান রয়েছে, তার বর্ণ হলো গাঢ় সবুজ, আর তাতে দু'টি উচ্ছ্বসিত ঝর্ণা রয়েছে যা সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, অতএব হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ

'ঐ দু' বাগানে রয়েছে নানা প্রকার ফল এবং খেজুর ও আনার'।

জান্নাতের ফলের বিবরণ

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, فاكهة শব্দটি এমন ফল সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, যা শুধু স্বাদ লাভের জন্যে খাওয়া হয়, আর খেজুর খাদ্য হিসেবে এবং আনার ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এজন্যে খেজুর এবং আনারের কথা আলাদাভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলেছেন, যদি কেউ শপথ করে বলে, আমি فاكهة খাব না, এরপর খেজুর বা আনার খেয়ে নেয় তবে তার শপথ বিনষ্ট হবেনা, অবশ্য অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম খেজুর এবং আনারকেও এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

فاكهة শব্দটি দ্বারা সাধারণতঃ সকল ফলকেই বোঝানো হয়, তবে খেজুর এবং আনার হলো বিশেষ প্রকার ফল, যেমন জীব্রাঈল (আঃ) এবং মিকাঈল (আঃ) নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা হিসেবে তাঁদের নাম উল্লেখিত হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) লিখেছেন, জান্নাতের খেজুর বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সবুজ বর্ণের জমররদ পাথরের, আর বৃক্ষগুলোর পাতা লাল বর্ণের হবে। দুধের চেয়ে ধবধবে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং মাখনের চেয়ে নরম হবে। খেজুরগুলোতে দানা থাকবেনা।

এবনে আবিদ্দুনিয়া লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতের একটি খেজুর লম্বা হবে বার হাত, আর তাতে কোন দানা থাকবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, জান্নাতের একটি আনারের পার্শ্বে অনেক লোক একত্রিত হবে এবং তা খাবে। যদি খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে তা সেখানে পাওয়া যাবে।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি জান্নাতে এত বড় আনার দেখেছি যেমন একটি উষ্ট্র তার উপর হাওদা স্থাপন করা হয়েছে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ

ঐ বাগান দু'টিতে সুশীলা সুন্দরী রমণীগণ থাকবে, অর্থাৎ হুরগণ থাকবে।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের দরবারে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ হুরগণ উন্নত স্বভাবের অধিকারী এবং সুন্দরী হবে (তেবরাণী)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) ইমাম আওজায়ী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুরগণ সুন্দরী হবে তবে অহংকারী হবেনা এবং কোন কষ্ট দেবেনা।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'তারা তাঁবুর মধ্যে অবস্থানকারী হুরগণ। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ইতিপূর্বে কোন জ্বীন ও মানুষ তাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

তেবরানী হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হুরদের দেহ জাফরান দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। বায়হাকীও এই হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এ মর্মের হাদীস সংকলিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) বর্ণনা করেন যে, যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক হুরদেরকে মাটি দ্বারা নয়; বরং কস্তুরী, কাফুর এবং জাফরান দ্বারা তৈরী করেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের ভেতর এতখানি জায়গা, যাতে তোমাদের তীর কামানের অর্ধেক রাখা যায় তা এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতের কোন হুর যদি একবার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে আসমান যমীনের মধ্যস্থল আলোকিত হয়ে যাবে এবং সমগ্র পৃথিবী সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তার মাথার ওড়না পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু থেকে উত্তম। (বোখারী শরীফ)

এবনে আবিদ্দুনিয়া কা'বে আহবারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যদি কোন হুর তার একটি হাত আসমান থেকে নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখে, তবে সারা পৃথিবী এমনিভাবে আলোকিত হবে যেমন সূর্য বিশ্ববাসীর জন্যে আলোর উৎস হয়ে থাকে।

مَّقْصُورٰتٌ فِى الْخِيَامِ

আল্লামা বগভী (রঃ) مقصورة শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো হুরগণ তাদের স্বামীদের প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, তাদের স্বামী ব্যতীত অন্যদের দিকে চোখ তুলেও তাকাবেনা।

বায়হাকী মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি مقصورة শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন যে, হুরগণ তাদের তাঁবুতে সংরক্ষিত থাকবে, সেখান থেকে কখনো সরে যাবেনা, আর এ তাঁবুগুলো নির্মিত হবে মুক্তা এবং রৌপ্য দ্বারা। বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি শবে মে'রাজে জান্নাতের একটি স্থানে পৌঁছি, তাকে "বেদাহ" বলা হয়, সেখানে মুক্তা, সবুজ বর্ণের জবরযদ পাথর এবং লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথর দ্বারা তাঁবু নির্মিত হয়ে আছে, ঐ তাঁবুগুলোর ভেতর থেকে হুরগণ বললো, আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি বললাম, হে জীব্রাঈল! এটি কার কথা, যাতে আমাকে সম্বোধন করা হয়েছে? জীব্রাঈল বললেন, এ তাঁবুগুলোর মধ্যে হুরগণ রয়েছে, তারা আল্লাহ পাকের দরবারে আপনাকে সালাম দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এর অনুমতি দান করেছেন। হুরগণ তখন বললোঃ আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবো, কখনও অসন্তুষ্ট হবোনা, আমরা এখানে সর্বদা থাকবো, কখনো এখান থেকে যাবনা। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আদুল্লাহ এবনে কায়েসের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি তাঁবু রয়েছে; যার প্রশস্ততা ষাট মাইল, যার এক প্রান্তের লোকেরা অন্য প্রান্তের লোকদেরকে দেখবেনা। ঐ বৃহদায়তন তাঁবুটি

মোমেনগণের ব্যবহারে থাকবে। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মের হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

এবনে আবিদ্দুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, মুক্তা নির্মিত এ তাঁবুটি প্রস্থে এক ফার্লং এবং তাতে স্বর্ণ নির্মিত দ্বার থাকবে। মুজাহেদ এবং এবনে আহওয়াস (রঃ)-এর সূত্রেও এমন বিবরণ রয়েছে।

এবনে আবি হাতেম এবং এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত এবনে মেসওয়ারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে একটি পছন্দনীয় স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। আর প্রত্যেক পছন্দনীয় স্থানে একটি তাঁবু থাকবে, প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দ্বার থাকবে, প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এমন একটি হাদীয়া প্রতিদিন প্রবেশ করবে, যা ইতিপূর্বে কখনো আসেনি (অর্থাৎ প্রতিদিন নতুন হুরগণ আসবে)। তারা অহংকারিনী হবেনা।[১]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

বায়হাকী বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিলাম, দুনিয়ার স্ত্রীলোকগণ উত্তম নাকি হুরগণ? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দুনিয়ার স্ত্রীলোকগণ হুরগণ থেকে এমনই উত্তম যেমন কোন পোষাকের উপরিভাগ উত্তম তার আস্তর থেকে। আমি আরজ করলাম, এর কারণ কি? তিনি এরশাদ করলেন, তাদের নামায রোযার কারণে, আল্লাহ পাক তাদের চেহারাকে নূরানী করে দেবেন, আর তাদেরকে রেশমের পোষাক পরাবেন এবং তাদের বর্ণকে গৌর করে দেবেন। তাদের পোষাক হবে সবুজ এবং তাদের অলংকার হবে হলুদ, তারা বলবে, আমরা এখানে সর্বদা থাকবো, কখনো আর আমাদের মৃত্যু আসবেনা। আমরা আরাম প্রাপ্ত, আমরা কখনও দুঃখী হবোনা, আমরা এখানকার স্থায়ী অধিবাসী, কখনো এখান থেকে যাবনা, আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবো, কখনও অসন্তুষ্ট হবোনা, আনন্দ সে সব লোকদের জন্যে, যাদের জন্যে আমরা রয়েছি, আর যারা আমাদের জন্যে রয়েছে।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরেকটি প্রশ্ন করেছেন। তিনি আরজ করেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি কোন স্ত্রীলোকের দু' তিন বা চার স্বামী হয়ে থাকে, এরপর তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং সে জান্নাতবাসী হয়, আর তার সমস্ত স্বামীরাও জান্নাতী হয়, এমন অবস্থায় সে কোন্ স্বামীর স্ত্রী হিসেবে থাকবে?

এ প্রশ্নের জবাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তাকে এ অধিকার দেয়া হবে, যাকে ইচ্ছা তাকে চিরস্থায়ী স্বামী রূপে বরণ

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৯৩-৯৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৪৩

করে নিতে। তখন সে স্বামীকেই সে বরণ করে নেবে দুনিয়াতে যার ব্যবহার ছিল মধুর।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, মধুর ব্যবহার, চরিত্র মাধুর্য, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের যাবতীয় কল্যাণের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।[১]

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'তারা সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট হবে। অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

জান্নাতবাসীগণ সবুজ তাকিয়ায় এবং অতি সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে বসবে।

আরবী ভাষার সুবিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ "কামুসে" رفرف শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে সবুজ কাপড়, যার দ্বারা বসবার আসন কুশন তৈরী করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, رفرفহলো এমন কাপড় যা দ্বারা মজলিসে উপবিষ্ট হওয়ার কুশন তৈরী করা হয়।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, রফরফ হলো সেই কাপড় যা মজলিসে বিছানার উপর ব্যবহৃত হয়।

عبقرى

অভিধাণ গ্রন্থ "কামুসে" লিপিবদ্ধ রয়েছে, "আবকর" এমন একটি স্থান ছিল যেখানে অধিক সংখ্যক জ্বীনেরা থাকত, আর সেখাকানর কাপড়ও অত্যন্ত সুন্দর হতো। প্রত্যেক পরিপূর্ণ বস্তুকে عبقرى বলা হয়।

প্রত্যেক সমাজের নেতা এবং যার থেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন কেউ না থাকে, তাকে عبقرى বলা হয়। আর এদিক থেকে প্রত্যেক বুজুর্গ, উত্তম, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে عبقرى বলা হয়।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

'কত বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহান এবং মহিমময়'।

ইতিপূর্বে এ সূরার শানে নুযুলে বর্ণিত হয়েছে, কাফেররা বলেছিল, "রহমান" কে? আমরা তা জানিনা, তাদের এ ঔদ্ধত্বপূর্ণ উক্তির জবাবেই সূরা আর রাহমান নাযিল হয়েছে এবং সূরার প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৪৩
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১২৬

পাকই মানুষকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন, অতএব, তাঁকে না জানা চরম মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর সূরার সর্বশেষ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছেঃ

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নাম কত বরকতময়, যাঁর অপার রহমত, অগণিত নেয়ামত মানুষ অহরহ ভোগ করে, যিনি মহান, যিনি মহিমময়, যাঁর মহিমা বর্ণনাতীত।

এ সূরা সম্পর্কে কিছু কথা

আলোচ্য সূরায় বিভিন্ন নেয়ামতের উল্লেখ করে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, অতএব, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? কোন জিনিসের খবর দেয়া এবং সে সম্পর্কে মানুষকে শুধু অবগত করানো একটি কাজ, এ উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়টি একবার উল্লেখ করাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে, কোন বিষয়ে মানব মনকে প্রস্তুত করা, প্রশিক্ষণ দেয়া যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এ বিষয়টি বারে বারে উল্লেখ করা একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। কোরআনে করীমের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আদেশ শুধু শুনিয়ে দেয়া যথেষ্ট নয়; বরং মানুষ মাত্রকে তা পালন করার জন্যে প্রস্তুত করা একান্ত জরুরী, তাই সূরা আর রাহমানে কোন একটি নেয়ামতের উল্লেখ করে মানুষ ও জ্বীন জাতিকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ এ নেয়ামত সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে মানুষ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করছে, এ সত্য যেন মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করে। আর বর্ণনা শৈলীর এ বৈশিষ্ট্য আরবী ভাষায় নতুন কিছু নয়; বরং বক্তব্যকে মানব-মনে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্যে অত্যন্ত কার্যকর একটি পন্থা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ওয়াকেয়াহ

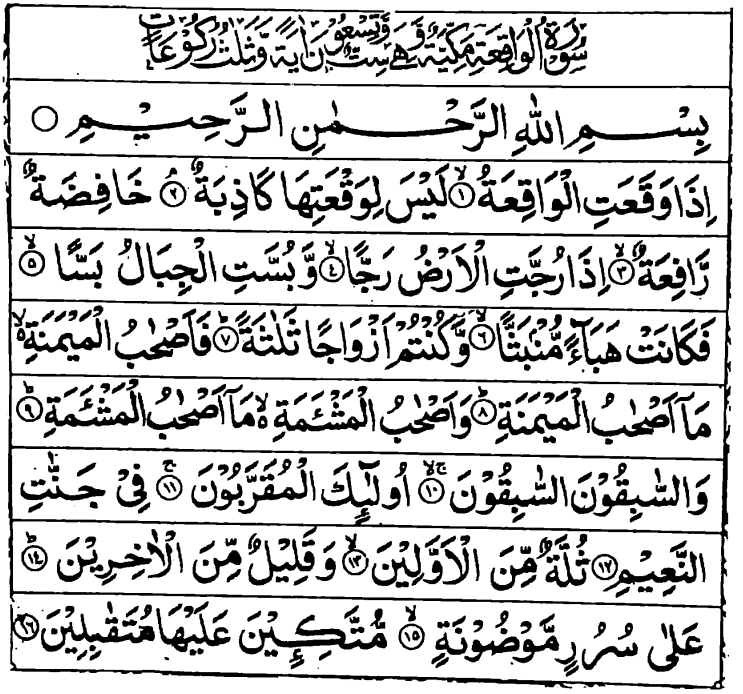
سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتٌّ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ
رَّافِعَةٌ ۝٣ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٤ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥
فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٦ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ
مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝٩
وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١ فِيْ جَنّٰتِ
النَّعِيْمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤
عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) যখন কেয়ামত ঘটবে,

(২) যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই।

(৩) যা কিছু লোককে করবে অবনত, আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত।

(৪) যখন পৃথিবী দারুণভাবে প্রকম্পিত হবে।

(৫) এবং পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে

(৬) এবং তা একেবারে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত হবে।

(৭) এবং তোমরা সকলে বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে।

(৮) ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা!

(৯) এবং বাম দিকের দল, কত ভাগ্যাহত বাম দিকের লোকেরা!

(১০) আর যারা অগ্রবর্তী, তারা তো অগ্রবর্তীই।

(১১) তারাই বিশেষভাবে নৈকট্য-ধন্য।

(১২) তারা নেয়ামতের উদ্যান সমূহে থাকবে।

(১৩) তাদের বহু সংখ্যক লোক পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে।

(১৪) আর অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

(১৫) তারা স্বর্ণখচিত আসন সমূহের উপরে থাকবে।

(১৬) তারা হেলান দিয়ে বসবে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে।

সূরা ওয়াকেয়াহ প্রসঙ্গেঃ

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। (বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), এবনে মরদবিয়া এবং আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।[১]

এ সূরার আয়াত সংখ্যা-৯৬, বাক্য-৮৭৮, আর অক্ষর সংখ্যা হলো ১,৯০৩টি।

নামকরণ

আল-ওয়াকেয়াহ কেয়ামতের নাম সমূহের মধ্যে অন্যতম, যেহেতু এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম শক্তি ও অপূর্ব মহিমার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।

এতে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন মানুষ মাত্রকে তার সমগ্র জীবনের কর্মকান্ডের পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

জীবনের ন্যায় মৃত্যুও সত্য, আর মৃত্যুর ন্যায় হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানও সত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতে কামেলার প্রতি প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে কেয়ামতের দিনের মহাবিচারের ঘটনার প্রতি বিশ্বাস করা আদৌ কঠিন নয়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় বেহেশতের সৌন্দর্য্য এবং প্রাচুর্য্যের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মনোমুগ্ধকর।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১২৮

এ সূরার ফজিলত

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সূরায়ে ওয়াকেয়াহ পাঠ কর এবং তোমাদের সন্তান সন্ততিকেও তা শেখাও, এটি হলো "সূরাতুল গেনা"।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে (এবনে আসাকের, দায়লামী)।

সূরা ওয়াকেয়ার আমল

(১) তফসীরে হাক্কানীতে আছেঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এটি প্রাচুর্যের সূরা। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে কখনও দারিদ্র ও অভাবে পতিত হবেনা।[১]

(২) যদি কেউ নিজের আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা এবং রিয্কের প্রাচুর্য কামনা করে তবে তাকে এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং পরবর্তী শুক্রবার রাত্রে মাগরিবের নামাযের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং এশার নামাযের পর ২১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। তারপর প্রতিদিন ফযরের নামাযের পর এবং মাগরিবের নামাযের পর ১ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে। এ আমলের বরকতে এর পাঠক শীঘ্রই প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

(৩) এ সূরা লিখে তাবিজ করে সঙ্গে রাখলে সকল প্রকার বালা মুছিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং প্রচুর রিয্ক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৪) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আসন্ন সন্তান প্রসবা নারীর সঙ্গে এ সূরা বেধে দিলে অতি সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

হাফেজ এবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর আলোচনায় আমর এবনে রবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) যখন অসুস্থ হলেন (আর এ রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়), তখন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কি কষ্ট? তিনি বললেন, আমার গুনাহ (অর্থাৎ গুনাহর চিন্তাই কষ্টের কারণ)।

হযরত ওসমান (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, শুধু আমার প্রতিপালকের রহমতের।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১২৮
তফসীরে আদ্দুররুল মনসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭০

হযরত ওসমান (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, আপনার জন্যে কোন চিকিৎসকের ব্যবস্থা করবো কি?

তিনি জবাব দিলেন, চিকিৎসক নিজেই তো আমাকে অসুস্থ করেছেন (অর্থাৎ যাঁর হাতে রয়েছে স্বাস্থ্য-সুখ, যাঁর হুকুমে হয় জীবন ও মৃত্যু, তাঁরই হুকুমে আমি অসুস্থ হয়েছি)।

হযরত ওসমান (রাঃ) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনার জন্যে কিছু অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থা করবো? তিনি জবাব দিলেন, এর আমার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, আপনার পরে অর্থ-সম্পদ আপনার কন্যাগণের কাজে লাগবে।

তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আপনি কি আমার কন্যাদের অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করেন, অথচ আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, তারা যেন প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়াহ তেলাওয়াত করে। আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়াহ তেলাওয়াত করে, সে কখনো অভাবগ্রস্ত হবেনা।[১]

যদি কোন ব্যক্তি একই মজলিশে ৪১ বার সূরা ওয়াকেয়াহ পাঠ করে, তবে তার আর্থিক প্রয়োজনের আয়োজন হবে।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ওয়াকেয়াহ পাঠ করছে তবে তার রিয্ক বৃদ্ধি করা হবে এবং আসমানি যমিনী বালা-মসিবত থেকে তার হেফাজত করা হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

সূরা আর রাহমানের শুরুতে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা রয়েছে, এরপর এ ক্ষণস্থায়ী জগতের উল্লেখ করে কেয়ামত কায়েম হওয়ার মাধ্যমে এ জগতের ধ্বংসের ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার প্রারম্ভেই কেয়ামত কায়েম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা আর রাহমানে আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এ সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আর রাহমানে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১০২

হয়েছে। আর এ সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহতার উল্লেখ করে সে কঠিন দিনের জন্যে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে। এ সূরায় একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামত এমনি এক মহা সত্য যাকে অস্বীকার করা যায়না, যাকে মিথ্যাজ্ঞান করা যায়না, যাকে প্রতিরোধ করা যায়না। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন একদল লোক সম্মানিত হবে, আরেক দল লোক অপমানিত হবে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে চিরশান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবেনা এবং তাঁর বিধান অমান্য করে, তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর, এরশাদ হয়েছেঃ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

যখন কেয়ামত ঘটবে, যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই, যা কিছু লোককে করবে অবনত আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত।

সূরা আর রাহমানের সর্বশেষ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

(কত বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহান এবং মহিমময়।)

আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, কখন প্রকাশিত হবে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে

যখন কেয়ামত ঘটবে, যা অবশ্যই ঘটবে, তখন আল্লাহ পাকের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে।

অথবা বলা যায়, সূরা আর রাহমানে আল্লাহ পাক জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন। যারা হয় ঈমানদার ও নেককার, যারা সত্য-সাধনায় থাকে মশগুল, তাদের মনের গহনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, সূরা আর রাহমানে বর্ণিত এ নেয়ামত সমূহ কখন পাওয়া যাবে? তারই জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

"যখন কেয়ামত ঘটবে",

যেহেতু কেয়ামত অবশ্যই ঘটবে, তাই তাকে "ওয়াকেয়াহ" বলা হয়েছে।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ

"যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই", অর্থাৎ কেয়ামত সম্পর্কীয় এ ঘোষণা সত্য নয়, একথা কেউ বলতে পারবেনা।

অথবা কেয়ামত কায়েম হওয়ার কারণে আর কেউ মিথ্যাবাদী থাকবেনা।

অথবা যে ব্যক্তি কেয়ামতের ব্যাপারে খবর দেবে, সে সঠিক খবরই দেবে।

অথবা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়াবহ অবস্থা সহ্য করার সাহস কারোই হবেনা।

অথবা কেয়ামত হওয়ার কথা মহা সত্য, এর মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্রও নেই। তফসীরকার জুযাজ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কেয়ামতের ঘটনা হবে অপ্রতিরোধ্য, আর এ ব্যাখ্যাই করেছেন হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ)।[১]

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

'যা কিছু লোককে করবে অবনত, আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত'।

যারা দুনিয়ার মায়ায় মোহে মুগ্ধ থাকে, সর্বদা অর্থ-সম্পদের লোভে-লাভে-সংগ্রহে মত্ত থাকে, এ জীবনকেই সব কিছু মনে করে এবং আখেরাতকে ভুলে থাকে, আল্লাহ পাককে মানেনা, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করেনা, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, কেয়ামতের দিন তারা হবে অবনত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, কোপগ্রস্ত এবং দোযখে নিক্ষিপ্ত। আল্লাহর দুশমনদেরকে অপমানিত করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়ার জীবনে ঈমানদার ও নেককার হবে, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং জীবনকে জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় অতিবাহিত করবে, কেয়ামতের দিন তাদের মর্যাদা উন্নীত হবে, জান্নাতে উচ্চাসনে তারা আসীন হবে।

নিরীহ, নিরহংকার, মুত্তাকী, পরহেযগার মোমেনগণ সেদিন লাভ করবে উচ্চাসন।

দুনিয়াতে যারা বিনয়ী ছিল, বিনীত হয়ে জীবন যাপন করেছে, তারাই সেদিন পাবে উচ্চ মর্তবা।

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۞ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا

অর্থাৎ যখন পৃথিবী দারুণভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং তা একেবারে বাতাসে উৎক্ষিপ্ত ধূলি-কণার ন্যায় হয়ে যাবে, পাহাড় পর্বত সেদিন ধূলিস্যাত হয়ে যাবে, আকাশচুম্বি ইমারতগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সারা পৃথিবী দারুণ কম্পনে প্রকম্পিত হবে।

وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৪৬
তফসীরে হক্কানী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৭

'এবং তোমরা সকলে বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে'।

মানব জাতি তিনভাগে বিভক্ত হবে

ঈমান ও আমলের নিরীখে দুনিয়ার মানুষ তখন তিনভাগে বিভক্ত হবে। একদল আল্লাহ পাকের আরশের ডান দিকে থাকবে। সৃষ্টির প্রথম দিন যারা হযরত আদম (আঃ)-এর ডান পাঁজর থেকে বের হয়েছিল, যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা হবে জান্নাতবাসী, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ

ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা! কেননা তারা চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাতের অধিবাসী হবে।

وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ

'এবং বাম দিকের দল, কত ভাগ্যাহত বাম দিকের লোকেরা! আর যারা অগ্রবর্তী, তারা তো অগ্রবর্তীই। তারাই বিশেষভাবে নৈকট্য-ধন্য, তারা নেয়ামতের উদ্যান সমূহে থাকবে'।

ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে, প্রথম ভাগ যারা আরশের ডান দিকে থাকবে, তাদের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে তাদের কথা এরশাদ হয়েছে, যারা আরশের বাম দিকে থাকবে, যাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা কত ভাগ্যাহত, কেননা তারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেনি, জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করেছে, তাদের অপকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে (আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

অগ্রবর্তী কারা

আর তৃতীয় দল হলো তারা, যারা অগ্রবর্তী, তারা তো অগ্রবর্তীই। তাঁরা বিশেষভাবে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবে এবং তারা নেয়ামতের উদ্যান সমূহে অবস্থান করবে। তাঁরাই জান্নাতবাসীদের নেতৃত্ব পাবেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারীগণ এবং আরো রয়েছেন সিদ্দীকগণ, শহীদগণ।

রবী এবং হাসান (রঃ) বলেছেন, اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলেন সে সব লোক, যাদের জীবন আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়েছে। আর اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ হলো

সে সব লোক, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করেছে, তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। আর যারা সাবেকুন বা অগ্রবর্তী তারা ইসলাম গ্রহণে, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনে অগ্রবর্তী। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম রয়েছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারীগণ, যাঁরা সরাসরি তাঁদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইসলামের সূচনা-লগ্নে যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় মুসলমানগণ অত্যন্ত নিপীড়িত ও উৎপীড়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন যারা সত্য ও ন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন, অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন এমনকি ভিটা-মাটি ফেলে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করেছেন তাঁরাই আখেরাতে "সাবেকুন" এর তথা অগ্রবর্তী লোকদের মর্তবা লাভ করবেন।

একরামা (রঃ) বলেছেন, সাবেকুন আউয়্যালুন তারা, যারা ইসলাম গ্রহণে সবার আগে এগিয়ে এসেছেন।

এবনে সিরীন (রঃ) বলেছেন, সাবেকুন আউয়্যালুন হলেন তারা, যারা মুহাজের এবং আনসার, যারা উভয় কেবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন।

রবী এবনে আনাস (রঃ) বলেছেন, যাঁরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী ছিলেন, তারাই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

এ পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দিকে যারা অগ্রগামী হয়, সাবেকুন দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এসব কথা একত্রিত করলে যা প্রমাণিত হয় তা হলো সাহাবায়ে কেরামই হলেন সাবেকুন আউয়্যালুন। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের সকলের পূর্বে আমি ইসলামের দিকে অগ্রসর হয়েছি, যখন আমি কিশোর ছিলাম, যৌবনে পদার্পণও করিনি।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নবুওয়্যতের গুণাবলীর মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান ছিলেন। তাবেয়ীনদের মধ্যে অনেকে এবং তাবে তাবেয়ীনদের মধ্যে কিছু লোক এ মর্যাদা লাভ করেছেন, এরপর এক হাজার বছর যাবত নবুওয়্যতের নূর কমতে থাকে, বেলায়েতের গুণাবলী প্রকাশিত হতে থাকে, বেলায়েতের নূর আউলিয়ায়ে কেরামের কেরামতের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে, এর এক হাজার বছর পর কোন কোন লোককে আল্লাহ পাক নবুওয়্যতের গুণাবলীর অংশ বিশেষ দান করেছেন, তাঁরা নবীর সঠিক অনুসারী হয়েছেন এজন্যে

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায়, একথা জানা যায় না যে বৃষ্টির প্রথমাংশ অধিকতর উপকারী, না শেষাংশ।

এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এবং সংকলিত হয়েছে তিরমিযী শরীফে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের উত্তম অংশ হলো এর প্রথম ও শেষ অংশ।

বস্তুতঃ সাবেকুন তারাই যারা জান্নাতে সবার আগে প্রবেশ করবে, আর তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

'তারাই হবে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য। তারা নেয়ামতের উদ্যান সমূহে থাকবে। তাদের বহু সংখ্যক লোক পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে, আর অল্প সংখ্যক লোক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো আলোচ্য আয়াতে এ সুসংবাদ রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনদের উদ্দেশ্যে, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, এতে যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম তাঁরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এরপর সে সব লোক, যারা আমার যুগের নিকটবর্তী অর্থাৎ তাবেয়ীন, এরপর সে সব লোক, যারা তাদের যুগের নিকটবর্তী অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীন। এরপর এমন লোক আসবে, যারা সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন না থাকলেও সাক্ষ্য দেবে, খেয়ানত করবে, আমানতদার হবেনা, মানত মানবে কিন্তু মানত পূর্ণ করবে না।

এই হাদীস হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বলোনা, যদি তোমাদের কেউ ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করে তবে আমার কোন সাহাবীর এক সের বা আধা সের খেজুরের (খেজুর বা খাদ্যদ্রব্য) সমান হবেনা।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

(তাদের বহু সংখ্যক পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে) এর দ্বারা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত উম্মত এসেছে, সকলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

(আর অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে) এর দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ এবং তেবরানী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, আমি স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি এরশাদ করেছেন, আমি আশা করি যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে আমার অনুসারী এক চতুর্থাংশ হবে। একথা শ্রবণ করে আমরা উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহু আকবার বলি। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে আমার উম্মত এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় তাকবীর বলি। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি আশা করি, সকল জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে আমার উম্মত।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা কি পছন্দ করবে যে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হও? আমরা আরজ করলাম জ্বী হ্যাঁ। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, সমস্ত জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরা হবে অর্ধেক।

হযরত বোরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন তিরমিযী, হাকেম এবং বায়হাকী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি কাতার হবে, তন্মধ্যে আশিটি হবে তোমাদের অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্য উম্মতীদের।

তেবরানী হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ

'তারা স্বর্ণখচিত আসন সমূহের উপর থাকবে, তারা হেলান দিয়ে বসবে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে'।

অর্থাৎ যারা অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন, তারা জান্নাতের মধ্যে স্বর্ণখচিত আসনে, একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে বসবেন।

مُتَقٰبِلِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, একে অন্যের সামনা সামনি মুখ করে তাঁরা বসবেন, কাউকে পেছন দিয়ে তারা বসবেন না।

আল্লামা বগভী (রাঃ) مُتَقٰبِلِيْنَ শব্দটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাক এ শব্দটি দ্বারা জান্নাতবাসীগণের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বন্ধুত্ব এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি ভালবাসার একটি নমুনা পেশ করেছেন।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ
مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا
يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ
اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا
لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ
الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّ
مَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّ
فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ
الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(১৭) তাদের কাছে চির কিশোর বালকেরা তাদের খেদমতের জন্যে ঘুরে বেড়াবে।

(১৮) পান পাত্র ও প্রস্রবণ মিশ্রিত সুরা পূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।

(১৯) সেই সুরা পানে তাদের মাথা ব্যথা হবেনা এবং নেশাও হবেনা।

(২০) এবং ফলের মধ্যে যা তারা পছন্দ করে,

(২১) এবং তাদের মনের মত গোশ্‌ত নিয়ে।

(২২) আর তাদের জন্যে থাকবে ডাগর চোখা গৌর বর্ণের হুরগণ।

(২৩) যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।

(২৪) তাদের আমলেরই প্রতিদানে।

(২৫) তারা সেখানে বাজে কথা বা পাপের কথা শুনবেনা।

(২৬) তারা শুনবে শুধুমাত্র শান্তি, শান্তি।

(২৭) আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

(২৮) তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে রয়েছে কাঁটা বিহীন কুল বৃক্ষ।

(২৯) এবং সারিবদ্ধ কলাগাছ থাকবে।

(৩০) দীর্ঘায়তন ছায়া।

(৩১) প্রবাহিত ঝর্ণাধারা।

(৩২) অফুরন্ত ফল।

(৩৩) যা কখনও শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা।

(৩৪) এবং তারা থাকবে উঁচু বিছানা সমূহে।

(৩৫) নিশ্চয় আমি সে সমস্ত রমণীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে।

(৩৬) এরপর আমি তাদেরকে কুমারী করে রেখেছি।

(৩৭) লাস্যময়ী সমবয়স্কা।

(৩৮) আর তারা ডান দিকের লোকদের জন্যেই রয়েছে।

(৩৯) তাদের একটি বিরাট দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য থেকে হবে।

(৪০) আর পরবর্তীদেরও একটি দল থাকবে।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াত সমূহে বেহেশতবাসীগণের জন্যে সুরক্ষিত কিছু নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

'তাদের কাছে চির কিশোর বালকেরা তাদের খেদমতের জন্যে ঘুরে বেড়াবে'।

জান্নাতবাসীদের খাদেম

আলোচ্য আয়াতের مُخَلَّدُوْنَ শব্দটির ব্যাখ্যা হল, বেহেশতবাসীদের খাদেমদের এই অবস্থা হবে যে কখনও তারা বৃদ্ধ হবেনা, সর্বদা তারা কিশোর থাকবে, আর তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তনও আসবেনা।

এবনে কায়ছান বলেছেন, তারা সর্বদা কিশোর থাকবে, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবেনা।

সায়ীদ এবনে যুবায়ের (রঃ) বলেছেন, مُخَلَّدُوْنَ হলো সে সব কিশোর, যাদের কানে বালি পরানো হবে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এই কিশোর খাদেমগণ মানুষেরই সন্তান হবে, শৈশব ও কৈশোরে তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা কোন সওয়াবের কাজ করেনি যে জান্নাত পাবে, আর কোন গুনাহও করেনি যে আযাব হবে, বরং তাদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে।

এবনে মোবারক (রঃ), হান্নাদ (রঃ) ও বায়হাকী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সবচেয়ে কম মর্তবার জান্নাতীর একটি কাজের জন্যে এক হাজার খাদেম দৌড়ে আসবে।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সকল বেহেশতীদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্তবার বেহেশতীর খেদমতের জন্যে দশ হাজার খাদেম থাকবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে যার মর্তবা সবচেয়ে কম, তার নিকট সকাল-সন্ধ্যা পাঁচ হাজার খাদেম আসা যাওয়া করবে। আর প্রত্যেক খাদেমের নিকট রকমারি খাদ্য-দ্রব্য ও ফল ফলারী থাকবে।

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ

'চির কিশোর খাদেমগণ পান-পাত্র ও প্রস্রবন মিশ্রিত সুরা পূর্ণ পেয়ালা নিয়ে হাযির হবে, সেই সুরা পানে তাদের মাথা ব্যথা হবেনা এবং নেশাও হবেনা'।

দুনিয়ার সুরা পানে মাথা ব্যথা হয়, নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে মানুষ মাতাল হয়ে যায় কিন্তু জান্নাতে যে সুরার ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে মাথা ব্যথাও হবেনা এবং কোন প্রকার উন্মাদনাও আসবেনা।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

এবং ফলের মধ্যে যা তারা পছন্দ করে এবং তাদের মনের মত গোশ্ত নিয়ে বেহেশতের চির কিশোরগণ হাযির হবে'।

অর্থাৎ নানা প্রকার ফল মূল সর্বদা তাদের নিকট হাযির করা হবে, এমনিভাবে পরিচারকরা পাখির গোশ্ত পেশ করবে।

জান্নাতের খাবার

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখনই কোন জান্নাতী ব্যক্তি কোন প্রকার পাখির কথা মনে করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাখিটি তার সম্মুখে উপস্থিত হবে।

এবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের মধ্যে তোমরা যে পাখিকে দেখে তা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা ভুনা হয়ে তোমাদের সম্মুখে হাযির হবে।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জান্নাতের মধ্যে কোন জান্নাতী ব্যক্তি যখন কোন প্রকার পাখির গোশ্ত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাখিটি যা বখতী নামক উষ্ট্রের ন্যায় হবে, জান্নাতবাসীদের দস্তরখানে এসে পড়বে। অবস্থা এই হবে যে, কোন প্রকার অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না, এমনকি কোন প্রকার ধোঁয়াও তার কাছে যাবেনা। জান্নাতীগণ সেই পাখির গোশ্ত পেট ভরে খাবে, এরপর তা উড়ে চলে যাবে।

বায়হাকী হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের মধ্যে পাখিগুলো বখতী নামক উষ্ট্রের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট হবে, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) আরজ করলেন, তাহলে তো ঐ পাখিগুলো অত্যন্ত আনন্দে থাকবে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হ্যাঁ তাদের চেয়ে অধিকতর আনন্দে থাকবে সে সব লোক, যারা ঐ পাখিগুলোর (গোশ্ত) খাবে। আর হে আবু বকর! আপনিও ঐ গোশ্ত ভক্ষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।

আহমদ, তিরমিযী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে কিছু পাখি বখতী নামক উষ্ট্রীর ন্যায় হবে এবং সেই পাখী জান্নাতীদের নিকট নিজেই চলে আসবে। জান্নাতবাসীগণ স্বীয় ইচ্ছা মাফিক ঐ পাখির গোশ্ত খেয়ে নেবে। এরপর পাখিটি উড়ে যাবে, মনে হবে যে, তার দেহের কোন অংশ কমেনি।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন পাখি থাকবে যা সত্তর হাজার ডানা বিশিষ্ট হবে, সে নিজেই জান্নাতীদের খাবার পাত্রে এসে পড়বে, এরপর সে তার বাহু নড়াচাড়া করবে, প্রত্যেক ডানা থেকে একটি রং

বের হবে, যা বরফ থেকে সাদা হবে, মাখন থেকে নরম, মধু থেকে মিষ্ট হবে। এরপর সে পাখিটি উড়ে চলে যাবে।[১]

মুগীস এবনে সামহী বর্ণনা করেন, জান্নাতে "তুবা" নামক একটি বৃক্ষ রয়েছে, জান্নাতে এমন কোন ইমারত নেই যার উপর এ বৃক্ষের ছায়া পড়েনা। ঐ বৃক্ষে রকমারী ফল রয়েছে। বখতী নামক উষ্ট্রের ন্যায় পাখিগুলো ঐ বৃক্ষের উপর অবতরণ করে। জান্নাতবাসীগণ যখন ঐ পাখিটির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে তখন তাকে তারা ডাকবে এবং পাখিটি সঙ্গে সঙ্গে দস্তরখানে এসে পড়বে। জান্নাতবাসীগণ একদিক থেকে তার ভুনা গোশত খাবে, আর অন্যদিক থেকে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে। এরপর তা উড়ে চলে যাবে।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۞ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۞ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'আর তাদের জন্যে থাকবে ডাগর চোখা গৌর বর্ণের হুরগণ, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা, এসব তাদের আমলেরই প্রতিদানে'।

হুরদের বিবরণ

বায়হাকী বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেছেন, আমি আরজ করেছি, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাকে حُوْرٌعِيْنٌ এর অর্থ বলে দিন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, গৌর বর্ণা ডাগর আঁখি বিশিষ্ট হুরগণ, বেহেশতবাসীদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে থাকবে। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করেছি,

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যেভাবে ঝিনুকের মধ্যে মণি মুক্তা সযত্নে সুরক্ষিত থাকে, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকে এবং কোন প্রাণীর স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকে, ঠিক তেমনি হুরগণ পরিচ্ছন্নতায় মণি-মুক্তার ন্যায় হবে এবং কোন প্রাণীর স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একটি নূর চমকাবে, তখন লোকেরা বলবে কোন হুর তার স্বামীর সাথে হেসেছে, এটি তার অতি পরিচ্ছন্ন দাঁতের চমক।[২]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۞ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৩
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৫৪
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৫৪

"তারা সেখানে বাজে কথা বা পাপের কথা শুনবেনা, তারা শুনবে শুধুমাত্র শান্তি, শান্তি"।

বেহেশতের পরিবেশ

বেহেশতের পরিবেশ হবে অত্যন্ত মনোরম ও শান্ত, সেখানে কোন চিৎকার হাহাকার গোলমাল নেই, সেখানে কোন গুনাহর কাজ নেই, কোন গুনাহর কথাও নেই, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সম্ভাষণে "সালাম" শব্দটিই ব্যবহৃত হবে।

যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا

"বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে বাজে কথা শুনবেনা এবং মিথ্যা কথাও শুনবেনা"।

এমনিভাবে সূরা মোমেনুনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

অর্থাৎ "(সফলকাম হবে তাদের জীবন) যারা বাজে ও অহেতুক কথা থেকে বিরত থাকে"।

سَلٰمًا

অর্থাৎ জান্নাতে পরস্পরের অভিবাদনে ব্যবহৃত "সালাম" শব্দটি শ্রুত হবে।

যারা বেহেশতে সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে জান্নাতে সর্বপ্রথম সে মোহাজেরগণ প্রবেশ করবে যারা ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে হিযরত করেছে, নিঃস্ব-হৃত-সর্বস্ব হয়েছে, যাদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাজত হয় এবং মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করা হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের মনে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়, সে আশা আকাঙ্ক্ষা দুনিয়াতে পূরণ হয়না। আল্লাহ পাক তাঁর ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হুকুম দেবেন, এ মোহাজেরদের নিকট যাও, তাদেরকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ বিনীতভাবে আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা আসমানের অধিবাসী এবং তোমার সৃষ্টির মধ্যে উত্তম, এতদসত্ত্বেও তাদের নিকট যাওয়ার এবং তাদেরকে সালাম জানানোর আদেশ দিয়েছো (অর্থাৎ তারা কত উচ্চ মর্তবার অধিকারী)! আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তারা আমার বন্দা ছিল, শুধু আমারই এবাদত করতো, আমার এবাদতে কাউকে শরীক করতোনা, তাদের দ্বারা মুসলমানদের সীমান্তের হেফাজত হতো এবং মন্দ

কাজ প্রতিরোধ করা হতো, তাদের প্রয়োজনের কথা তারা অপূর্ণ অবস্থায় মনেই রেখে দিত এবং মৃত্যুবরণ করতো। তখন আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক ফেরেশতাগণ মোহাজেরদের নিকট যাবে। বেহেশতের প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে তারা প্রবেশ করবে এবং মোহাজেরদেরকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা সবর অবলম্বন করেছ, তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল কত উত্তম!

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ۝ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ۝ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ۝ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ۝ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ۝ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ۝ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ۝ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ

'আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে রয়েছে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষ। এবং রয়েছে সারিবদ্ধ কলা গাছ, দীর্ঘায়তন ছায়া, প্রবাহিত ঝর্ণাধারা। অফুরন্ত ফল, যা কখনো শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা এবং তারা থাকবে উঁচু বিছানা সমূহে'।

শানে নুযুল

সায়ীদ এবনে মানসুর "সুনানে" এবং বায়হাকী "আল বা'ছে" আতা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তায়েফবাসীদের দরখাস্ত অনুযায়ী যখন তায়েফে উৎপন্ন মধু সে এলাকার জন্যে সংরক্ষণ করা হয়, তায়েফের বাইরের জন্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন কিছু লোক বললো জান্নাতে তো অনেক নেয়ামত থাকবে, যদি জান্নাতে মধুর এমন প্রচুর ব্যবস্থা থাকতো, তবে কত ভাল হতো! তখন এ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

যারা اصحٰب اليمين বা ডান দিকের দলে থাকবে তাদের জন্যে জান্নাতে যে সব নেয়ামত রয়েছে, তার কিছু বিবরণ আলোচ্য আয়াত সমূহে স্থান পেয়েছে। জান্নাতে রয়েছে কাঁটা বিহীন কুল বৃক্ষ, আর এ কুল হবে অত্যন্ত সুস্বাদু, এ বৃক্ষের ছায়া হবে সুদীর্ঘ।

দ্বিতীয়তঃ সেখানে শীতও নেই, গ্রীস্মও নেই। অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে সময়টি যেমন মধুর হয়, ঠিক তেমনি পরিবেশ জান্নাতে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। জান্নাতের ছায়া এত সুদীর্ঘ হবে যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়া যদি একশত বছরও দৌড়াতে থাকে তবু তা অতিক্রম করতে পারবেনা।

এতদ্ব্যতীত, জান্নাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফল মূল, উঁচু বিছানা, এক কথায় অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে ঈমানদার ও নেককারদের সমগ্র জীবনের সাধনার পুরষ্কার স্বরূপ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ সমস্ত পুরস্কার হলো اصحٰب الیمین। বা ডান দিকে অবস্থানকারী মোমেনদের জন্যে আর ডান দিকে অবস্থানকারী মোমেনগণ হবে সে মোত্তাকী পরহেযগারগণ যাদের অন্তর থাকবে আলোকময়, যারা সারা জীবন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের সাধনায় রত থাকবে। এরপর আখেরাতে গুনাহগার ঈমানদারদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সুপারিশক্রমে মাফ করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে।

বায়হাকী হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন গ্রামীন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এমন বৃক্ষের আলোচনা করেছেন, যার কাঁটার কারণে মানুষের কষ্ট হয়, তিনি এরশাদ করলেন, সে কোন্ বৃক্ষ? ঐ ব্যক্তি বললো, কুল বৃক্ষ, তাতে কাঁটা থাকে। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক فِیْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ বলেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাক কুল বৃক্ষের কাঁটাগুলো ভেঙ্গে দেবেন এবং প্রত্যেকটি কাঁটার স্থলে একটি ফল সৃষ্টি করবেন, আর প্রত্যেক ফল ফেটে গেলে তা থেকে বাহাত্তরটি বর্ণের খাদ্য-দ্রব্য বের হয়ে আসবে, একটি বর্ণ আরেকটি বর্ণের ন্যায় হবেনা।

وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ

অভিধাণ গ্রন্থ "কামুসে" রয়েছে, طلح হলো বড় বৃক্ষ, আর منضود হলো একের পর এক ফলে পরিপূর্ণ।

আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ), হান্নাদ (রঃ) এবং বায়হাকী (রঃ) লিখেছেন যে, তফসীরকার মাসরুক (রঃ) বলেছেন, জান্নাতে যে খুরমা বৃক্ষ রয়েছে তা ফলে পরিপূর্ণ থাকবে, আর যখন একটি ফল ছেড়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থলে আরেকটি ফল সৃষ্টি হবে।

কা'বে আহবার বলেছেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ বা চার বছর বয়স্ক কোন উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে জান্নাতের এ কুল বৃক্ষের পার্শ্বে চলতে থাকে, তবে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তার এ সফর শেষ হবেনা। আল্লাহ পাক তাঁর দস্তে মোবারকে বৃক্ষটি রোপন করেছেন। তার শাখা-প্রশাখাগুলো জান্নাতের বাইরেও ছড়িয়ে আছে। জান্নাতের মধ্যে যে সমুদ্র রয়েছে, তা এ বৃক্ষটির ভিত্তিমূল থেকেই প্রবাহিত হয়েছে।

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ

যা কখনো শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা, অর্থাৎ জান্নাতের ফল কখনও শেষ হবেনা এবং কখনও নিষিদ্ধও হবেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কোন বৃক্ষ থেকে ফল ছিড়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্থলে অন্য ফল সৃষ্টি করা হবে, তাই ফল কখনো শেষ হবেনা। আর যে ফল ছিড়তে চায় তাকে বাধা দেয়া হবেনা।

এই হাদীসের মর্মের সমর্থনে হযরত সওবান (রাঃ) বর্ণিত হাদীস রয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন জান্নাতী ব্যক্তি যখনই বৃক্ষ থেকে জান্নাতী ফল ছিড়বে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক অন্য একটি ফল সৃষ্টি করে দেবেন। (তেবরানী)

وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ

'এবং তারা থাকবে উঁচু বিছানা সমূহে'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীদের বিছানা হবে সুউচ্চ।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যদি সর্বোচ্চ স্থানের বিছানা সর্বনিম্নের বিছানার উপর ফেলা হয়, তবে চল্লিশ বছরেও তা পৌঁছতে পারবেনা।

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۙ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ

'নিশ্চয় আমি সে সব রমণীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে। লাস্যময়ী সমবয়স্কা, আর তারা ডান দিকের লোকদের জন্যেই রয়েছে'।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতে যে রমণীগণের কথা বলা হয়েছে তারা হলেন দুনিয়ার সেই বৃদ্ধা নারীগণ, যাদের কিছু চুল সাদা হয়েছে এবং কিছু কালো ছিল, তাদেরকে জান্নাতে কুমারী করে হাযির করা হবে।

এবনে জরীর এবং বায়হাকী হযরত মুসলেমা এবনে এজিদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ এর দ্বারা দুনিয়ার সে সব স্ত্রীলোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধা ছিল এবং কুমারীও ছিল।

বায়হাকী এবং এবনুল মুনজের অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "কোন বৃদ্ধা মহিলা

বেহেশতে প্রবেশ করবেনা", একথা শ্রবণ করে এক বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সেদিন সে বৃদ্ধা থাকবেনা, বরং যৌবন লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তশরিফ আনেন, তখন আমার নিকট একজন বৃদ্ধা বসেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? আমি আরজ করলাম, ইনি আমার একজন খালা। তখন তিনি এরশাদ করলেন, জেনে রাখ, কোন বৃদ্ধা বেহেশতে যাবেনা।

বৃদ্ধা একথা শুনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরআনে করীমের এ আয়াত إِنَّا أَنْشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ তেলাওয়াত করলেন।

তেবরানী অন্য সূত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বৃদ্ধা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেখমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাত নসীব করেন। তিনি এরশাদ করলেন, জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। তখন আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলামঃ আপনার কথায় সে কষ্ট পেয়েছে, তিনি এরশাদ করলেন, ইনশাআল্লাহ কথা এটিই হবে, যখন আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করবেন তখন তাকে কুমারী করেই প্রবেশ করাবেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা হুরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, দুনিয়ার স্ত্রীলোকদেরকে নয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে কুমারী করেই সৃষ্টি করেছেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কি পুরুষ কি নারী, তারা তেত্রিশ বছর বয়সের হবে। সকলেই আদম (আঃ)-এর অবয়বের সমান হবে। হযরত আদম (আঃ) দৈর্ঘে ছিলেন ষাট হাত, আর প্রস্থে ছিলেন সাত হাত।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে কেউ অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করুক, অথবা বৃদ্ধ অবস্থায়, তাকে তেত্রিশ বছর বয়স্ক অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এর অধিক হবেনা। দোযখীদের অবস্থাও তাই হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দৈর্ঘে ষাট হাত হবে এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য তাকে দান করা হবে এবং হযরত ঈসা

(আঃ)-এর বয়সের সমান তথা তেত্রিশ বছর বয়স্ক হবে। আর তার ভাষা হবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভাষা অর্থাৎ আরবী। নগ্ন দেহ, দাড়ি গোফ ব্যতীত অবস্থায় থাকবে।

আলোচ্য আয়াত সমূহে যাদের কথা বলা হলো, তারা সব ডান দিকের লোকদের জন্যেই থাকবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ

'তাদের এক বিরাট দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য থেকে আর পরবর্তীদেরও একটি দল থাকবে'।

অর্থাৎ এ উম্মতের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য থেকে ডান দিকে এক বিরাট দল এবং পরবর্তীদেরও একটি দল থাকবে। আবুল আলীয়া, মুজাহেদ, আতা এবনে আবি রুবাহ এবং যাহ্যাক (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) সায়ীদ এবনে জোবায়েরের (রঃ) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় দলই আমার উম্মত থেকে হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত মাবিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে যারা আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা তাদের সাহায্য করবেনা এবং যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের হুকুম এসে পড়বে অর্থাৎ কেয়ামত কায়েম হবে।

উম্মতে মোহাম্মদিয়ার বিশেষ মর্যাদা

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন যেভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল হিসেবে সবোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তাঁকে নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য (সিরাজাম মুনীরা) বলে ঘোষণা করেছেন এবং আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বেও তিনি নবী ছিলেন বলে তিনি নিজেও ঘোষণা করেছেন, ঠিক তেমনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতকেও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং সর্বোত্তম উম্মত বলেও ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.....

"তোমরা হলে উত্তম উম্মত, মানব জাতির উপকারার্থেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে ভাল কাজের নিদেশ দেবে, আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে"।

আলোচ্য সূরার শুরুতে যখন নাযিল হয় ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (পূর্ববর্তীদের একদল এবং পরবর্তীদের কিছু সংখ্যক লোক) তখন হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! পূর্ববর্তী উম্মত থেকে অনেক লোক জান্নাতগামীদের মধ্যে অগ্রবর্তী হবে, আর এ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক হবে, এর কিছুদিন পর আলোচ্য আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ নাযিল হয়, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডাক দিয়ে বললেন, আল্লাহ পাকের এরশাদ শ্রবণ কর, আদম (আঃ) থেকে এ পর্যন্ত এক দল, আর শুধু আমার উম্মতই এক দল। এ উচ্চ মর্যাদাই এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য আল্লামা আলুসী (রঃ) ইমাম কুরতবী (রঃ) এবং হাফেজ এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اولين শব্দ দ্বারা এ উম্মতের প্রথমাংশকে বোঝানো হয়েছে, আর اٰخرين শব্দ দ্বারা শেষাংশকে বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মত পোষণ করতেন।[১]

তফসীরে এবনে হাতেমে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী নবীগণকে তাদের উম্মত সহ পেশ করা হয়, নবীগণ গমন করছিলেন এবং তাঁদের উম্মতও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, কোন নবীর সঙ্গে মাত্র তিনজন লোক ছিলেন, হযরত মূসা এবনে এমরান (আঃ) যখন গমন করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে বণী ইসরাঈলের এক বিরাট দল ছিল, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ! আমার উম্মত কোথায়? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, নিজের ডানে নিচের দিকে লক্ষ্য কর, আমি দেখলাম এক বিরাট দল রয়েছে এবং মানুষের চেহারা চমকাচ্ছিল, তখন আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তো খুশী হয়েছ? আমি আরজ করলাম, জ্বী হ্যাঁ, হে পরওয়ারদেগার! এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, এবার নিজের বাম দিকে লক্ষ্য কর, আমি দেখলাম সেখানেও অগণিত লোক রয়েছে। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কান্দলভী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৮

করলেন, এখন তো রাজী হয়েছ? আমি আরজ করলাম, হে পরওয়ারদেগার! আমি রাজী। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আরো শ্রবণ কর! এর সাথে আরো সত্তর হাজার ব্যক্তি রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। একথা শ্রবণ করে হযরত ওকাশা (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি কবীলায়ে বনু আসাদের মোহসেন নামক ব্যক্তির পুত্র ছিলেন, তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! দোয়া করুন, যেন আল্লাহ পাক বে-হিসাব জান্নাতগামীদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার জন্যেও দোয়া করুন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, ওকাশা (রাঃ) তোমার পূর্বেই সুযোগ গ্রহণ করে ফেলেছে। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে লোক সকল! যে ৭০ হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তোমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। যদি তা না হয় তবে অন্ততঃ اصحب اليمين।ডান দিকের দলে শামিল হও, আর যদি তা-ও না হয় তবে অন্ততঃ যারা এর প্রান্তে থাকবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হও।[১]

وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَّ
حَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَّظِلٍّ مِّن يَّحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا
يَقُولُونَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَ ءَابَآؤُنَا
الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْءَاخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۙ إِلَىٰ
مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّآلُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

তরজমা

(৪১) আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের লোকেরা।
(৪২) উত্তপ্ত বায়ু এবং ফুটন্ত পানিতে তারা থাকবে।
(৪৩) কৃষ্ণ বর্ণ ধূম্রের ছায়ায় তারা থাকবে।
(৪৪) যা শীতল নয়, যা শান্তিদায়কও নয়।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৩
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৮৫
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৬৪

(৪৫) ইতিপূর্বে তারা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল।

(৪৬) এবং তারা অবিরাম বড় বড় পাপকার্যে লিপ্ত ছিল।

(৪৭) আর তারা বলতো, আমরা যখন মরে মাটি এবং অস্থি হয়ে যাব, তবু কি আমাদের পুনরুত্থান হবে?

(৪৮) আর আমাদের পূর্ব পুরুষদেরও পুনরুত্থান হবে?

(৪৯) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় পূর্ববর্তীরা এবং পরবর্তীরা।

(৫০) তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনে নিদৃষ্ট সময়ে।

(৫১) এরপর হে বিভ্রান্ত ও মিথ্যা আরোপকারীরা!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ডান দিকের লোকদের জন্যে জান্নাতে যে সব নেয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াত থেকে যারা ভাগ্যাহত, বদনসীব, যারা কাফের, মুশরেক ও পাপীষ্ঠ, যারা বাম দিকের দলে থাকবে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ۝ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ۝ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ۝ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ

আর বাম দিকের দল, কত ভাগ্যাহত বাম দিকের লোকেরা! তারা থাকবে উত্তপ্ত বাতাস এবং ফুটন্ত পানিতে। তারা থাকবে ধোয়াচ্ছন্ন ছায়ায়। যা ঠান্ডাও হবেনা এবং আরামদায়কও হবেনা। তাদের সুখও থাকবেনা, শান্তিও থাকবেনা, আর থাকবেনা তাদের মান সম্মান। অপমান এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হবে তাদের জীবন-সাথী। দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদাপদে তারা থাকবে জর্জরিত, এর কারণ এই যে, তারা দুনিয়ার জীবনে ছিল আনন্দ উল্লাসে মত্ত, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, কুফরী ও নাফরমানীতে ব্যস্ত, আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ, দম্ভ ও অহংকার ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য, তারা ছিল আত্মবিস্মৃত, তারা বিস্মৃত হয়েছিল তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে, শেরক ও কুফরকে তারা কল্যাণের পথ মনে করেছিল, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তারা জেদ বজায় রেখেছিল, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ۝ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ

ইতিপূর্বে তারা (অর্থাৎ দুনিয়াতে) ভোগ বিলাসে মত্ত থাকত এবং তারা গুরুতর পাপকার্যে লিপ্ত থাকতে জেদ করতো।

الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ অত্যন্ত বড় অপরাধ যেমন শেরক। ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, এটি হলো জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা, কেননা কাফেররা মিথ্যা শপথ করে বলতো যে, তাদেরকে পুনর্জীবন দেয়া হবেনা, তাদের পুনরুত্থান হবেনা।

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ۞ اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ

আর তারা বলতো, আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাব, অস্থি কংকালে পরিণত হওয়ার পরও কি আবার জীবিত হবো? আমাদের কি পুনরুত্থান হবে? আমাদের পূর্ব পুরুষদেরও কি একই অবস্থা? তা কি সম্ভব?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الحنث। العظيم। শব্দটি দ্বারা কুফর ও শেরককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে শেরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করতেও পারেন'।

বস্তুতঃ কাফেররা শুধু যে দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাসে মত্ত এবং কুফর ও শেরকে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করতো না। কেয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং তারা বিদ্রুপ করে বলতো, আমরা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবো, চিরতরে মাটির সঙ্গে মিশে যাব, এরপর কি আবার জীবিত হবো? তা কি করে সম্ভব? তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ ভ্রান্ত মতের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ۞ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ۞ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّاۤلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, পূর্ববর্তীরা এবং পরবর্তীরা সকলকে এক নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে একত্রিত করা হবে। এরপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা

আরোপকারীরা!" (তোমাদের ভয়াবহ পরিণতির জন্যে তথা দোযখের শাস্তির জন্যে অপেক্ষা কর)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে, (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে, তোমাদের সকলকে অবশেষে একদিন তথা কেয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে, তোমাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের কঠিন দিন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন দোযখ থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দু'টি চক্ষু এবং দু'টি কানও থাকবে, এর দ্বারা সে দেখবে, শুনবে। তার একটি রসনা থাকবে তা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তিন প্রকার লোকের উপর

(১) প্রত্যেক অবাধ্য এবং একগুয়ে লোকের উপর,

(২) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে শরীক করে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে,

(৩) যে ছবি প্রস্তুত করে।

এই হাদীস সংকলিত হয়েছে তিরমিযী শরীফে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন এমন এক দোযখী ব্যক্তিকে একবার দোযখে ডুবিয়ে আনা হবে যে দুনিয়ার জীবনে সর্বাধিক ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান। তুমি কি কখনো ভোগ বিলাস করেছ? কখনো কি তুমি সুখ-শান্তি ভোগ করার সুযোগ পেয়েছ? তখন সে বলবে, আল্লাহ্ পাকের শপথ কখনো না (অর্থাৎ অল্পক্ষণ দোযখের কঠোর শাস্তি দেখার পর অবস্থা এমন হবে যে, সে ব্যক্তি সারা জীবনের ভোগ বিলাসকে এক মুহূর্তে ভুলে যাবে)।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন এমন একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাতে ডুবিয়ে আনা হবে যে দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্টে ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, আল্লাহ্ পাকের শপথ, আমি কখনো কোন রকম দুঃখ কষ্ট দেখিনি (অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্যে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করার পর সে দুনিয়ার জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবে)।

মূলতঃ আলোচ্য আয়াত সমূহে দোযখের কঠিন শাস্তির কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। কোরআনে করীমের বহু আয়াতে দোযখের বিবরণ দেয়া হয়েছে যাতে করে

মানুষ পরিণামদর্শী হয় এবং পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا

"তারা দোযখে গরম পানি এবং পুঁজ ব্যতীত কোন পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করবে না"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

(সূরা হজ্বঃ আয়াতঃ ১৯-২০)

"তাদের মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে, পরিণামে তাদের উদরের সবকিছু এবং চামড়া সমূহ গলে বের হয়ে যাবে"।

এমনি আরো বহু আয়াতে দোযখের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে (আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمٰلِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰٓى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾
ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا
فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾

তরজমা

(৫২) (হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীরা!) তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করবে।

(৫৩) এবং এর দ্বারা তোমরা পরিপূর্ণ করবে উদর।

(৫৪) তদুপরি তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি।

(৫৫) পান করবে তোমরা তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।

(৫৬) কেয়ামতের দিন এই হবে তোমাদের আপ্যায়ন।

(৫৭) নিশ্চয় আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবু কেন তোমরা বিশ্বাস কর-না?

(৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

(৫৯) তোমরাই কি তা সৃষ্টি কর? না আমি সৃষ্টি করি?

(৬০) আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু স্থির করে রেখেছি এবং এ বিষয়ে আমি অক্ষম নই।

(৬১) তোমাদের স্থলে তোমাদের ন্যায় অন্যকে আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দান করতে, যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও।

(৬২) প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে তো তোমরা অবগত হয়েছ, তবে তোমরা সত্য অনুধাবন কর-না কেন?

(৬৩) লক্ষ্য কর, তোমরা যা বপন করে থাক, সে সম্পর্কে তোমরা কি কিছু ভেবেছ?

(৬৪) তোমরা কি তা অংকুরিত কর? না আমি অংকুরিত করি?

(৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

(৬৬) তোমরা তখন বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল।

(৬৭) এবং আমরা একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

তফসীরুল কোরআন

পূরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ

(হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীরা!)

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে, তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণের মতে, পৃথিবীর সকল পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা মহা পাপে তথা শেরকে লিপ্ত থাকে, তারা আল্লাহ পাকের পথ থেকে দূরে সরে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করেছে, তাঁর মহান বাণীকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে এবং তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

তৃতীয়তঃ তারা পরকালীন জীবনকেও মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারা বলেছে আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যাব তখনও কি আবার জীবিত হবো? হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা আরোপকারীর দল! বলে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ

'তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করবে'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যাক্কুম এমনি একটি বস্তু যা অত্যন্ত তিক্ত, অত্যধিক গরম এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, আর দেখতে অতীব কুৎসিত, যাকে খেতে দেয়া হয় সে গিলতে পারেনা।[১]

আর এ সম্পর্কে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ

''নিশ্চয় যাক্কুম একটি বৃক্ষ যা দোযখের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়, তার ফল যেন সাপের ফনা''।

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

অর্থাৎ জঠর-জ্বালায় তোমরা যাক্কুম বৃক্ষের অত্যন্ত দুগর্ন্ধময় বিস্বাদ ফল দ্বারা তোমাদের উদর পূর্ণ করবে।

فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۞ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ

'তদুপরি তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি, পান করবে তোমরা তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়'।

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ

'আর এই হবে কেয়ামতের দিন তোমাদের আপ্যায়ন'।

نزل শব্দটির অর্থ হলো আপ্যায়ন। তফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপ করেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৭৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৬৪
যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১০৩-০৬

"তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন", শাস্তির সুসংবাদ হয়না কিন্তু বিদ্রুপার্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ

'নিশ্চয় আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবু কেন তোমরা বিশ্বাস কর না'?

অর্থাৎ প্রথমবার আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একথাতো তোমরা স্বীকার কর, আমিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবো, একথা তোমরা কেন মান না?

কেয়ামতকে যারা অবিশ্বাস করে, তাদেরকে লা-জওয়াব করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের অস্তিত্ব ছিলনা তখন আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এখন মৃত্যুর পর তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ হবে? যেমন কোরআনে করীমের অন্যত্র আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

"আল্লাহ পাকই প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অতি সহজ"।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহ পাকই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাঁর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে তোমরা কেন অস্বীকার কর? অথচ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়।[১]

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۞ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর? নাকি আমি সৃষ্টি করি?'।

অর্থাৎ মানুষ যদি তার সৃষ্টির ইতিকথা সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে তবে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে থাকতে পারেনা, আল্লাহ পাকের অগণিত দানকে অস্বীকার করতে পারেনা, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেনঃ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! যে শুক্রবিন্দু দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয় তা কি তোমাদের তৈরী? আর মাতৃ উদরে মানুষকে কি তোমরা সৃষ্টি কর? একটি শুক্রবিন্দু থেকে এমন সুন্দর উত্তম আকৃতিতে কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন? তিনিই আল্লাহ পাক যনি তোমাদের সৃষ্টি করেন, আর তিনিই মাতৃ-উদরে তোমাদেরকে লালন পালন করেন।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১৭৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৬৭
তফসীরে এবনে কাসরী, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৮৮

যাহোক, একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ পাকই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন কিন্তু তিনি কি তোমাদেরকে চির দিনের জন্যে পৃথিবীতে রেখে দেবেন? অবশ্যই নয়। মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়, এরপর পুনরায় আল্লাহ পাক মানব জাতিকে কেয়ামতের দিন হাযির করবেন, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ۞ عَلَى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

'আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু স্থির করে রেখেছি, এ বিষয়ে আমি অক্ষম নই। তোমাদের স্থলে তোমাদের ন্যায় অন্যকে আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দান করতে, যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও'।

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি, কারো বয়স বেশী, কারো কম কিন্তু প্রত্যেকের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, তাতে কোন পরিবর্তন হয়না, হবেনা, আর আল্লাহ পাক তোমাদের স্থলে অন্যকে আনয়ন করতে অক্ষম নন, তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

'যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে বিদায় করে নতুন জাতি আনয়ন করবেন'।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ

'আর নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত হয়েছ তবু কেন সত্য অনুধাবন কর না'?

বস্তুতঃ পৃথিবীতে মানুষের আগমন, অবস্থান এবং পৃথিবী থেকে প্রস্থান- সব কিছুই এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়, মানুষের ইচ্ছা এর কোন পর্যায়েই কার্যকর হয়না। এ সত্য প্রতিনিয়ত দেখা যায়, অতএব প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। আর একথা বিশ্বাস করা যে, অবশেষে পুনরায় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে, যিনি প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন কিছুই নয়।

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ۞ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ۞ لَوْ نَشَاۤءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ۞ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ- بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ

'লক্ষ্য কর, তোমরা যা বপন করে থাক সে সম্পর্কে তোমরা কিছু কি ভেবেছ? তোমরা কি তা অংকুরিত কর নাকি আমি অংকুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, তোমরা তখন বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা রিয্ক থেকে মাহরুম হয়ে গেলাম'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মানুষকে তার সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাপারে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের তা'লীম দেয়া হয়েছে।

আর এ আয়াত সমূহে মানুষের খাদ্য-দ্রব্যের ব্যাপারে তার অক্ষমতা বর্ণনা করে এ সত্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ পাক দয়া করে মানুষকে রিয্ক দান না করেন সেক্ষেত্রে মানুষ শত চেষ্টা করেও রিয্ক অর্জনে ব্যর্থ হবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ

তোমরা যা বপন করে থাক, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? বীজ বপন পর্যন্তই তোমাদের কাজ শেষ, এরপর তোমাদের কি কোন ক্ষমতা থাকে? মাটির বুক চিরে নরম মসৃণ চারা গাছটি কি তোমরা বের কর? ফসল কি তোমরা উৎপন্ন কর? নাকি আল্লাহ পাক তা উৎপন্ন করেন? অবশ্যই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতেই ফসলাদি উৎপন্ন হয়, তাঁর হুকুমে বৃষ্টিপাত হয়, তোমরা যমীনে বীজ বপন কর, এরপর আল্লাহ পাকের নির্দেশেই যমীন তা গ্রহণ করে। যদি তোমাদের বপন করা বীজ যমীন থেকে ফেরত নিতে চাও তবে অবশ্যই ব্যর্থ হবে, কেননা যমীন আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করা যমীনের পক্ষে সম্ভব নয়।

যমীনে বীজ বপন করার পর আল্লাহ পাকের নির্দেশে সূর্যের আলোক রশ্মি তাতে তাপ পৌঁছায়, এরপর বাতাস এবং মৌসুমী উষ্ণতা আল্লাহ পাকের আদেশেই একটি সামঞ্জস্য বিধান করে। পানির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাতে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে আর তা এক আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমেই করে থাকে, এসব একটি বিশেষ ওজন, আন্দাজ এবং নিয়মনীতি মাফিক হওয়া ফসল উৎপাদনের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। কথা এখানেই শেষ নয়; বরং বীজ গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়া এবং চারার রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করা, এরপর ক্রমশঃ তা বেড়ে ওঠা এবং ডালা মেলা, অবশেষে ফলমূলের সৃষ্টি হওয়া, সব কিছুই মহান আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং মর্জিতেই হয়ে থাকে। যমীনের জন্যে আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে, এ নিয়ম-নীতির বরখেলাফ করা যমীনের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

অতএব, ফল এবং ফসল উৎপন্ন করা এক আল্লাহ পাকেরই কাজ, আর বন্দার কাজ হলো আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং নেয়ামতের ব্যবহার বিধি মেনে চলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

'আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে'।

অর্থাৎ ফল-ফসল উৎপন্ন করার পর আমি তা ধ্বংসও করে দিতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

اِنَّا لَمُغْرَمُونَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

'তখন তোমরা বলবে, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা যা কিছু ব্যয় করেছি সবই শেষ হয়ে গেছে'।

مغرم সে ব্যক্তিকে বলা হয় যার অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) এবং এবনে কিসান (রঃ)।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমরা আযাবে গ্রেফতার হয়ে গেছি। আমরা আমাদের রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়েছি, এখন জঠর-জ্বালায় মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

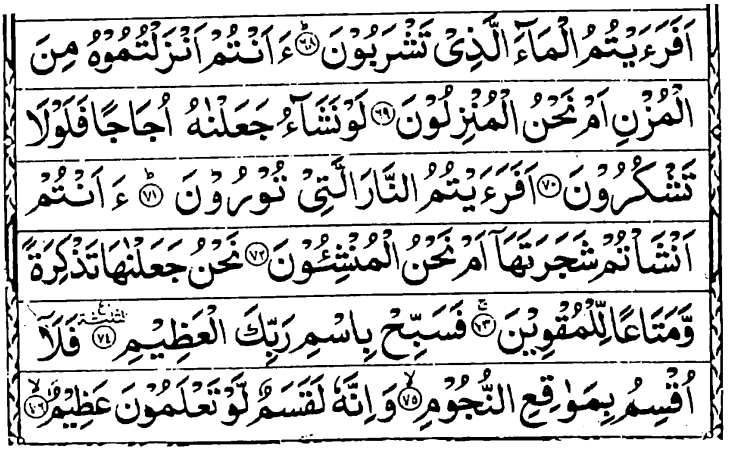

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ
الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ
أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً
وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَآ
أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

তরজমা

(৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ?

(৬৯) তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন? নাকি আমি তা বর্ষণ করি?

(৭০) আমি ইচ্ছা করলে যে ঐ পানিকে লবনাক্ত করে দিতে পারি, তবু তোমরা কেন শোকর গুজার হওনা?

(৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?

(৭২) তোমরাই কি ঐ অগ্নি-বৃক্ষ সৃষ্টি কর? নাকি আমিই তা সৃষ্টি করে থাকি?

(৭৩) আমিই অগ্নিকে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু।

(৭৪) অতএব, (হে রসূল!) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করুন।

(৭৫) আমি শপথ করছি, নক্ষত্ররাজির অস্তগমনের।

(৭৬) অবশ্যই তা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে পার।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে করে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব যেমন আল্লাহ পাকের দান, তেমনি মানুষের খাদ্যও তাঁর দান ব্যতীত আর কিছুই নয়, খাদ্যের জন্যে মানুষ বীজ বপন করতে পারে কিন্তু খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। সে ক্ষমতা হলো একমাত্র আল্লাহ পাকের, অতএব মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের দানের কথা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, খাদ্যের ন্যায় পানিও আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। এ ব্যাপারেও মানুষের অক্ষমতা সুস্পষ্ট। পানির অপর নাম জীবন, পানি না থাকলে মানুষের জীবন যাত্রা অচল, পিপাসায় কাতর মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আধুনিক যুগে যাবতীয় উন্নতি অগ্রগতি মূলতঃ বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরী হয় পানির বদৌলতে। হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! পানি কি মানুষ তৈরী করতে পারে? পানি কি মানুষ বর্ষণ করে? না কখনও নয়, মেঘমালা থেকে আল্লাহ পাকই পানি বর্ষণ করেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ- ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন নাকি আমি তা বর্ষণ করি'?

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিতে পারেন এবং সারা পৃথিবীকে শুকিয়ে দিতে পারেন। কখনও কখনও এমন অবস্থা হয়েছেও, এজন্যে ইসলামী শরীয়তে এস্তেস্কার নামাযের বিধান রয়েছে অর্থাৎ পানি চেয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দু' রাকাআত নামায পড়ে কান্নাকাটি করা, কেননা আল্লাহ পাক দয়া করে পানি না দিলে তা কেউ দিতে পারেনা, শুধু তাই নয়; যদি আল্লাহ পাক পানিকে লবনাক্ত করে দিতে ইচ্ছে করেন অর্থাৎ পানিকে পানের অযোগ্য করে দেন, তবু কারো কিছুই করার নেই, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْنَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ

"আমি ইচ্ছা করলে এ পানিকে লবনাক্ত করে দিতে পারি তবু কেন তোমরা শোকর গুজার হওনা"?

অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব, খাদ্য ও পানীয় সবই আল্লাহ পাকের দান, তাই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۞ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ

'তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে থাক সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? তোমরাই কি ঐ অগ্নির বৃক্ষ সৃষ্টি কর, নাকি আমিই তা সৃষ্টি করি'।

খাদ্য ও পানীয়ের পর আলোচ্য আয়াতে অগ্নির উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা মানুষের জীবন ধারণে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা প্রতি মুহূর্তে হয়ে থাকে, প্রশ্ন হলো অগ্নি কার দান? তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেন, ভেবে দেখেছ, হে মানব জাতি! কে সৃষ্টি করেছেন অগ্নির বৃক্ষ? উত্তর একটিই যে, আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন অগ্নি। তিনিই মানুষের সকল প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। তাঁর দান ব্যতীত মানুষের কাছে কিছুই নেই। অতএব, এসব দানের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের কর্তব্য।

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ

"আমিই অগ্নিকে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু"।

বস্তুতঃ যারা পথচারী, মরুচারী অন্ধকারে আলো প্রজ্জ্বলিত থাকলে তাদের পথ চলার সহায়ক হয়, এভাবে তারা জীবনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার এ অগ্নি দোযখের অগ্নির একটি নমুনা। দুনিয়ার অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করে দোযখের অগ্নির কথা মনে করা এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে দুনিয়ার এ অগ্নি উপদেশ হিসেবেও কাজ করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের এ অগ্নি দোযখের অগ্নির ৭০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! পোড়ানোর জন্যে এ অগ্নিইতো যথেষ্ট। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দোযখের অগ্নি এ অগ্নি থেকে ৬৯ গুণ বেশী, দোযখের অগ্নির সামান্যতম অংশ এ অগ্নির সমান। (বোখারী, মুসলিম)

مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ

مقوين শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে পথিক, মুসাফির অর্থাৎ যারা মরুচারী, তারা এ অগ্নির সাহায্যে পথ দেখে।

দ্বিতীয়তঃ হিংস্র জন্তু থেকে পথিক মুসাফিরকে আত্মরক্ষা করতে অগ্নি সহায়ক হয়। এতদ্ব্যতীত তুহীন শীতের সময় শীতের কষ্ট দূর করতে অগ্নির ব্যবহার হয়, তাই পথিক মুসাফিরের জন্যে অগ্নি উপকারী হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) ও একরামা (রঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল উপকার গ্রহণকারী অর্থাৎ পথিক মুসাফিক হোক, বা বাড়ী-ঘরে অবস্থানকারী, যে কোন ব্যক্তির জন্যে অগ্নি হয় উপকারী।

তফসীরকার এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, مقوين শব্দটির অর্থ হল ক্ষুধার্ত অর্থাৎ যে ক্ষুধার্ত তার জন্যে অগ্নি উপকারী হয়, কেননা খাদ্য প্রস্তুত করতে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অতএব অগ্নি মানব জীবনের জন্যে শুধু উপকারীই নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে, আর আল্লাহ পাকের দান স্বরূপই মানুষ পেয়েছে এ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বস্তুটি।

মানুষের কর্তব্য

অতএব মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম স্মরণ করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁ র বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা।[১]

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

'অতএব (হে রসূল!) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন'।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৫৩
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৮৯
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা- ২৭১

অর্থাৎ যখন তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারলে যে, মানুষের এ জীবন, তার খাদ্য ও পানীয় এবং যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন এক আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয়, তখন মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

দ্বিতীয়তঃ যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, অহরহ তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়না, তাদের এ অন্যায় আচরণ নিতান্ত নিন্দনীয়। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক। অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করতে থাক।

আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হও

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, করুণাময় আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন তোমাদের জীবন, তোমাদের খাদ্য-দ্রব্য, পানীয় এক কথায় সব কিছু। অতএব তোমরা সর্বক্ষণ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক এবং তাঁর শোকর গুজার হও। দুনিয়াতে যেভাবে আল্লাহ পাকের নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে পার, যদি তোমরা তাঁর শোকর আদায় কর তবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতেও তোমরা জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামত লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ পাক মানুষের উপকারার্থে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন, আর এজন্যে যেন মানুষ দোযখের অগ্নি সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, অতএব মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করা, যেন দোযখের অগ্নি থেকে নাজাত পাওয়া যায়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক তৌহীদ বিরোধী লোকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর তৌহীদের দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন মানব জাতির সৃষ্টির কথা, তাঁর প্রদত্ত রিয্‌কের কথা কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা ভাগ্যাহত, তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন, তাঁর তসবীহ পাঠ করতে থাকুন, কেননা আপনি আপনার প্রতিপালককে জানেন, এ কাফেররা জানেনা। আর আপনার যাবতীয় কাজ আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যে অতএব, আপনার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন।[২]

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৯২
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৮৪-৮৫

'আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজীর অস্তগমনের, আর নিশ্চয় তা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে পার এবং সত্য উপলব্ধি কর'।

কোন বক্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করার উদ্দেশ্যে কোরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে শপথ করার প্রথা রয়েছে, আলোচ্য আয়াতেও শপথের উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব মাহাত্ম প্রকাশ করার লক্ষ্যে।

এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের لا অক্ষরটি বাড়তি, তাই এর অর্থ হলো, "আমি শপথ করছি, নক্ষত্ররাজীর অস্তগমনের আর এ শপথ অত্যন্ত বড় ব্যাপার"। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, لا অক্ষরটিকে বাড়তি বলার প্রয়োজন নেই; বরং বাক্যটির অর্থ হলো, আমি শপথ করিনা, কেননা যে কথা বলছি তা এত সুস্পষ্ট এবং সর্বজনবিদিত যে তার জন্যে শপথ করার কোন প্রয়োজন নেই। আর যে বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে এ শপথের উল্লেখ রয়েছে তা হল সমগ্র মানব জাতির মুক্তির মহা সনদ পবিত্র কোরআনের সত্যতার ঘোষণা, যা সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের প্রতীক, তার আলোচনা পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে। অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকারাজি রয়েছে, মহাকাশে আল্লাহ্ পাকের অপূর্ব কলাকৌশলের বিস্ময়কর নিদর্শন হল এ তারকারাজি। রাত্রিকালে তারকারাজির এ কলাকৌশল বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে রাখে, কখনও এর পরিবর্তন হয়না, কখনও এর মেরামতেরও প্রয়োজন হয়না, ঠিক তেমনি যে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের কথা তারকারাজীর অস্তগমণের শপথ করে বলা হয়েছে, তাতেও কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়না। পবিত্র কোরআন চিরন্তন সত্য, সর্বকালের মহা সত্য, যুগের আবর্তন-বিবর্তনে তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয়না, তাই সকল যুগের মানুষের জন্যেই রয়েছে পবিত্র কোরআনে পরিপূর্ণ হেদায়েত, সার্বিক কল্যাণ।

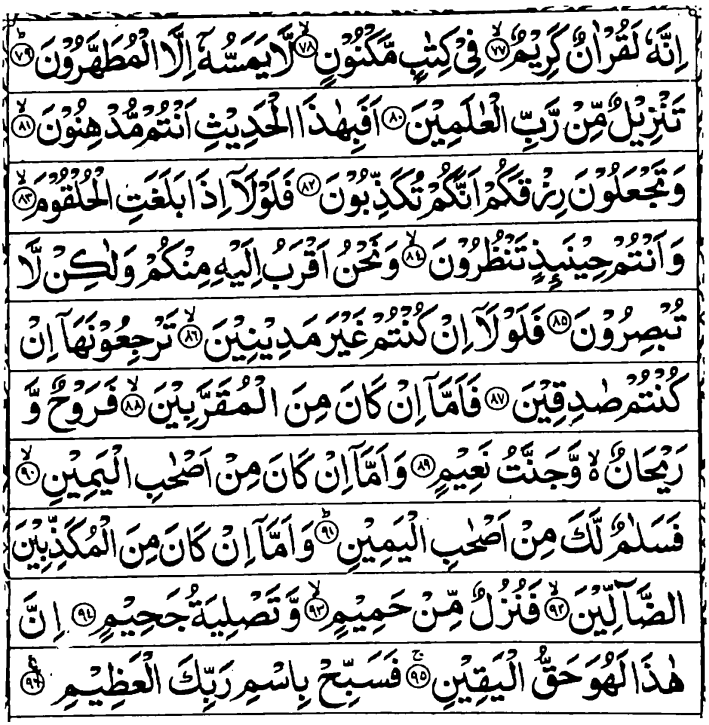
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾
وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا
تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِن
كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ
وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ
الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

তরজমা

(৭৭) নিশ্চয় তা সম্মানিত কোরআন,

(৭৮) যা লিখিত রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে (লওহে মাহফুজে)।

(৭৯) যারা পবিত্রতা অর্জন করে তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারেনা।

(৮০) এই কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ।

(৮১) তবে কি তোমরা এই মহান বাণীকে সাধারণ কথা মনে করছো?

(৮২) আর এ অবিশ্বাস করাকে তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেছ?

(৮৩) অতএব, (যদি তাই সত্য হয় তবে) যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয়,

(৮৪) তোমরা তখন (তার দিকে) তাকিয়ে থাক।

(৮৫) আর আমি তখন তোমাদের চেয়ে তার অধিকতর নিকটবর্তী থাকি, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা।

(৮৬) যদি তোমরা কারো কর্তৃত্বাধীন না হয়ে থাক,

(৮৭) তবে কেন তোমরা ঐ প্রাণকে ফিরিয়ে দাও না? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৮৮) অতঃপর যদি সে ব্যক্তি (আল্লাহ পাকের) নৈকট্য-ধন্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়,

(৮৯) তবে তার জন্যে রয়েছে শান্তি, উত্তম জীবিকা এবং রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

(৯০) আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,

(৯১) (তবে তাকে বলা হবে) তোমার জন্যে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা, কেননা তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভূক্ত।

(৯২) আর যদি সে (মৃত ব্যক্তি) অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়,

(৯৩) তবে তাকে ফুটন্ত পানি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে।

(৯৪) এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করতে হবে।

(৯৫) নিশ্চয় এ সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য,

(৯৬) অতএব, (হে রসূল!) আপনার মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন, তাঁর সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং তাঁর সৃষ্টির অনেক দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তার খাদ্য ও পানীয় এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু তিনিই সরবরাহ করছেন, অতএব মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকরগুজার হওয়া। এ পর্যন্ত যত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ছিল জাগতিক নেয়ামত। আর আলোচ্য আয়াত সমূহে সর্ব প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো স্বয়ং আল্লাহ পাকের চিরন্তন মহান বাণী পবিত্র কোরআন। এ ঘোষণার পূর্বে আল্লাহ পাক বিষয়টির উপর যথার্থ গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের অস্তগমনের শপথ করে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ঘোষণা করেছেন। আর একথাও বলেছেন যে, যদি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর যে, নক্ষত্রপুঞ্জের গতি-প্রকৃতি, উদয়-অস্তের ব্যবস্থা কত বিস্ময়কর এবং কত সুদৃঢ় যে, তাতে কখনো কোন পার্থক্য বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়না, তাহলে তোমরা এ শপথের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং যে পবিত্র কোরআনের সম্পর্কে এ শপথ করা হয়েছে তার গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছুটা আঁচ করতে পারবে। এরপর আলোচ্য আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

নিশ্চয় কোরআনে করীম অবশ্যই অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ যা লিখিত রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে (লওহে মাহফুজে)।

এ মহান গ্রন্থের গুরুত্ব ও মাহাত্ম, সম্মান এবং মর্যাদা বর্ণনাতীত। যেহেতু এটি মহান আল্লাহ পাকের চিরন্তন বাণী তাই পৃথিবীতে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই, যা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ এতে রয়েছে নিহিত। আর এ কোরআনে করীম লওহে মাহফুজে রয়েছে সংরক্ষিত, যেভাবে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির উপর স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সুপ্রতিষ্ঠিত, ঠিক তেমনি তাঁর মহান বাণীর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এর বর্ণনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য অদ্বিতীয়, এতে কখনো কোন পরিবর্তন হয়না, অথচ সর্বকালের জন্যে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সমভাবে প্রযোজ্য।

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ

'পবিত্র কোরআন এমনি এক মহান গ্রন্থ, যা পবিত্র অবস্থা ব্যতীত স্পর্শ করা যায়না'।

অজু ব্যতীত পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা যায়না

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, অপবিত্র এবং বে-অজু অবস্থায় পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা যায়না, তবে গেলাফে আবৃত অবস্থায় থাকলে তার উপর স্পর্শ করা এবং বহন করা বৈধ। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ মত পোষণ করেছেন। তবে পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা ব্যতীত বে-অজু অবস্থায় তেলাওয়াত করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস শরীফের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আমার খালা উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর গৃহে এক রাত অতিবাহিত করি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও ঐ রাতে সে গৃহে ছিলেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন এবং উঠে বসলেন। তিনি তাঁর চেহারা মোবারকে তাঁর দস্তে মোবারক ফিরিয়ে নিদ্রার ভাব দূর করে দিলেন, এরপর তিনি সূরা আলে এমরানের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত পানির মশক থেকে পানি নিয়ে অজু করলেন।

এ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, অজু ব্যতীত কোরআনে করীমের আয়াত তেলাওয়াত করা বৈধ।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেনঃ, আলোচ্য আয়াতের مُطَهَّرُونَ শব্দটির অর্থ موحد অর্থাৎ যারা তৌহীদে বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী তারা ব্যতীত কেউ পবিত্র কোরআন স্পর্শ করবেনা। আর সুফী

সাধকগণের মতে, موحد শুধু সে ব্যক্তিকেই বলা হয় যার জীবন-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, এছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "যে পর্যন্ত কোন লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা আমার নিয়ে আসা দ্বীনের অনুগত না হবে, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত মোমেন হতে পারবেনা"।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠের অনুমতি দিতে বাধা দিতেন। হাদীস শরীফে একথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুশমনের দেশে কোরআনে করীম নিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোরআনে করীমের আদব রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

ফররা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, কোরআনে করীমের স্বাদ সে ব্যক্তিই পাবে যে এর উপর ঈমান আনবে, আর এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে বিনাশ করা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কোরআনে করীমের বরকত হাসিল করা সম্ভব নয়। কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে মুক্ত করার পরই কোরআনে করীমের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। দুনিয়া এবং আখেরাত, উভয় জাহানের জন্যেই এ নীতি প্রযোজ্য।

তিরমিযী, আবু দাউদ এবং নেসায়ী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (বেহেশতে প্রবেশ করার সময়) বলা হবে, কোরআন পাঠ কর এবং উপরের দিকে যেতে থাক এবং ধীরে ধীরে কোরআন পাঠ কর, যেখানে পৌঁছার পর তোমার কোরআন পাঠ করা শেষ হবে সেখানেই তোমার মঞ্জিল।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'এই কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ'।

যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সর্বশ্রোতা, যিনি সর্বজ্ঞাত তাঁরই মহান চিরন্তন বাণী হল পবিত্র কোরআন, যা তিনি নাযিল করেছেন বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যা বিশ্ব মানবের কল্যাণার্থে আল্লাহ পাক সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ

'তবে কি তোমরা এ মহান বাণীকে সাধারণ কথা মনে করছো'?

যে পবিত্র কোরআন এত সম্মানিত, এত মর্যাদা সম্পন্ন তাকে কি তোমরা সাধারণ কথা মনে কর? কোরআনে করীমের ন্যায় অমূল্য সম্পদের সাদর অভ্যর্থনার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বা এ সম্পর্কে যারা উদাসীন, তাদের চেয়ে অধিকতর দুর্ভাগ্য আর কারোরই নেই, কেননা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি, অগ্রগতি নির্ভর করে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর। তাই যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তারা নিশ্চয় ভাগ্য-বিড়ম্বিত, চির বঞ্চিত।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের مدهنون শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, মিথ্যা জ্ঞানকারী। অর্থাৎ তোমরা কি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে মিথ্যা জ্ঞান কর?

আর মোকাতেল এবনে হাসান বলেছেন, مُدْهِنُوْنَ শব্দটির অর্থ হল, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে অস্বীকারকারী।

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ

"আর এই অবিশ্বাস করাকে তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেছ"?

কাফের মুশরেকদের কোরআন বিরোধী দৌরাত্ম দেখলে মনে হয় যে পবিত্র কোরআনের প্রচার প্রসারে বাধা দেয়ার, পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করার এবং এর বিরোধিতাকে কাফেররা তাদের আহার্য বা উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে, পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধাচারণই যেন তাদের একমাত্র কাজ, আর এ কাজকে তারা তাদের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছে।

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۞ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক কাফের মুশরেকদেরকে লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন করেছেন যে, তোমরা অসংকোচে এবং নির্ভীক চিত্তে পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করছো, তার বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করছো, তোমরা কি মনে কর যে তোমরা কারোই অধীন নও? তাহলে যখন কোন লোকের মৃত্যুর সময় ঘণিয়ে আসে, তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয় তখন তোমরা অসহায় অবস্থায় তার দিকে চেয়ে থাক, তখন তোমরা থাক বড়ই অসহায় নিরুপায়। তার কোন উপকারই তোমরা করতে পারনা, তাকে মৃত্যুর হাত থেকে কোনভাবেই রক্ষা করতে পারনা।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ

অথচ আমি মৃত্যু পথের ঐ যাত্রীর তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী নিকটবর্তী থাকি, তার সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে আমিই সর্বাধিক অবগত থাকি, আর তোমরা তা দেখতেও পাওনা।

فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ۞ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

'যদি তোমরা কারো কর্তৃত্বাধীন না হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ঐ প্রাণকে ফিরিয়ে দাও না, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

অর্থাৎ যদি তোমরা কারো অধীন না হও, যদি তোমরা পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস না কর এবং কেয়ামতের ময়দানে তোমাদেরকে হাযির করা হবে একথায়ও একীন না হয় তবে এই প্রাণকে তোমরা যেতে কেন দিলে? যদি তোমাদের শক্তি থাকত, তবে তোমরা কণ্ঠাগত প্রাণকে স্ব-স্থানে ফিরিয়ে দিতে এবং মৃত্যু পথের যাত্রী পৃথিবী থেকে বিদায় হতো না; বরং তার বাড়ী-ঘরেই ফিরে আসতো, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না, অতএব মনে রেখ যিনি তোমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর তিনিই তোমাদেরকে পুনর্জীবন দান করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। অতএব, পরকালীন জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। যে এ পৃথিবীতে আগমন করে তাকে অবশ্যই এ পৃথিবী থেকে গমনও করতে হবে, যিনি দান করেছেন জীবন তিনিই জীবনের অবসান ঘটাবেন, আর তিনিই কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সকলকে একত্রিত করবেন, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। কেয়ামতের ময়দানে হাযির হওয়ার পর কি অবস্থা হবে তা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ۞ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ

"অতঃপর যদি মৃত ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্যদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার জন্যে রয়েছে শান্তি, উত্তম জীবিকা এবং রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত'।

এ জীবনের পর কি হবে

এ সূরার শুরুতে সমগ্র মানব জাতিকে তিনভাগে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

(১) সে সব লোক– যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য।

(২) আসহাবুল ইয়ামীন– যারা ডান দিকে অবস্থানকারী।

(৩) যারা বাম দিকে অবস্থানকারী।

আলোচ্য আয়াত সমূহে উল্লেখিত এই তিন শ্রেণীর পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। (১) যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবে তাদের জন্যে চিরসুখ, চিরশান্তি, চির আনন্দ, চির আরাম, পবিত্র রিয্ক এবং জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের روح শব্দটির অর্থ আনন্দ এবং আরাম, এ ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহেদ (রহঃ) এবং সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রহঃ) আর যাহ্যাক (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মাগফেরাত এবং রহমত।

আলোচ্য আয়াতের ريحان শব্দটির অর্থ হলো পবিত্র রিজক, এ ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহেদ (রহঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রহঃ) এবং মোকাতেল (রহঃ)।

অন্যান্য তফসীরকারগণ লিখেছেন, রায়হান এমনি একটি সুগন্ধি যার ঘ্রাণ নেয়া হয়।

তফসীরকার আবু ইয়ালা (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয় সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে জান্নাতের সুগন্ধ পায়, এরপর তার রূহ কবজ করা হয়।

আবু বকর ওয়াররাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের روح শব্দটির অর্থ হলো দোযখ থেকে জান্নাত লাভ করা, আর ريحان শব্দটি দ্বারা চিরশান্তির কেন্দ্র বেহেশতে প্রবেশ করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۞ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ

(২) আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় (তবে তাকে বলা হবে) তোমার জন্যে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার উম্মতের ডান দিকের লোকদের সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাদের সম্পর্কে আদৌ কোন চিন্তা করবেন না, তারা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নিরাপদ রয়েছে। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হবেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক ডান দিকে অবস্থানকারী লোকদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন এবং তাদের নেক আমল সমূহ কবুল করবেন।

ফররা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ডান দিকের লোকদের পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করুন। অথবা এর অর্থ হলো, ডান দিকের লোকদেরকে বলা হবে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۞ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۞ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ

(৩) আর যদি মৃত ব্যক্তি অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাকে ফুটন্ত পানি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করতে হবে। যারা বেঈমান, পথভ্রষ্ট, দূরাত্মা, তাদের শাস্তি অবধারিত, ফুটন্ত পানি এবং দোযখের ভয়ংকর শাস্তিই তাদের পরিণতি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ۞ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

নিশ্চয় এ সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য, অতএব, (হে রসূল!) আপনার মহা মহিমান্বিত প্রতিপালকের মোবারক নামের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন, অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের স্মরণে তন্ময় থাকুন, তাঁর আদেশ মোতাবেক নামায আদায় করুন, তাঁর পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হাদীদ

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ① لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২) আসমান সমূহ এবং যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা এক আল্লাহ পাকেরই, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর তিনিই সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৩) তিনিই সকলের আগে, আর তিনিই সকলের শেষে, তিনিই প্রকাশ্য, আর তিনিই গুপ্ত, আর সব কিছুই তিনি জানেন উত্তম রূপে।

সূরা হাদীদ প্রসঙ্গে

এ সূরা মদীনায়ে মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ২৯, এতে ৫৪৪টি বাক্য ও ২,৪৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা হাদীদ মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে।[১]

অবশ্য কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণের মতে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ সূরা নাযিল হয়েছে মঙ্গলবার দিন, এ সূরায় লৌহ সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক লৌহ সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে, আর "হাদীদ" অর্থ লৌহ, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে "সূরাতুল হাদীদ"।

বর্ণিত আছে যে, এই মঙ্গলবার দিন হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবীল হাবিলকে হত্যা করেছিল।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় ইসলামী শরীয়তের বুনিয়াদী বিধি-নিষেধ এবং মৌলিক আকীদা তৌহীদ সম্পর্কে হেদায়েত রয়েছে, চরিত্র মাধুর্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ সূরায়। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, দ্বীন দুনিয়ার সঠিক কল্যাণ লাভের জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আত্মসংশোধনে ব্রতী হওয়া, চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করা।

এ সূরার মূল বক্তব্যকে তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করা যায়।

(এক) বিশ্ব জগৎ এক আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি, তিনি ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডল সব কিছুর একমাত্র মালিক। সব কিছুই রয়েছে তাঁর কর্তৃত্বাধীন, তাঁর কর্তৃত্বে কোন কিছুই শরীক নেই।

(দুই) সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, আল্লাহ পাকের দ্বীনকে কায়েম করার জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আত্মত্যাগের পরিচয় দেয়া।

(তিন) দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়, এর দ্বারা মানুষের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহে ব্যয় করাই কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮৮

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম এবং গুণাবলী বর্ণনা দ্বারা এ সূরা শুরু করা হয়েছে এবং একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে এবং সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং তাঁর একত্ববাদের সাক্ষী হয়ে আছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি এমন আদি যার পূর্বে কিছুই নেই, আর তিনি এমন শেষ, যার পরে আর কিছুই নেই। তিনি এমন প্রকাশ্য যে তাঁর কুদরত হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সর্বত্র, তিনি এমন গুপ্ত যে, মানব দৃষ্টি এমনকি অর্ন্তদৃষ্টিরও তিনি উর্দ্ধে।

সূরার পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন।

এ সূরার ফজিলত

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তার অন্তরে কোন প্রকার ওয়াস ওয়াসা উপলব্ধি করে, তবে সে যেন (এ সূরার নিম্নোক্ত) আয়াত গুলো পাঠ করেঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

(আবু দাউদ শরীফ, এতকান)

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ হযরত এরবাজ এবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাত্রে নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে সেই সূরা সমূহ পাঠ করতেন যার শুরুতে "সাব্বাহা" বা "ইউসাব্বিহু" শব্দটি রয়েছে।[১]

তিনি একথা ঘোষণা করেছেন যে, এ সূরায় এমনি একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত থেকেও উত্তম।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যে আয়াতের এ ফজিলত রয়েছে, তাহলো[২]

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

(এতকান)

১। এ সূরা সমূহ হলো হাদীদ, হাশর, ছফ এবং সূরায়ে জুমআ
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮৮
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৯৫

এ সূরার আমল

সূরায়ে হাদীদ লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে তীর এবং তরবারি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

জ্বর এবং ফোঁড়ার ব্যাপারেও এ সূরার আমল উপকারী হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা হাদীদ পাঠ করছে, তবে সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে আখেরাতের আলোচনা ছিল, আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে তৌহীদের কথা দিয়ে, তৌহীদের প্রতি ঈমানের উপরই আখেরাতের সাফল্য নির্ভরশীল, তাই এ দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক ঘণিষ্ঠতর।

অথবা উভয় সূরার সম্পর্ককে এভাবেও বর্ণনা করা যায়। পূর্ববর্তী সূরার শেষ কথা ছিল, (হে রসূল!) আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করুন, আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, আসমান যমীনের সব কিছু আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে'।

নিখিল বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, সব কিছুই তাঁর প্রশংসায় মুখর রয়েছে। আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এক কথায় সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

'সাত আসমান এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে'।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

'বস্তু মাত্রই আল্লাহ পাকের সপ্রশংস তসবীহ পাঠে রত রয়েছে। কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পারনা'।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে খাবার গ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু গুলো আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করতো এবং আমরা তা শ্রবণ করতাম।

হাদীস শরীফে একথাও রয়েছে, বৃক্ষের ডালাগুলো আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকে। যখন জিকর শেষ হয়ে যায় তখন ডালাগুলো শুকিয়ে যায় এবং পাতাগুলো ঝরে যায়। এর অর্থ যতক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকর অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ বৃক্ষ জীবিত থাকে, যখন জিকর থাকেনা তখন বৃক্ষও জীবিত থাকেনা।

এমনিভাবে হাদীস শরীফে একথাও রয়েছে, সাদা কাপড় আল্লাহ পাকের তাসবীহ করতে থাকে, যখন তা ময়লা হওয়া শুরু হয় তখন আল্লাহর জিকর বন্ধ হয়ে যায়। আর কাপড় পরিধানকারীও তা শরীর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যখন ঐ কাপড়কে পুনরায় পরিচ্ছন্ন পবিত্র করা হয় তখন তা পুনরায় জিকরে মশগুল হয়। মানুষ যখন গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করে তখন তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আলহামদুলিল্লাহ বের হয়ে পড়ে। সাদা ধবধবে বস্ত্র যখন আল্লাহর জিকর শুরু করে তখন পরিধানকারীর কলবের মধ্যেও তার শুভ-পরিণতি পরিলক্ষিত হয়।

হাদীস শরীফে একথাও রয়েছে, প্রবহমান পানি আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকে। যখন প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং পানি স্থবির হয়ে পড়ে তখন জিকর বন্ধ হয়ে যায়।

এমনিভাবে পাথর-কংকর, পাহাড়-পর্বত, সব কিছুই আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকে। পশু-পক্ষীও আল্লাহ পাকের জিকরে রত থাকে। প্রত্যেক প্রকারের পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। যেমন, হাদীস শরীফে রয়েছে, এক প্রকার পক্ষী আছে, যার তসবীহ হলো (যেমন কর্ম তেমন ফল)।

যাহোক, এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে পৃথিবীতে এমন কোন সৃষ্টি নেই, যা আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল নেই।

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

'কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পারেনা'।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক পাখীদের ভাষা বুঝবার তৌফিক দান করেছিলেন। এমনিভাবে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝতেন। কখনো কখনো তিনি তাদের

সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন, যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে, একবার একটি উষ্ট্র হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তাঁর কদম মোবারকে তার মাথা ফেলে দিল, তার চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরছিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি উষ্ট্রের মালিককে হাযির হওয়ার নির্দেশ দান করলেন। উষ্ট্রের মালিক হাযির হলো, তিনি তাকে বললেন, তোমার উষ্ট্র তোমার বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ করেছে,

এক, তুমি তার সাধ্যাতীত বোঝা তার পিঠে তুলে দাও।

দুই, তুমি তার প্রয়োজন মোতাবেক আহার সংস্থান করোনা, লোকটি অপরাধ স্বীকার করলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ভবিষ্যতে আর এমন অন্যায় করোনা। উষ্ট্রটি সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। হাদীস শরীফে এমন বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারনা।

আলোচ্য আয়াতে سبح শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে সূরা হাশর ও সূরা সফে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ তিনটি সূরাতেই অতীত কাল বোঝায় এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আর সূরা তাগাবুনে يسبح শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল বোঝায় এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সর্বকালে সর্বত্রই আল্লাহ পাকের হামদের তাসবীহ পাঠ করা হচ্ছে এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা হচ্ছে। আকাশে পাতালে সর্বক্ষণ সমগ্র সৃষ্টি জগত আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে।

কিন্তু অবাধ্য কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেনা। তাঁর পবিত্র নামের মহিমা ঘোষণা করেনা, তাতে কিছুই যায় আসেনা, কেননা কতিপয় অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ দূরাত্মা কাফেররাই আল্লাহ পাকের জিকর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র আধিপত্য নিরংকুশ ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে তাঁর প্রতিটি কর্ম হেকমত পূর্ণ তাৎপর্যবহ, কেননা তিনি প্রজ্ঞাময় তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা কখনো হয়না। তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়নে কোন কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারেনা, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আসমান যমীনের আধিপত্য তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু মুখে পতিত করেন, আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

অর্থাৎ আসমান যমীনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহ পাকই, তাঁর এ ক্ষমতায় কেউ শরীক নেই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে। সৃষ্টি ও লয় তাঁরই ইচ্ছায় হয়। সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতার স্বাক্ষী হিসাবে বর্তমান রয়েছে, নিখিল বিশ্বে তাঁরই আদেশ কার্যকর হয়, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেননা সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বও ছিল না, এক আল্লাহ পাকই সব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন, তাই সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন রয়েছে।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

'তিনি সকলের আগে আর তিনিই সকলের শেষে, তিনিই প্রকাশ্য আর তিনিই গুপ্ত, আর সব কিছুই তিনি জানেন উত্তম রূপে'।

তিনিই সব কিছুর পূর্বে, তাঁর পূর্বে কিছুই নেই

বর্ণিত আছে আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের দরবারে একবার এক খৃষ্টান ধর্ম যাজক উপস্থিত হয়েছিল, সে বলল আমার তিনটি প্রশ্ন আছে। যদি কোন মুসলিম আলেম আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো। যদি তারা আমার প্রশ্নের জবাব প্রদানে ব্যর্থ হন তবে তাদেরকে আমার ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তাকে বলা হলো আপনার প্রশ্ন উত্থাপন করুন। সে বললো, আপনারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেন। আমাকে বলুন,

এক আল্লাহর পূর্বে কি ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আল্লাহ পাক কোন্ দিকে চেয়ে আছেন?

তৃতীয় প্রশ্ন হলো আল্লাহ পাক এখন কি করছেন?

প্রশ্নগুলো সহজ নয়, তাই হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-কে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হলো। এজন্যে দিন তারিখ নির্ধারিত হলো। উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হলো, তখনকার গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কৌতূহল নিয়ে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হলেন। পাদ্রীকে মঞ্চে আরোহণ করে প্রশ্ন উত্থাপন করতে বলা হলো।

ইমাম সাহেব শ্রোতাদের মাঝে উপবিষ্ট রইলেন। ধর্মযাজক যখন একে একে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করলো তখন খলিফা মনসুরের আদেশক্রমে ইমাম সাহেব মঞ্চে আরোহন করলেন এবং খৃষ্টান ধর্মযাজক তাঁর স্থলে উপবিষ্ট হলো। ইমাম সাহেব তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে খৃষ্টান ধর্মযাজক! আপনি বলেছেন এক আল্লাহ পাকের পূর্বে কি ছিল? আমি আপনাকে বলতে চাই আপনি কি এক দু' সংখ্যা গণনা করতে পারেন? পাদ্রী বললো, পারি। এরপর সে এক থেকে একশত পর্যন্ত গণনা করলো। এরপর ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি এক থেকে একশত পর্যন্ত গণনা

করলেন এবার বলুন, এক এর পূর্বে কি ছিল? সে বললো, একের পূর্বে তো কিছুই ছিলনা। এক থেকেই সব কিছু শুরু করা হয়েছে। ইমাম সাহেব তখন বললেন, এতেই আপনার প্রশ্নের জবাব রয়েছে। এক আল্লাহ পাক থেকেই সব কিছুর শুরু। তিনি আদি, তিনিই প্রথম।

খৃষ্টান ধর্মযাজক বললো, ঠিক আছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিন। আল্লাহ কোন্ দিকে চেয়ে আছেন? ইমাম সাহেব বললেনঃ আপনি এই জ্বলন্ত বাতিটির দিকে তাকিয়ে বলুন বাতি কোন্ দিকে চেয়ে আছে? সে বললো, বাতি চরিদিকেই চেয়ে আছে। তখন ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহ পাক সকল নূরের কেন্দ্র, তাই তিনি চতুর্দিকেই চেয়ে আছেন।

সে বললো, আমার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দিন। আল্লাহ পাক এখন কি করছেন? ইমাম সাহেব বললেনঃ আল্লাহ পাক এইমাত্র আপনাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে নীচে বসিয়ে দিলেন এবং আমাকে উপরে উঠবার তওফিক দান করলেন। এ জবাবের পর ঐ ব্যক্তি নিরুত্তর হয়ে গেল এবং উপস্থিত সুধী জন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

বস্তুতঃ এক আল্লাহ পাকই আদি, তিনিই সর্বাগ্রে, তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না।

وَالْآخِرُ

তিনিই সর্বশেষ, তাঁর পরে কিছুই থাকবে না। সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। কিন্তু আল্লাহ পাক পূর্বে ছিলেন, এরপরেও থাকবেন কিন্তু তার লয় নেই, ক্ষয় নেই, তিনি চির বর্তমান।

সব কিছু লয় প্রাপ্ত হওয়ার পর শুধু আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বাই থাকবে। সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই ইতিপূর্বে ছিলনা, পরেও থাকবেনা।

وَالظَّاهِرُ

আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা প্রকাশ্য, তাঁর চেয়ে প্রকাশ্য কোন কিছুই নেই। সৃষ্টি মাত্রই তাঁর পবিত্র সত্ত্বার, তাঁর অস্তিত্বের, তাঁর একত্ববাদের জীবন্ত সাক্ষী। ঠিক দ্বিপ্রহরে কেউ সূর্যের দিকে তাকাতে পারেনা, কেননা সূর্যের উত্তাপ সইবার শক্তি মানব চক্ষুতে নেই ঠিক তেমনি জ্যোতির্ময় আল্লাহ পাককে কেউ দেখতে পারেনা, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

(তাঁকে কারো দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারেনা, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকেই পরিবেষ্টন করে আছেন।)

যেমন হযরত মূসা (আঃ) যখন দরবারে এলাহীতে তাঁর দীদার লাভের আরজী পেশ করেছিলেন তখন আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, তোমাকে দেখা দেবনা; বরং

বলেছিলেন, لن ترانى অর্থাৎ তুমি দেখতে পারবেনা। মানব চক্ষু দ্বারা আল্লাহ পাককে দেখা সম্ভব নয়।

তিনি সর্বাধিক প্রকাশ্য, তাই তাঁকে দেখা সম্ভব নয়; তবে যদি আল্লাহ পাক তা ইচ্ছা করেন তবে সম্ভব হতে পারে, যেমন শবে মে'রাজে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আল্লাহ পাককে দেখা যায় না কিন্তু তিনি তাঁর প্রিয় বন্দাদের হৃদয় জুড়ে আছেন, ক্ষণিকের জন্যেও তারা আল্লাহ পাককে ভোলেন না। হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) প্রতিদিন এক হাজার রাকাআত নফল নামায আদায় করতেন। পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বছরই রোজা রাখতেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি যে আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীতে এত কষ্ট করেন, আপনি কি তাঁকে দেখেছেন?

তিনি বললেন, না দেখলে কি এত কষ্ট করি?

মানব-মনের গভীরে সর্বাধিক প্রভাব আল্লাহ পাকেরই, আর নিখিল বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য আল্লাহ পাকেরই অথচ তাঁকে দেখা যায়না, তিনি ধরা-ছোঁয়ার উর্দ্ধে।

وَالْبَاطِنُ

আর তিনি গোপনও। কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। মরমী কবি তাই বলেছেনঃ

تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

"তুমি অন্তরে ধরা দাও, তুমি উপলব্ধিরও অতীত। তাই আমি বুঝতে পারলাম যে, এটিই তোমার পরিচয়"।

اے برون ازوهم قیل وقال من
خاك برفرق من تمثیل من

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কল্পনারও উর্দ্ধে, আমাদের কথা-বার্তারও অনেক উর্দ্ধে, তোমার কোন দৃষ্টান্ত নেই, তুমি তুমিই"।

মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেন,

اتصال بے تکیف بے قیاس
بست رب الناس راباجان ناس

'বন্দার সঙ্গে আল্লাহ পাকের সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু সে সম্পর্কের অবস্থা বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত'।

'মানুষের প্রাণের সঙ্গেই সম্পর্ক রয়েছে তার মুনীবের'।

جان نهاں درجسم داد ودرجان نهاں

ای نهاں اندر نهان ای جان جان

'তিনি মানব দেহের অভ্যন্তরে একটি প্রাণ গোপন করে রেখেছেন'।

আর সেই গোপন প্রাণের মাঝে আত্ম গোপন করে আছেন তিনি। তাই তিনি গোপনের চেয়েও গোপন এবং তিনি প্রাণেরও প্রাণ।

আর পবিত্র কোরআনে একথাটি এভাবে বলা হয়েছেঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন'।

তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ

আর তিনি সব কিছুই উত্তম রূপে জানেন, সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। বিশ্ব-জগতের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلُ التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَیْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَیْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا عَنِ الْفَقْرِ

'হে আল্লাহ! হে আসমান ও যমীনের মালিক! হে মহান আরশের মালিক! হে আমাদের প্রতিপালক! হে সব কিছুর প্রতিপালক! হে সেই পবিত্র সত্ত্বা!

হে তৌরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের অবতরণকারী! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে, যা তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছে। হে আল্লাহ! তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই নেই। আর তুমিই সকলের শেষে, তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই সমধিক প্রকাশ্য, তোমার উপর কিছুই নেই। তুমিই গোপন, তোমার চেয়ে গোপন কিছুই নেই, হে আল্লাহ! আমাদের করজ আদায় করে দিও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করো, যা তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, সৃষ্টি জগতের শুরু ও সারা সব কিছুর জ্ঞান এক আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। তেমনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞান তাঁরই রয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٤ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ۝٥ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٦ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ
اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ
لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨

তরজমা

(৪) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি আসমান যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠান করেছেন, তিনি জানেন যা কিছু ভূগর্ভে প্রবেশ

করে আর যা কিছু সেখান থেকে বের হয় এবং যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা তাতে আরোহন করে। আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী দেখছেন।

(৫) আসমান যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহর দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

(৬) তিনিই রাতকে দিনের মাঝে এবং দিনকে রাতের মাঝে প্রবিষ্ট করে থাকেন। তিনি মানুষের মনের সমস্ত কথা জানেন।

(৭) তোমরা ঈমান আন আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে তোমরা (আল্লাহর রাহে) ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করে তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার।

(৮) আর তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না? অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে ডাকেন এবং আল্লাহ পাক তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা মোমেন হও।

তফসীরুল কোরআন

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের, তাঁর আধিপত্য ও প্রভূত্বের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আসমান যমীন ছয় দিনে সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের মহান আরশের উপর অধিষ্ঠানের ঘোষণাও স্থান পেয়েছে। এ সম্পর্কে সূরায়ে আ'রাফে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ছয় দিনে আসমান যমীন সৃষ্টির প্রয়োজন হলো কেন আর যে ছয় দিনের কথা বলা হয়েছে তা কি দুনিয়ার ছয় দিনের সমান? নাকি আখেরাতের ছয় দিনের সমান?[১]

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا

'আল্লাহ পাক জানেন যা কিছু মাটিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু মাটি থেকে বের হয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে বের হয় এবং যা কিছু আসমানে উত্থিত হয়'।

১। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ২৫৯-৬২

এ সম্পর্কেও সূরা সাবায় আলোচনা হয়েছে।[১]

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী দেখছেন'।

আল্লাহ পাক বন্দার কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে থাকেন, পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আর এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তুমি এভাবে এবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ পাককে দেখছ, যদি তোমার মনের অবস্থা এমন না হয় যে তুমি তাঁকে দেখছ, তবে এ সত্য উপলব্ধি কর যে তিনি তোমাকে দেখছেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করলো সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেল (১) আল্লাহ পাকের এবাদত করলো (২) সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত আদায় করলো (৩) নিজের প্রবৃত্তিকে পবিত্র করলো। ঐ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু (আলাইহে ওয়াসাল্লাম!) প্রবৃত্তিকে কিভাবে পবিত্র করবো? তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমার মনে পরিপূর্ণভাবে এ বিশ্বাস রাখবে যে তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ পাক সর্বদা তোমার সঙ্গে রয়েছেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) সর্বদা কবিতার এ দু'টি কলি আবৃত্তি করতেন ঃ

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل
خلوت ولكن قل على رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة
ولا ان يخفى عليه يغيب

'যখন তুমি একা থাক, তখনও তুমি একথা বলবেনা যে তুমি একা রয়েছ, বরং তুমি একথা বল যে, তোমার উপর একজন নেগাহবান রয়েছেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাক'।

'কখনও একথা মনে করবেনা যে, আল্লাহ পাক তোমার সম্বন্ধে অবগত নন। কোন বিষয় যত গোপনীয়ই হোক, কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে তা গোপন নয়'।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

'আসমান যমীনের সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহর দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে'।

১। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড- ২২

অর্থাৎ আসমান যমীনের রাজত্ব ও আধিপত্য এক আল্লাহ পাকেরই, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর কবল থেকে পলায়ন করার শক্তি কারোই নেই, মানুষের মনের কথা তিনি জানেন, তিনিই তো রাতকে দিনের মাঝে, দিনকে রাতের মাঝে প্রবিষ্ট করে থাকেন। মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যা কিছু থাকে, সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۚ

'তোমরা ঈমান আন আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের উপর এবং আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে তোমরা (আল্লাহর রাহে) ব্যয় কর। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করে তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরষ্কার'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক দু'টি আদেশ দিয়েছেন (১) আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন, কেননা ঈমান ব্যতীত পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাতের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি রসূলের প্রতি ঈমান আনার তাগিদ করা হয়েছে, কেননা রসূলের উসিলা এবং রসূলের হেদায়েত ব্যতীত আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনাও সম্ভব নয় এবং আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করাও সম্ভব নয়। (২) এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহর রাহে দান কর, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান কর, কেননা অর্থ-সম্পদের ব্যবহারের জন্যে আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

অর্থ সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ পাক

মূলতঃ আল্লাহ পাকই অর্থ-সম্পদের প্রকৃত মালিক। তোমাদের জন্মের পূর্বে এ অর্থ-সম্পদ ছিল অন্যদের নিকট, তখন তারাই প্রকাশ্যে তার মালিক ছিল। এখন তোমরা মালিক হয়েছ ওয়ারিশ সূত্রে। যখন তোমরা পৃথিবীতে থাকবেনা, তখন অন্যরা এ ধন-সম্পদের অধিকারী হবে, তারা তা ভোগ করবে। অতএব অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার কোন যুক্তিই নেই, কেননা কেউ এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী এ জগত, ক্ষণভঙ্গুর এ জীবন, তাই ধন-সম্পদ কারোই নিজস্ব নয়। অতএব, বুদ্ধিমানের কাজ হলো আল্লাহ পাক প্রদত্ত সম্পদ তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ..... اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۚ

'অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং তার অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করে তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরষ্কার'।

অর্থ-সম্পদ যেমন তুমি পেয়েছ অন্যের কাছ থেকে ঠিক তেমনি অন্যরাও পাবে তোমার কাছ থেকে, অথচ হিসাব নিকাশের দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে। তাই পরিণামদর্শী মানুষের কাজ হলো আল্লাহর রাহে দান করা, যেন পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে সে সম্পদের বিনিময়ে পুরষ্কার লাভ করা যায়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা তাকাছুর পাঠ করে এরশাদ করেছেনঃ মানুষ বলে থাকে, এটি আমার মাল, এটি আমার সম্পদ অথচ তার সম্পদ শুধু এতটুকুই যা সে খায় অথবা পরিধান করে অথবা আল্লাহর রাহে দান করে। যা সে খেয়ে ফেললো তা শেষ হয়ে গেল, আর যা পোষাক পরিধান করলো তা পুরাতন হয়ে বেকার হয়ে গেল, আর যা সে আল্লাহর রাহে দান করলো তা তার সম্পদ হিসেবে রয়ে গেল (মুসলিম শরীফ)।

এতদ্ব্যতীত যা অবশিষ্ট থাকে তা মানুষকে পৃথিবীতে ছেড়ে চলে যেতে হয়। অতএব, আল্লাহর রাহে দান করার মধ্যে নিহিত রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। এজন্যেই আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

'যা তোমাদের নিকট রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে তা তাঁর নিকট বাকি থাকবে'।

আর আল্লাহর রাহে দান করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের নিকট জমা করে রাখা (আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন)।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

'আর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আননা? অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে ডাকেন এবং আল্লাহ পাক তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা মোমেন হও'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের এবং আল্লাহর রাহে দান করার নির্দেশ রয়েছে। আর এ আয়াতে ঈমান আনয়নে উদ্বুদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তোমাদের কি হলো, কেন তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আননা? ঈমান আনয়নে তোমাদের বাধা কোথায়? অথচ আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাচ্ছেন অহরহ। আর সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীত যত

মানুষের পদাচারণা হবে, সকলের রুহকে একত্রিত করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

"আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই"? সেদিন সকলেই বলেছিল ঃ "হ্যা হে পরওয়ারদেগার"! সেদিন প্রত্যেকেই অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের। যুগে যুগে নবী রসূলগণ আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে তাদের সে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে। অবশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হয়েছে। তিনিও মানুষকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ করা।

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ
مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ ۭ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۭ
اُولٰۗىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ۭ
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

তরজমা

(৯) তিনিই তাঁর বিশিষ্ট বন্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, অতীব দয়াবান।

(১০) আর তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহ পাকের রাহে ব্যয় কর না? অথচ আসমান যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, তারা অন্যের সমান নয়, তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ সে সব লোকের চেয়ে যারা (মক্কা বিজয়ের পর) অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ পাক সকলের কল্যাণের

প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিশেষ তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে যে, তোমাদের কি হলো, কেন তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আননা? অথচ আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান করছেন।

আর এ আয়াতেও অন্য ভঙ্গিমায় আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নে উদ্বুদ্ধ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ

আল্লাহ পাকই একান্ত দয়া করে তাঁর বন্দা তথা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহে নাযিল করেন অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ নাযিল করেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অনেক মোজেযাও দান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে যেন তিনি তোমাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার ঘন অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন, যেন তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পার, আত্ম-পরিচয় লাভ করতে পার, জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পার, যেন তোমরা জীবনের মালিকের পরিচয় পাও যিনি এ জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব দান করেছেন, তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পার। তোমাদের হেদায়েতের জন্যে রসূল প্রেরণ এবং পবিত্র কোরআন অবতারণ নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকারেই রেখে দিতে পারতেন কিন্তু করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত করুণার কারণে তিনি এমন রসূল তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন, যিনি সকল নবী রসূলগণের দলপতি এবং তিনি এমন আসমানী গ্রন্থ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। অতএব, এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে অগ্রসর হওয়া তোমাদের কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতে عبد শব্দ দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ দ্বারা পবিত্র কোরআন উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

অথবা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা সমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা সমূহকে এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, অতীব দয়াবান'।

আর সেই স্নেহ দয়ারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

'আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ পাকের রাহে ব্যয় কর না? অথচ আসমান যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই'।

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে ঈমান আনয়নের এবং আল্লাহর রাহে দান করার আহ্বান রয়েছে। এরপরের আয়াতে ঈমান আনয়নের তাগিদ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর রাহে দান করার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে, কেন তোমরা আল্লাহর রাহে দান কর না? অথচ আসমান যমীনের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক, যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে ছিল, তারা বর্তমানে নেই আর যারা বর্তমানে আছে তারা ভবিষ্যতে থাকবেনা, অবশেষে এক আল্লাহ পাকই থাকবেন, তিনিই মালিক, মুখতার, সকল ধন-সম্পদ তাঁর হাতেই পড়ে থাকবে, প্রত্যেককে তার সব কিছু ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। তাই সুস্থ বিবেকবান মানুষ স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আল্লাহর রাহে দান করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হতে পারে। সম্বল সংগ্রহ করতে পারে পরকালীন জীবনের, কেননা যারা আল্লাহর রাহে দান করে তারা আখেরাতে এর বিনিময়ে অশেষ সওয়াব লাভ করে।

আল্লাহর রাহে দান করার মাহাত্ম

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার একটি বকরী জবেহ করা হলো এবং তার গোশ্ত বিতরণ করা হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই বকরীটির কোন অংশ কি রয়ে গেছে? আরজ করা হলো, একটি হাত রয়েছে, আর সবই বিতরণ করা হয়েছে। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ হাতটি ব্যতীত সবই রয়ে গেছে অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহর রাহে দান করা হয়েছে তার সওয়াব রয়ে গেছে, আর যেহেতু এই হাতটি দান করা হয়নি, তাই এর সওয়াবও জমা হয়নি।

(তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার

নিজের অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারিশানের অর্থ-সম্পদ অধিকতর প্রিয়? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের অর্থ-সম্পদই অধিকতর প্রিয়। অর্থাৎ প্রত্যেকেই চায় যে, আমি অর্থ-সম্পদের অধিকারী হই। ওয়ারিশগণ সম্পদশালী হোক তা ততটা পছন্দনীয় নয় যতটা নিজে সম্পদশালী হওয়া পছন্দনীয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, প্রত্যেকের ধন-সম্পদ তাই, যা সে (মৃত্যুর পূর্বে) আল্লাহর রাহে দান করার মাধ্যমে সম্মুখে প্রেরণ করে। আর ওয়ারিশানদের সম্পদ তা, যা সে রেখে গেছে। (বোখারী শরীফ)

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, তারা অন্যের সমান নয়, তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সে সব লোকের চেয়ে যারা (মক্কা বিজয়ের পর) অর্থ ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ পাক সকলের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর রাহে দান করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা আল্লাহর রাহে দান করেছেন, তাদের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশেষ করে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবস্থান কালে হিজরতের সময়, হিজরতের পর মদীনায়ে মোনাওয়্যারায় এবং বদর, ওহোদ, খন্দকের যুদ্ধের সময় ছিল মুসলমানদের চরম সংকট মুহূর্ত। সে মুহূর্তে যারা আল্লাহর রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তাদের মর্তবা স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর হবে, কেননা স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যয় করা এবং চরম সংকটময় মুহূর্তে ব্যয় করা এক সমান হতে পারেনা। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাহে দান করেছে এবং ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছে তাদের ফজিলত ও মর্তবা অনেক বেশী। যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে, আল্লাহর রাহে দান করেছে এবং জেহাদ করেছে, তাদেরও মর্তবা স্বীকৃত। কিন্তু যারা মক্কা বিজয়ের

পূর্বে ইসলামের খেদমতে অবদান রেখেছে, তাদের মর্যাদা অধিকতর। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার মর্তবা অনুসারে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ফজিলত

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে ফজল তফসীরকার কালবী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তিনিই সর্ব প্রথম মুসলমান হয়েছেন, আর তিনিই সর্ব প্রথম আল্লাহর রাহে দান করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজের ঘটনা শ্রবণ করা মাত্র তার সত্যতা ঘোষণা করেছেন এবং কাফেরদেরকে এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের সিদ্ধান্ত হলে তাঁর পরিবারবর্গকে মক্কা শরীফে রেখে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হয়েছিলেন। সওর নামক গুহায় হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একমাত্র সাথী ছলেন। অনেক কোরায়শ নেতা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ ইসলামের খেদমতে আমার প্রতি যে যা এহসান করেছে, আমি তার এহসানের বদলা চুকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আবু বকরের এহসানের বদলা আমি দিতে পরিনি, কাল কেয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর এহসানের বদলা দান করবেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, কারো অর্থ-সম্পদ এত উপকার করেনি, যতটা আবু বকরের অর্থ-সম্পদ করেছে। (তিরমিজী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার স্থানীয় মুদ্রা ছিল, আর এ সমুদয় মুদ্রা তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আল্লাহর রাহে ব্যয় করেছেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কুখ্যাত আকাবা এবনে মুয়ীত কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখে তাঁর গলায় চাদর পেচিয়ে এমন টান দেয় যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দম আটকে যাওয়ার আশংকা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) দ্রুত বেগে এসে আকাবাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাক, যিনি সুস্পষ্ট দলীল এবং মোজেযা নিয়ে এসেছেন।

আবু আমরের বর্ণনায় রয়েছে, তখন কাফেররা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে অত্যন্ত বেশী প্রহার করে, তাঁর সর্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়। যখন তাঁকে বাড়ীতে আনা হয়, তখন তাঁর অবস্থা ছিল এই, মাথায় হাত রাখলে চুলগুলো উঠে যায়।

আবু আমর আরও বর্ণনা করেছেন, তখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যারা ইসলাম কবুল করতেন, তাদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। এমন নির্যাতীত সাতজন গোলামকে হযরত আবু বকর (রাঃ) আযাদ করে দিয়েছেন। হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত আমের এবনে ফোহায়রা (রাঃ) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর প্রচেষ্টায় তদানীন্তন মক্কার অনেক নেতৃস্থানীয় লোক ইসলাম কবুল করেছেন, যেমন বনী আবদুস শামসের নেতা হযরত ওসমান এবনে আফ্ফান (রাঃ), বণী আসাদ গোত্রের নেতা হযরত জোহায়ের (রাঃ), বনী যোহরা গোত্রের নেতা হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং বনী তামিম গোত্রের নেতা হযরত তালহা এবনে আবদুল্লাহ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তারা যখন নামায আদায় করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন তাদেরকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। হোদায়বিয়ার চুক্তির সময়ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়। এমনিভাবে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়, তখন মুসলমানদের চরম দুর্দিনে হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসলিম জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

মুরতাদদের ফেতনা, যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের ফেতনা হযরত আবু বকর (রাঃ) সঠিক ভাবে মোকাবেলা করেন এবং এ ফেতনাগুলোর মূলোৎপাটন করেন। তিনিই ইরাক ও সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর পরে হযরত ওমর (রাঃ)-কে খেলাফতের দায়িত্বের জন্যে নির্বাচন করেন।

এ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত প্রমাণিত হয়, কেননা তাঁরাই সর্বাগ্রে ইসলামের জন্যে জেহাদ করেছেন এবং আল্লাহর রাহে দান করেছেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকরিত, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবাদেরকে মন্দ বলোনা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ওহোদের পাহাড়ের সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তবে সাহাবাদের এক সের বা আধা সের খাদ্য দ্রব্য বা খেজুর দান করলে যে সওয়াব হয় তার সমানও হবেনা।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযয়ী বদলা দান করবেন।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ
اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

তরজমা

(১১) কে আছে যে আল্লাহ পাককে ঋণ দেবে উত্তম রূপে (খাঁটি অন্তরে), তা হলে তিনি বৃদ্ধি করবেন তার সওয়াব, অধিকন্তু তার জন্যে রয়েছে বিরাট পুরষ্কার।

(১২) (হে রসূল!) আর সেদিনটিও উল্লেখযোগ্য) যেদিন আপনি মোমেন পুরুষ ও নারীদেরকে দেখবেন যে তাদের সম্মুখে ও ডান দিকে নূর ছুটাছুটি করছে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ এমন জান্নাতের, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, তোমরা তাতে চিরদিন থাকবে, এটি বিরাট সাফল্য।

(১৩) সেদিন মুনাফেক পুরুষ নারীরা (পুলসিরাতে) মোমেনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্যে একটু অপেক্ষা কর, তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু আলো গ্রহণ করি। (তখন তাদেরকে) বলা হবে, তোমরা পেছনের দিকে যাও, আলোর সন্ধান কর, এরপর তাদের (মোমেন ও মুনাফেকদের) মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর- যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত আর বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্যে আহ্বান করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে আল্লাহ্ পাককে ঋণ দেয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

'কে আছে যে আল্লাহ পাককে ঋণ দেবে উত্তম রূপে (খাঁটি অন্তরে), তাহলে তিনি বৃদ্ধি করবেন তার সওয়াব, অধিকন্তু তার জন্যে রয়েছে বিরাট পুরষ্কার'।

আল্লাহর রাহে দান করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ পাককে ঋণ দেয়ার যে কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে ব্যয় করা। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্যে ব্যয় করা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ পর্যায়ে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো জেহাদে আল্লাহর রাহে দান করা এবং জেহাদের পর নিজেরাই যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ লাভ করা, এতদ্ব্যতীত এর বিনিময়ে আখেরাতে লাভ হবে বিরাট মর্যাদা।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে সাহায্যে করার, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার এবং দারিদ্র-পীড়িত মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রাহে ব্যয় করাকে কর্জ বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো আল্লাহ্ পাক এর বিনিময়ে জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটি যেন করজের ন্যায়ই একটি সৎ কাজ।

তফসীরকারগণের মতে, এর দ্বারা সেসব খাতে ব্যয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাতে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যে সব নফল আর্থিক এবাদত রয়েছে, এর দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

যাহোক, আয়াতের মূল ব্যক্তব্য হলো আল্লাহর রাহে দান করা, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করাই আল্লাহ্ পাককে ঋণ দেয়া। যে এভাবে আল্লাহর রাহে দান করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং অধিকন্তু জান্নাতে সে বিরাট পুরষ্কার লাভ করবে।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু দাহদাহ আনসারী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন এবং আরজ করলেন,

আমদের প্রতিপালক কি আমাদের নিকট ঋণ চেয়েছেন? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। তখন তিনি বললেন, দয়া করে আপনার হাতকে বাড়িয়ে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মোবারক হাত বাড়িয়ে দিলেন। হযরত দাহদাহ (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে হাত রেখে বললেন, আমার অমুক বাগান, যাতে ছয়শত খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, আমি তা আমার প্রতিপালককে দিয়ে দিয়েছি। তাঁর পরিবারবর্গ ঐ বাগানেই ছিল। তিনি ঐ বাগানের দরজায় এসে স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বললেন, আমি এ বাগান আল্লাহ পাকের দরবারে দিয়ে দিয়েছি, অতএব তোমরা বের হয়ে চলে আস। এরপর বললেন, সন্তানদেরকেও নিয়ে আস। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনি অনেক লাভজনক ব্যবসা করেছেন। তাঁর স্ত্রী শিশু সন্তানদেরকে নিয়ে জরুরী মালপত্র সহ বের হয়ে আসলেন। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, জান্নাতের বাগান এবং জান্নাতের ফলের গাছ সহ যার শাখা প্রশাখা হবে ইয়াকুত এবং মুক্তার, আল্লাহ পাক আবু দাহদাহকে দান করেছেন।[১]

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহর রাহে দান করাকে "করজ" শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করার মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, আল্লাহর রাহে দান করার বিনিময় অবশ্যই আদায় করা হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর এর বদলে আল্লাহ পাক অনেক মূল্যবান পুরষ্কার দান করবেন। মূল পুঁজি থেকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বা তার চেয়েও বেশী দান করা হবে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

'(হে রসূল!) সেদিনটিও উল্লেখযোগ্য) যেদিন আপনি মোমেন পুরুষ ও নারীদেরকে দেখবেন যে তাদের সম্মুখে ও ডান দিকে নূর ছুটোছুটি করছে। তাদেরকে বলা হবে, আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ এমন জান্নাতের যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, তোমরা তাতে চিরদিন থাকবে, এটি বিরাট সাফল্য'।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃষ্ঠা-১০৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা কান্দলভী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১২৬

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনার পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে এবং তাঁর জিকরে মশগুল রয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে আখেরাতে মোমেনগণকে যে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরশাদ হয়েছে, সেদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, যেদিন (হে রসূল!) আপনি দেখবেন, মোমেনদের সম্মুখে ও ডানে নূর ছুটোছুটি করছে। তৌহীদ ও রেসালতের প্রতি যারা ঈমান এনেছিল, তাদের জন্যে আজকের দিনে সুসংবাদ এমন জান্নাতের, যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ নূর হবে তৌহীদ ও রেসালতের প্রতি ঈমান আনয়নের।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যে নূরের কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, এ অবস্থা হবে পুলসিরাতের, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মোমেনগণ যেখানে থাকবে সেখানেই নূর থাকবে, আর এ নূর তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াতে সম্মুখে ও ডানে নূর থাকার কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর অর্থ মোমেনদের চতুর্দিকেই নূর থাকবে। এ ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে একখানি হাদীসে, যা বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্যে বের হতেন, তখন পথিমধ্যে এ দোয়া পড়তেন, হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর, নয়নে নূর, আমার কর্ণে নূর, আমার ডান দিকে নূর এবং আমার বাম দিকে নূর, আমার সম্মুখে নূর এবং আমার পেছনে নূর দান কর, আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত নূরে পরিণত কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মুসলিম শরীফ ও এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে এ দোয়ার উদ্ধৃতি রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে একথা সংযোজন করা হয়েছে, হে আল্লাহ! আমার পেছনে নূর দান কর, আমার জবানে নূর দান কর। এ দোয়া দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এই নূর চতুর্দিক থেকে হবে।

তফসীরকার যাহ্যাক ও মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, জান্নাতী মোমেন নারী পুরুষের সম্মুখে নূর ছুটোছুটি করবে এবং তাদের ডান হাতে আমলনামা থাকবে এবং তাদের নূরানী আমলের কারণে তারা সাফল্যমন্ডিত হবে।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মোমেনকে তাঁর আমল অনুযায়ী নূর প্রদান করা

হবে। পুলসিরাত পার হবার সময় কারো কারো নূর পাহাড়ের ন্যায় হবে, আর কারো কারো নূর খেজুরের বৃক্ষের ন্যায় হবে। সবচেয়ে কম নূর হবে সে ব্যক্তির যার আঙ্গুলের আংটিতে নূর থাকবে, কখনও তা প্রজ্জ্বলিত হবে, কখনও তা নিভে যাবে।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন কোন মোমেনের নূর এত দূর পর্যন্ত চমকাবে যেমন মদীনা শরীফ থেকে এডেন পর্যন্ত, আর কারো কারো নূর ইয়েমেনের রাজধানী সানআ পর্যন্ত, এরপর তা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।

আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে সংকলিত, হযরত বোরায়দা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যারা অন্ধকারে পদব্রজে মসজিদে যায় (ফজরের নামাজের জন্যে) তাদের জন্যে এ সুসংবাদ যে তারা কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূর লাভ করবে।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করবে, কেয়ামতের দিন ঐ নামাযগুলো তার জন্যে নূর হবে, দলিল হবে এবং তার নাজাত হবে। আর যে ব্যক্তি নামায সঠিকভাবে আদায় করবেনা, তার জন্যে নূরও হবেনা, দলিলও হবেনা, নাজাতও হবেনা। কেয়ামতের দিন সে কারুণ, ফেরাউন এবং হামানের সঙ্গে থাকবে।

হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তেবরানী সংকলন করেছেন এ মর্মে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন এ সূরাটি তার জন্যে নূর হয়ে যাবে। এ স্থান থেকে অর্থাৎ মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত যে দূরত্ব রয়েছে, এ দূরত্ব সম্পূর্ণ নূরই নূর থাকবে।

এবনে মরদবিয়া বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন তার পায়ের নীচ থেকে আকাশে মেঘের স্তর পর্যন্ত আলোকময় থাকবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কোরআনে করীমের একখানি আয়াত তেলাওয়াত করবে, কেয়ামতের দিন সে আয়াতই তার জন্যে নূর হয়ে যাবে।

দায়লামী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার প্রতি দরুদ পাঠ করতে থাক, এ দরুদ শরীফ পুলসিরাতে নূর হয়ে যাবে।

তেবরানী "আল আওসাতে" লিখেছেন, দুনিয়াতে যার চক্ষু বিনষ্ট হয়ে যায়, যদি ঐ ব্যক্তি নেককার হয়, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ঐ চক্ষুকে নূর করে দেবেন।

তেবরানী হযরত ওবাদা এবনে সামেতের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হজ্জের সময় মাথা মুন্ডানোর পর যদি একটি চুলও যমীনে পড়ে থাকে, তবে কেয়ামতের দিন তা নূর হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে আল্লাহ পাক তাকে এমন নূর দান করবেন, যা দ্বারা একটি দুনিয়া আলোকিত হবে। আল্লাহ পাক ব্যতীত তার সীমা কেউ জানেনা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, জুলুম থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা জুলুম হলো কেয়ামতের অন্ধকার।

بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ.....

আলোচ্য আয়াতের একথাটির অর্থ হলো, ফেরেশতাগণ মোলাকাতের সময় জান্নাতীদেরকে বলবেন, আজকের দিনে তোমাদের জন্যে সুসংবাদ এমন জান্নাতের যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। আর এ জান্নাতে তোমরা চিরদিন থাকবে, এটি বিরাট সাফল্য।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন মুনাফেক নর-নারীরা মোমেনদেরকে বলবে, "আমাদের জন্যে একটু অপেক্ষা কর", তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু আলো সংগ্রহ করি, তখন মুনাফেকদেরকে বলা হবে, তোমরা পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। এরপর মোমেন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, যার দরজা রয়েছে, ঐ দরজার অভ্যন্তরে রহমত থাকবে, কেননা সেখানে মুসলমানগণ থাকবে, আর ঐ দরজার বর্হিভাগে থাকবে আযাব, কেননা সেখানে মুনাফেকরা থাকবে।

তফসীরকার কালবী (রঃ) এবং এবনে আবি হাতেম (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক অন্ধকার করে দেবেন, যার কারণে মোমেন ও তার হাত দেখবেনা এবং কাফেরও কিছুই দেখবেনা। অবশেষে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে তাদের আমল অনুপাতে আলো দান করবেন। মুনাফেকরা মোমেনদের পেছন পেছন চলতে চেষ্টা করবে এবং বলবে, একটু অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের আলো থেকে উপকৃত হতে চাই, কিন্তু তখন মুনাফেক ও

কাফেরদেরকে আলো দেয়া হবেনা, যেমন দুনিয়াতে কোন চক্ষুস্মান ব্যক্তির চোখের আলো দ্বারা কোন অন্ধ আলো লাভ করেনা। তখন মুনাফেকরা মোমেনগণকে বলবে, তোমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, যেন আমরা তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারি। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। তারা পেছনে যাবে তবে সেখানে আলো পাবেনা, এরপর ফিরে আসবে মুসলমানদের নিকট, কিন্তু দেখবে মুসলমানদের ও তাদের মধ্যে বিরাট প্রাচীর বর্তমান রয়েছে, যে কারণে তারা মুসলমানদের নিকট পৌঁছতে পারবে না।

এবনে জরীর ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবে তখন আল্লাহ পাক হঠাৎ আলো দান করবেন, তখন মোমেনরা ঐ আলোয় চলতে থাকবে, ঐ আলো মোমেনদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পথ দেখাবে। ঐ সময় মুনাফেকরা মোমেনদের পেছনে চলতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাদের জন্যে পথে অন্ধকার থেকে যাবে, নূর থাকবে না।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মোমেনদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নূর দেয়া হবে, যার আলোতে তারা পুলসিরাত পার হবে। মুনাফেকদেরকেও আলো দেয়া হবে, তবে তা হঠাৎ ছিনিয়ে নেয়া হবে, কেননা তারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে ঈমানদার বলে ধোকা দিয়েছে, তারা প্রকৃত ঈমানদার ছিল না, ছিল মুনাফেক।

হাতেম ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক তৌহীদপন্থীকে নূর দান করা হবে, কিন্তু মুনাফেকদের নূর নিভিয়ে দেয়া হবে, মুনাফেকদের এ অবস্থা দেখে মোমেনগণ শংকিত হবে, এজন্যে তারা বলবে,

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا

হে পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও। তেবরানীও অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা পেছনে ফিরে যাও। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, একথাটি মোমেনগণ মুনাফেকদেরকে বলবে।

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন একথাটি ফেরেশতাগণ বলবে। আর পেছনে ফিরে যাওয়ার অর্থ হলো তোমরা দুনিয়াতে ফিরে যাও, আর ঈমান অর্জন কর, মারেফাত হাসিল কর। চরিত্র মাধুর্যের গুণ অর্জন কর, প্রকৃতপক্ষে এ নূর হল, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ
غَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ أَلَمْ
يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ
الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

তরজমা

(১৪) মুনাফেকরা মোমেনগণকে সম্বোধন করে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মোমেনগণ বলবে হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ এবং তোমরা অপেক্ষা করছিলে (আমাদের বিপর্যয়ের) আর তোমরা সন্দিহান ছিলে এবং তোমাদের অলীক আকাঙ্ক্ষা সমূহ তোমাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। অবশেষে আল্লাহ পাকের নির্দেশ এসে পৌঁছেছিল এবং প্রতারক (ইবলিস শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।

(১৫) আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রকার মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং কোন কাফের থেকেও না, দোজখই তোমাদের আবাস স্থল, চিরদিনের জন্যে তাই তোমাদের সাথী, (প্রকৃতপক্ষে) তা অত্যন্ত বড় নিকৃষ্ট স্থান।

(১৬) আর মোমেনদের জন্যে সে সময় কি এখনো আসেনি? যে তাদের হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হবে আল্লাহ পাকের স্মরণে এবং যে সত্য তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে। আর ইতিপূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল মোমেনগণ যেন তাদের ন্যায় না হয়, তারা বহুদিন অবকাশ পেয়েছিল কিন্তু তাদের হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়, এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবাধ্য নাফরমান ছিল।

(১৭) জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক শুষ্ক মৃত যমীনকে পুনর্জীবন দান করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে নিদর্শনগুলো তন্ন তন্ন করে ব্যক্ত করলাম, হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামতের কঠিন দিনে মুনাফেকরা মুসলমানদের আলোতে চলতে চাইবে। কিন্তু তাদের মাঝে এবং মুসলমানদের মাঝে প্রাচীর দিয়ে দেয়া হবে, তারা অন্ধকারে পড়ে থাকবে।

আখেরাতে মুনাফেকদের দূরবস্থা

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

তখন মুনাফেকরা মোমেনগণকে বলবে, আমরা কি দুনিয়াতে তোমাদের সাথী ছিলাম না? তখন মোমেনগণ মুনাফেকদেরকে বলবে, তোমরা দুনিয়াতে নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে সত্য এবং ঈমানদার বলে দাবী করতে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় তোমরা ঈমানদার ছিলে না। তোমরা ঈমানের কথা প্রকাশ করতে অথচ মনে মনে তোমরা ছিলে বেঈমান। তোমরা মিথ্যাবাদীতার পথ অবলম্বন করেছিলে, মিথ্যা শপথের আড়ালে থেকে মুসলমানদের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছিলে, তোমাদের ধারণা ছিল অদূর ভবিষ্যতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মুসলমানদের দুর্দিন আসবে এবং তোমরা তখন মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের সুযোগ পাবে। মূলতঃ তোমরা অলীক আকাঙ্ক্ষার মোহে আচ্ছন্ন ছিলে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তোমাদের যে দুরাশা ছিল তা কখনো পূর্ণ হয়নি। ইবলিস শয়তান বা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ তোমাদেরকে প্রতারিত করে রেখেছিল। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তোমরা চিরস্থায়ী মনে করেছিলে। একদিন পুনর্জীবন হবে এবং জীবনের হিসাব দিতে হবে, একথা তোমরা বিশ্বাস করনি, বরং এতে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন যে, শয়তান তাদেরকে সর্বদা ধোঁকায় রেখেছিল, ফলে তারা প্রকৃত মোমেন হয়নি।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রকার মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং কোন কাফের থেকেও না, দোযখই তোমাদের আবাস স্থল। চিরদিনের জন্যে তা-ই তোমাদের সাথী। (প্রকৃতপক্ষে) তা অত্যন্ত বড় নিকৃষ্ট স্থান।

অর্থাৎ আজ তোমাদের নাজাতের কোন পথ নেই। দোযখের শাস্তি থেকে তোমরা অব্যাহতি লাভ করবে না। এ উদ্দেশ্যে তোমাদের পক্ষ থেকে কোন মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবেনা। এমনকি, যে কাফেররা সারা জীবনই কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল, কখনো নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেনি, তাদের থেকেও কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা।

مَاْوٰكُمُ النَّارُ

দোযখই তোমাদের আবাসস্থল। আর এটিই তোমাদের যোগ্য স্থান। তোমরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে দোযখের উপকরণ সংগ্রহ করেছ, আজ তাই দোযখই তোমাদের চির সাথী হলো। এটি তোমাদের চির ঠিকানা, কত জঘন্য এই ঠিকানা।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

'আর মোমেনদের জন্যে সে সময় কি এখনো আসেনি? যে, তাদের হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হবে আল্লাহ পাকের স্মরণে এবং যে সত্য তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে। আর ইতিপূর্বে যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল, মোমেনগণ যেন তাদের ন্যায় না হয়, তারা বহু দিন অবকাশ পেয়েছিল কিন্তু তাদের মন পাষাণ হয়ে যায় এবং তাদর অধিকাংশই অবাধ্য নাফরমান ছিল'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হাশরের ময়দানের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুনাফেকরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় অস্থির হয়ে মোমেনদেরকে ডাকবে এবং বলবে, আমাদের জন্যে একটু অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাদের আলোতে চলবো। কিন্তু তাদেরকে এর অনুমতি দেয়া হবেনা, কেয়ামতের ময়দানে যে নূর বা আলো পাওয়া যাবে তা হবে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের আলো, যারা দুনিয়াতে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে গাফলত করেছে, তারা ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত হবে।

গাফলত পরিহার কর

আর এ আয়াতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে তোমরা কাফের ও মুনাফেকদের ন্যায় গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়োনা, যদি দুনিয়াতে এ সম্পর্কে গাফলত করা হয়, তবে আখেরাতে ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আর একথাও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে তথা ইহুদী নাসারারা দুনিয়ার জীবনের আনন্দ-উল্লাসে অতিবাহিত করেছে, আর এ অবস্থায় সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়, পরিণতিতে তাদের ঈমান, তাকওয়া-পরহেযগারী এবং আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সকল যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলে।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেনঃ মোমেনদের জন্যে কি সে সময় এখনও আসেনি? যে তাদের হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হবে আল্লাহ পাকের জিকরের জন্যে এবং আল্লাহ পাক যা কিছু তার মহান বাণী থেকে নাযিল করেছেন, তা শ্রবণের জন্যে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কোরআনে করীম নাযিল হওয়ার তের বছর পর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমনি ধমক এসেছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সর্ব প্রথম যে কল্যাণটি আমার উম্মত থেকে বিদায় নেবে তা হলো আল্লাহর ভয়। এরপর তিনি এরশাদ করেছেন, তোমরা ইহুদী নাসারাদের ন্যায় হয়োনা, যারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করেছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে, আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ফেলে রেখেছে এবং তাদের কল্পনা-প্রসূত মত ও পথ গ্রহণ করেছে এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলেছে। তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে পাষাণ করে দিয়েছেন, আল্লাহ ও রসূলের কথা শ্রবণে তাদের মন নরম হয়না, কোন ওয়াজ নসিহত উপদেশ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেনা, তাই তাদের মনের জগতে পরিবর্তন আসেনা।

শানে নুযুল

বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর প্রথম প্রথম আহলে কিতাবরা তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতো, প্রভাবিত হতো তাদের অন্তর, কিন্তু কিছু দিন পর দেখা গেল তাদের গাফলত বা উদাসীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দুনিয়া

আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করছেনা এবং নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করছেনা। তাই আলোচ্য আয়াতে মোমেনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, মোমেনগণ যেন আহলে কিতাবের ন্যায় কঠোর-অন্তর বিশিষ্ট না হয়। তারা যেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসরণ করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হয়।

এবনে আবি শায়বা এবং এবনে আবি হাতেম মোকাতেল এবনে হাব্বানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন সাহাবী হাসি-ঠাট্টায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে যখন একটু গাফলত দেখা দেয় তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

আ'মাশ (রঃ) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম হিজরতের পূর্বে অত্যন্ত কষ্টে ছিলেন। হিজরতের পর কিছুটা সুখ আরাম ও শান্তি পাওয়া যায়। এজন্যে কোন কোন কাজে গাফলত পরিলক্ষিত হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে আবি হাতেম তফসীরকার সুদ্দী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কয়েকজন সাহাবীর মধ্যে গাফলত পরিলক্ষিত হয়, তখন আল্লাহ পাক নাযিল করেন, اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْث আয়াতখানি। এর কিছুদিন পর আরও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

কালবী ও মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হিজরতের এক বছর পর মুনাফেকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হলো, কিছু লোক হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর নিকট এই আবেদন করলো যে তৌরাতে অনেক বিস্ময়কর কথা আছে, আমাদের নিকট তৌরাতের কথা বর্ণনা করুন, তখন نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ নাযিল হয়। এ জবাব শ্রবণ করে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম বার বার প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন। মুনাফেকরা দ্বিতীয়বার হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর নিকট একই প্রশ্ন করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

ইহুদী নাসারারা তাদের নিকট অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সম্পর্কে যে গাফলত করেছে, হে মোমেনগণ! তোমরা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এমন গাফলত করোনা কেননা, এটি হলো মহা সত্য।

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

'আর তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল অবাধ্য, পাপীষ্ঠ, দ্বীন থেকে বহিস্কৃত'।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

'জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পাক শুস্ক মৃত যমীনকে পুনর্জীবন দান করেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে নিদর্শনগুলো তন্নতন্ন করে ব্যক্ত করলাম, হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে'।

এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেভাবে পৃথিবী যখন খরার কারণে মৃত শুস্ক হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। ধরণীকে পুনর্জীবন দান করেন। ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক আল্লাহর জিকর ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মানব মনকেও পুনর্জীবন দান করেন। পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত, আল্লাহ পাকের জিকর এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে মৃত অন্তরকে জীবিত করেন।

অথবা এর অর্থ হলো, যেভাবে আল্লাহ পাক মৃত শুস্ক যমীনকে বৃষ্টির মাধ্যমে পুনর্জীবিত করেন, ঠিক এমনিভাবে মৃত মানব জাতিকে কেয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করবেন। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে আমার আয়াত সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, হয়তো তোমরা সত্য অনুধাবন করবে।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ
الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ وَالشُّهَدَاۗءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۭ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾ اِعْلَمُوْٓا
اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ
فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৮) নিশ্চয় সদকা দানকারী পুরুষ ও সদকা দানকারী নারী এবং যারা আল্লাহ পাককে ধার দেয় উত্তম ভাবে, তারা বহু গুণ পরিমাণে প্রতিদান পায়। আর তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরষ্কার।

(১৯) আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ, তাদের জন্যে রয়েছে নূর ও সওয়াব। পক্ষান্তরে, যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।

(২০) জেনে রাখ, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন খেল-তামাশা, সাজ ও সৌন্দর্য, পরস্পরের বড়াই, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর দৃষ্টান্ত হলো সে বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শষ্য-সম্ভার কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ছলনাময়, ভোগ-বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

যারা ফকীর মিসকীন, দারিদ্র-প্রপীড়িত, বিপদগ্রস্ত মানুষকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান খয়রাত করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে বহু গুণে সওয়াব দান করবেন। এমনিভাবে যারা আল্লাহকে উত্তমভাবে ধার দেয়, অর্থাৎ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে, ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসারে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে বহু গুণ সওয়াব দান করবেন। তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরষ্কার। কী নারী কী পুরুষ যে কেউ এমন সৎ কাজ করবে তার জন্যে রয়েছে অশেষ সওয়াব, বিশেষ মর্যাদা, আর সে মর্যাদার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যেঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ

তারাই উচ্চ মর্যাদার দিক থেকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ।

মূলতঃ যারা খালেছ নিয়তে একনিষ্ঠ চিত্তে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করে, কারো প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার লোভে নয়; বরং শুধু আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যেই দান খয়রাত করে, আল্লাহ পাক

ব্যতীত কারো নিকট এর কোন বদলা চায়না, তাদের জন্যেই আলোচ্য আয়াতে বহু গুণ সওয়াবের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং মহা পুরষ্কারের ঘোষণা রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে সিদ্দীক বলা যেতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে তারা খাঁটি মোমেন বলে পরিচিত ও পরিণত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের صديقون শব্দটি صديق শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে আগত যাবতীয় খবরকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপনকারী। অর্থাৎ প্রকৃত মোমেন খাঁটি, নিখুঁত, নিখাদ ঈমানদার ব্যক্তিকেই صديق বলা যেতে পারে।

এ আয়াতের প্রেক্ষিতেই তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যে কেউ আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ঈমান আনে, তাকেই সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়।

আমর এবনে মাইমুন বলেছেন, সিদ্দীকের আরো একটি বিশেষ অর্থ আছে যার মধ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের কারণে বিশেষ গুণ সৃষ্টি হয়, তাকেই সিদ্দীক বলা হয়। এদিক থেকে বিচার করলে মোমেন মাত্রকে সিদ্দীক বলা যাবেনা, যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

এ আয়াতে সিদ্দীক তাদেরকেই বলা হয়েছে যারা এসব গুণের অধিকারী।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামই সিদ্দীকের মর্তবা পেয়েছেন, কেননা নবুওয়্যতের যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে তারা যেন নিমজ্জিত ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঈমানের সাথে দেখেছে, সে-ই এ গুণ অর্জন করেছে। 'সিদ্দীক' শব্দটির ব্যবহার আরও বিশেষ অর্থে হয়, যে অর্থের প্রেক্ষিতে হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন, আমিই বড় সিদ্দীক। এজন্যে তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় আটজন সিদ্দীক ছিলেন, যাঁরা সর্বপ্রথম এ পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (১) আবু বকর (রাঃ) (২) আলী (রাঃ) (৩) যায়েদ (রাঃ) (৪)

ওসমান (রাঃ) (৫) তালহা (রাঃ) (৬) যোবায়ের (রাঃ) (৭) সা'দ (রাঃ) (৮) হামজা (রাঃ)। এরপর তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ)।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ দু'টি মত পোষণ করেন (১) যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই সিদ্দীক। আর এ মত পোষণ করেন মুজাহেদ (রঃ)। (২) এ আয়াতটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যারা বিশেষ গুণের অধিকারী, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা উচ্চ মর্যাদায় আসীন, তারাই সত্যিকার অর্থে সিদ্দীক। এরপর ইমাম রাজী (রঃ) উপরোল্লিখিত সুবিখ্যাত, স্বনামধন্য নয়জন সাহাবায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করেছেন।[২]

وَالشُّهَدَاءُ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাক ও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তথা তৌহীদ ও রেসালতের প্রতি সাক্ষ্যদাতা, অথবা কেয়ামতের দিন সকল উম্মতের উপর যারা সাক্ষ্য প্রদান করবেন। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মসরুক (রঃ) সহ তফসীরকারগণের একটি দল। আর এ প্রেক্ষিতে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আলোচ্য আয়াতের الشهداء শব্দটির অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরাম, কেননা আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামকে শহীদ (সাক্ষী) বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

الشهداء শব্দটি شهيد শব্দটির বহুবচন। মোকাতেল এবনে সোলায়মান বলেছেন, যে আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে সে-ই শহীদ।

আল্লামা আলুসী (রঃ) হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ)-এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মোমেনগণই شهداء অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর নিকট যারা বসেছিলেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩০৬
তফসীরে কবীর, খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৩১
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২৩১

كلكم صديق وشهيد

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললেন, আপনি কি বলছেন? তখন তিনি আলোচ্য আয়াত وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ তেলাওয়াত করে বললেন, তোমরা এ আয়াত পাঠ কর।

আমর এবনে মুরারা জুহানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো, আমি যদি সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, আর যথা নিয়মে যাকাত আদায় করি এবং মাহে রমজানের রোজাব্রত পালন করি, তখন আমার অবস্থান কোথায় হবে? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমার অবস্থান হবে সিদ্দীক ও শহীদদের মধ্যে।[১]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

'আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই হবে দোযখের অধিবাসী'।

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াতে রয়েছে, কাফের মুশরেক বেদ্বীনদের জন্যে দোযখের শাস্তির ঘোষণা। যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তারাই হবে দোযখবাসী, তারা চিরদিন দোযখে থাকবে।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

'জেনে রাখ, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন খেল-তামাশা, সাজ ও সৌন্দর্য, পরস্পরের বড়াই, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

দুনিয়ার জীবনের হাকীকত

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল না হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, এর সব কিছু যে নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৮৩

হয়েছে। প্রতিনিয়ত আমরা যা দেখি, তা হলো মানব জীবনের শৈশবে থাকে খেলাধূলা এবং কৈশোরেও খেলাধূলার পাশাপাশি কৌতুক-তামাশাতে বাড়াবাড়ি, আর যৌবনে রয়েছে সাজ-সজ্জা এবং অর্থ-সম্পদ, মান মর্যাদা বৃদ্ধির লড়াই, অর্থ লিপ্সা, যশ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিযোগিতা। এরপর মৃত্যুর পূর্বে সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যত চিন্তা, হারানো স্বাস্থ ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা, এইতো মানব জীবনের অবস্থা। এ সকল অবস্থায় মানুষ যে সত্যটি ভুলে যায়, তা হলো কিছু দিন পূর্বেও সে এ পৃথিবীর অধিবাসী ছিলনা, আর কিছুদিন পরও এখানে সে থাকবেনা, তাকে অবশ্যই পাড়ি জমাতে হবে পরপারের উদ্দেশ্যে। এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হয়েছে তার এ পৃথিবীতে আগমন, আর তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিতেই তাকে এ পৃথিবী থেকে গমনও করতে হবে, অযথাই সে দুদিনের জিন্দেগীতে মত্ত হয় খেলাধূলায়, সাজ-সজ্জায়, কৌতুক-তামাশায়, ঝগড়া-ফ্যাসাদে, কলহ-দ্বন্দে। আর এ কারণে সে ভুলে থাকে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে, বিস্মৃত হয় তার নিশ্চিত পরিণতিকে, আর এ বিস্মৃতির কারণেই সে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করেনা, দুনিয়ার জীবনের সম্পদ সংগ্রহে থাকে ব্যস্ত মুগ্ধ মত্ত। পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, ভবিষ্যতের জন্যে কোন সম্বল সংগ্রহ করেনা, তার সকল স্বপ্ন সাধ ও আরাধনা এ জীবনের উন্নতি অগ্রগতির জন্য থাকে নিবন্ধ। হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পরোয়ানা আসে, বিদায় নিতে হয় তাকে সকল আপনজন থেকে, যা কিছু অর্জন করেছে, সবই রেখে যায় মাটির উপরে এবং নিঃস্ব হয়ে চলে যায় মধ্যলোকে, আর এভাবে জীবন সাধনা হয় ব্যর্থ। আলোচ্য আয়াতে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রকৃত মমার্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী, কল্যাণকামী তারা এ অস্থায়ী দুনিয়ার সুকঠিন ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে আখেরাতকে ভুলে যায়না, আল্লাহ ও রসূলের বিধানকে অমান্য করেনা, বরং তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, আর এ ঈমানের দাবী মোতাবেক সৎ কাজে ব্যাপৃত হয়, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সম্বল সংগ্রহ করে।

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ

'এর দৃষ্টান্ত হল সেই বৃষ্টি যা দ্বারা উৎপন্ন শষ্য সম্ভার কৃষকের মনকে আনন্দ দেয়, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়, আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি'।

দুনিয়া যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে অতি সত্ত্বর এখানের সকল সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য হারিয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্তই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আলোচ্য

আয়াতের غَيْث শব্দটির অর্থ হলো এমন বৃষ্টি যা এ সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার পর পাওয়া যায়। অনেক দিন পর যখন বৃষ্টিপাত হয়, সুন্দর সবুজ তরুলতা যখন উৎপন্ন হয় তখন কৃষকের মন আনন্দে ভরে ওঠে, কিন্তু কয়েক দিন পরই তা শেষ হয়ে যায়, সকল শষ্য-শ্যামলিমা খড়কুটোয় পরিণত হয়, মানব জীবনও ঠিক তেমনিই, শৈশব কৈশোর যৌবন ফুলের মত মনে হয়। যেখানে আনন্দ উল্লাসে পরিপূর্ণ থাকে, এর কিছুদিন পরই দেখা দেয় বার্ধক্য, অবশেষে মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান কার্যকর হয় এবং সব কিছুর অবসান ঘটে।

যারা কাফের তারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও জীবন-সামগ্রীর সন্ধানে ব্যস্ত হয়। তাই তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের শাস্তি। যারা প্রকৃত মোমেন, তারা এই দুনিয়ায় ব্যস্ততার পাশাপাশি আখেরাতের জীবনের সম্বল সংগ্রহ করতে থাকে, তাই তাদের শুভ পরিণতি হলো ঃ

وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তারা লাভ করে মাগফেরাত এবং তাঁর সন্তুষ্টি। যারা এ জীবনে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করেনা, দুনিয়া তাদের জন্যে ছলনাময় একটি বোঝা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

(এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ছলনাময় ভোগ বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।)

পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ায় বাজার থেকে আখেরাতের সওদা ক্রয় করে, তাদের জীবন-সাধনা হয় সার্থক এবং সুন্দর।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ
الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ
يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ
ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ
اٰتٰىكُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِۨ ﴿٢٣﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২১) তোমরা ছুটে আস তোমাদের প্রতিপালকের মাগফেরাতের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা তৈরী করা হয়েছে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলগণের উপর বিশ্বাসীদের জন্যে, এটি আল্লাহ পাকের দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন, আর আল্লাহ পাক মহা অনুগ্রহশীল।

(২২) পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিপদই আসুক না কেন, আমি তা সংঘঠিত করার পূর্বেই তা কিতাবের মধ্যে লিখিত থাকে। নিশ্চয় তা আল্লাহ পাকের পক্ষে অতি সহজ।

(২৩) তা এজন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ তার জন্যে যেন দুঃখবোধ না কর এবং যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তার জন্যে যেন তোমরা উল্লাসে ফেটে না পড়, আর আল্লাহ পাক কোন অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।

(২৪) যারা এমন যে (সৎ কাজে) নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরকেও কৃপণতা করতে বলে, আর যে (সত্য ধর্ম থেকে) বিমুখ হবে তার জানা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

তফসীরুল কোরআন

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এ ক্ষণস্থায়ী জগত ছলনাময়, ভোগ-বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, অতএব তোমরা আল্লাহ পাকের মাগফেরাত লাভের জন্যে ছুটে যাও এবং অনতিবিলম্বে এমন জান্নাত লাভের জন্যে সচেষ্ট হও যার প্রস্থ হলো আসমান ও পৃথিবীর আয়তনের সমান। অর্থাৎ সাত আসমান ও সাত যমীন যদি একত্রিত করা হয়, তবে তা জান্নাতের প্রস্থের সমান হবে।

আলোচ্য আয়াতে জান্নাতের প্রস্থের কথা বলা হয়েছে, কেননা এর দ্বারা দৈর্ঘ্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

অথবা এর কারণ হলো, যখন জান্নাতের প্রস্থই সাত আসমান ও সাত যমীনের সমান, তবে দৈর্ঘ্য কত বেশী হবে তা সত্যিই কল্পনাতীত, কেননা প্রস্থ থেকে দৈর্ঘ্য সর্বদাই অধিক হয়।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতে জান্নাতের প্রস্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তবে দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বলা হয়নি এজন্যে যে, মানুষ পৃথিবীতে বাস করে, আসমানকে সে সর্বদা দেখে, তাই পৃথিবী ও আসমানের দৃষ্টান্ত দিয়ে জান্নাতের প্রস্থ বর্ণনা করা হয়েছে। জান্নাত এত দীর্ঘ যে তার দৃষ্টান্ত দেয়ার মত এমন কিছু নেই, যা মানুষের বোধগম্য হতে পারে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) سَابِقُوْا শব্দটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের মাগফেরাত হাসিলের জন্যে তোমরা অতি সত্ত্বর সচেষ্ট হও। মালাকুল মউত আজরাঈল (আঃ) পৌছার পূর্বে যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের প্রতিপালকের মাগফেরাত হাসিলের চেষ্টা কর, কেননা আজরাঈল (আঃ) এসে গেলে আর মাগফেরাত হাসিল করা সম্ভব হবেনা, মৃত্যুর কারণে মানুষের কর্মের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, ইবলিস শয়তান তোমাদেরকে প্রতারিত করার পূর্বে তোমরা দ্রুত আল্লাহ পাকের মাগফেরাত লাভের সাধনায় রত হও, কেননা ইবলিস শয়তান অনেক আদম-সন্তানকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অতএব, আল্লাহ পাকের মাগফেরাত লাভের সাধনায় রত হও, এতটুকু বিলম্ব করোনা।[১]

أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

অর্থাৎ যে জান্নাতের প্রস্থ সাত আসমান সাত যমিনের সমান, যা শুধু মোমেনদের জন্যেই তৈরী করা হয়েছে, সে জান্নাত লাভের প্রচেষ্টায় দ্রুত গমন কর, সৎ কাজে তৎপর হও, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এমন জান্নাত লাভের চেষ্টায় ব্যবহার কর।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

'এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দিয়ে থাকেন, আর আল্লাহ পাক মহা অনুগ্রহশীল'।

জান্নাত লাভ হবে শুধু আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে

অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের দয়া ও মেহেরবানীর উপর নির্ভর করে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে জান্নাত দান করবেন।

আবু নায়ীম হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলের একজন নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলেন যে তোমার উম্মতের মধ্যে যারা আমার অনুগত, তাদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেন নিজেদের আমলের উপর ভরসা না করে, কেননা কেয়ামতের দিন আমি যাকে হিসাবের জন্যে দাড় করাবো, যদি কাউকে আযাব দেয়া আমার ইচ্ছা হয়, তবে তার হিসাব কঠিনতর হবে এবং তাকে শাস্তি প্রদান করবো। আর নিজের উম্মতের গুনাহগার লোকদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেয়, অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়, কেননা আমি অনেক বড় বড় গুনাহও মাফ করে দেব।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৮৫

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন লোকের নেক আমল দোযখ থেকে তার নাজাতের কারণ হবেনা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার জন্যেও নয়? তিনি এরশাদ করলেন, না আমার জন্যেও নয়, তবে শুধু এজন্যে যে আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর রহমতে ঢেকে রাখবেন।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

কোরআনে করীমের একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'তোমাদের আমলের বরকতে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর'।

কিন্তু আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমলের বরকতে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবেনা। এ প্রশ্নের জবাব এই, জান্নাতে প্রবেশ করা এবং তাতে চির দিন বাস করা শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই হবে, আর সেখানে মর্তবা বৃদ্ধি হওয়া বা কম হওয়া তা আমলের ভিত্তিতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর একটি কথায় এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ক্ষমা লাভের মাধ্যমে তোমরা পুলসিরাত পার হয়ে যাও, আর আল্লাহ পাকের রহমতে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর আর নিজ নিজ আমল অনুযায়ী জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কর।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসের মর্ম হলো জান্নাত এবং দোযখ অতি নিকটবর্তী। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, ভাল ও মন্দ মানুষের অতি নিকটে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো ভাল কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে দ্রুত পলায়ন করা, বস্তুতঃ এটিই আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ

'পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিপদাপদই আসুক না কেন, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা কিতাবের মধ্যে লিখিত থাকে, নিশ্চয় তা আল্লাহ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩১০

পাকের পক্ষে অতি সহজ তা এজন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তার জন্যে যেন দুঃখবোধ না কর এবং যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তার জন্যে যেন তোমরা উল্লাসে ফেটে না পড়'।

কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে না পারলে মানুষ ব্যথিত ও মর্মাহত হয় এমনকি, ভেঙ্গে পড়ে, পক্ষান্তরে এমন বস্তু লাভ করে মানুষ আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে, অথচ মানুষের জেনে রাখা উচিত, সুখ হোক বা দুঃখ কোনটিই আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত হয়না; বরং যা কিছু হয় তা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলেই হোক না কেন, তা লওহে মাহফুজে বহু পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অদৃষ্টের লিখন কে করতে পারে খন্ডন। অতএব, বিপদ হলে ভেঙ্গে পড়তে নেই, বরং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রেখে সবর অবলম্বন করা উচিত। এমনিভাবে যখন আল্লাহ পাক কোন নেয়ামত দান করেন তখনও আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়া এবং অহংকারী হওয়া উচিত নয়; বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করা কর্তব্য, কাল কি হবে কেউ জানেনা, এ অনিশ্চিত পরিণামের পথেই চলতে থাকে মানব জীবনের সাধনা, অতএব নেয়ামত লাভে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করা এবং বিপদাপদে সবর অবলম্বন করা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

'আর আল্লাহ পাক কোন অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না'।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত লাভ করে অহংকার করে, আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, মানুষ মাত্রেরই অবস্থা হলো এই, নেয়ামত লাভ করলে আনন্দিত হয়, আর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে দুঃখিত হয়। এটি মানুষের স্বভাব, কিন্তু কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এ নির্দেশ দিয়েছেন আনন্দকে শোকর গুজারীর উপকরণ বানাও, আর দুঃখ বেদনাকে সবর অবলম্বনের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ কর।

হযরত জাফর সাদেক (রঃ) বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি কেন এমন বস্তু হারানোর কারণে আক্ষেপ কর, আর কেন এমন জিনিসের কারণে অহংকার কর, যা তোমার নিকট এখন থাকলেও তোমার মৃত্যু তাকে তোমার নিকট থাকতে দেবেনা, অতএব, এমন বিষয়ের উপর দুঃখিত বা গর্বিত হওয়ার আদৌ কোন যুক্তি নেই।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

'যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং মানুষকেও কার্পণ্য করতে বলে, আর যে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বিমুখ হয়, তবে তার জানা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি স্বয়ং প্রশংসিত'।

আলোচ্য আয়াতে যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্যদেরও কার্পণ্য করতে নির্দেশ দেয়, তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাহে দান করতে বিমুখ হয়, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে তাদের জানা উচিত যে আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারো পরোয়া করেন না, মানুষকে আল্লাহর রাহে দান করার যে হুকুম রয়েছে তা পালন করার মাধ্যমে মানুষ পরকালীন জীবনে লাভবান হবে। পক্ষান্তরে যারা এ পর্যায়ে কার্পণ্য করবে, তারা এর শাস্তি ভোগ করবে।

الْحَمِيْدُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক স্বয়ং প্রশংসিত, তাঁর কারো প্রশংসার প্রয়োজন নেই, যারা তাঁর প্রশংসা করে তারা নিজেরাই এর দ্বারা লাভবান হয়। আল্লাহ পাক সর্ব গুণে গুণান্বিত, সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই। অতএব কারো প্রশংসার তিনি মুখাপেক্ষী নন। এমনিভাবে আল্লাহর রাহে দানের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, যে দান করে সে নিজেই লাভবান হয়, আর যে কার্পণ্য করে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ
بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ
رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ
اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২৫) নিশ্চয় আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে করে লোকেরা ন্যায় বিচার কায়েম করে, আর আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, তাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি, আর রয়েছে মানুষের নানা প্রকার উপকার, তা এজন্যে যে আল্লাহ পাক প্রকাশ্যে জানতে চান, কে

না দেখে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব শক্তিমান, তিনি পরাক্রমশালী।

(২৬) আর নিশ্চয় আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়্যত ও কিতাব প্রচলিত রেখেছিলাম, এরপর তাদের মধ্যে কতিপয় লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হলো, আর তাদের অধিকাংশই ছিল নাফরমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে এ জগত ক্ষণস্থায়ী, আর এ জীবনও ক্ষণস্থায়ী, এখানের আনন্দ উল্লাস বা দুঃখ বেদনা কোনটিই স্থায়ী নয়। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহ করা, দুনিয়ার সম্পদ শক্তি নিয়ে বড়াই না করা, কেননা এসব কিছু নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদেরকে মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছেন, যাতে করে মানুষ তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। কোন কোন নবী রসূলগণের নিকট আসমানী কিতাবও নাযিল করেছেন যাতে করে মানুষ হেদায়েত লাভ করে, সত্যকে আঁকড়ে ধরে এবং বাতিল থেকে দূরে থাকে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

'নিশ্চয় আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব'।

আলোচ্য আয়াতের البيّنٰت শব্দটির ব্যাখ্যায় মোকাতেল এবনে সোলায়মান বলেছেন, এর অর্থ হলো নবী রসূলগণকে প্রকাশ্য মোজেযা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

এবং তাদের সাথে কিতাবও নাযিল করেছি যাতে করে লোকেরা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং হালাল ও হারামের পরিচয় পেতে পারে।

وَالْمِيْزَانَ

অর্থাৎ নবী রসূলগণের সঙ্গে ন্যায়ের দাড়ি পাল্লাও অবতরণ করেছি, যেন মানুষ ন্যায় বিচার কায়েম করে এবং কেউ কারো প্রতি জুলুম না করে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, মানুষ যেন ন্যায় পথে অবিচলিত থাকতে পারে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেন কেউ কারো প্রতি জুলুম না করে।

لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

যেন মানুষ ন্যায় বিচার কায়েম করে, এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক কিতাব ও মিযান নাযিল করেছেন।

মোকাতেল এবনে সোলায়মান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ميزان শব্দ দ্বারা সাধারণ দাড়ি পাল্লা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ কোন বস্তু ওজন করে। আর এ দাড়ি পাল্লা নাযিল করার তাৎপর্য হলো, কেউ যেন কারো প্রতি জুলুম না করে, প্রত্যেকে যেন একে অন্যের হক্ব সঠিক ভাবে আদায় করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আসমান থেকে একটি দাড়ি পাল্লা নিয়ে এসেছিলেন এবং তা হযরত নূহ (আঃ)-কে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর জাতিকে ন্যায় বিচার কায়েম করার এবং সঠিক ওজন দেয়ার আদেশ দেন।

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ

(আর আমি সৃষ্টি করেছি লোহা।)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক আসমান থেকে চারটি বরকতময় জিনিস যমীনে নাযিল করেছেন (১) লৌহ, (২) অগ্নি (৩) পানি (৪) লবন। লোহাতে প্রচন্ড শক্তি রয়েছে, এর দ্বারা জেহাদে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হয়। এতদ্ব্যতীত, লোহা অনেক উপকারেও আসে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাক এ আয়াতের প্রারম্ভে নবী রসূলগণকে প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন, যেন তাঁরা মানব জাতিকে সরল সঠিক পূণ্য পন্থা প্রদর্শন করেন এবং মানুষ তাদের হেদায়েত মোতাবেক জীবন যাপন করে এ জীবন ও পর জীবনের সাফল্য লাভ করতে পারে। এ ঘোষণার পর পরই এরশাদ হয়েছে,

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, লোহা অবতারণের তাৎপর্য হলো লোহা সৃষ্টি হওয়া। আর নবী রসূলগণের প্রেরণের পাশাপাশি লোহা সৃষ্টির কথা ঘোষণার তাৎপর্য হলো, হেদায়েতের দু'টি পন্থা রয়েছে, নবী রসূলগণকে প্রেরণ করা ও আসমানী গ্রন্থ সমূহ অবতরণ করা। হেদায়েতের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো জেহাদ। সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, যাতে করে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকে, যা মানবতার বিকাশ ও উন্মেষের জন্যে পূর্বশর্ত। যারা নবী রসূলগণের হেদায়েত মানবে না, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, সত্য ও ন্যায়কে বাধা দেবে, ইসলামের প্রচার প্রসারে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে পথের কাঁটা

হয়ে দাঁড়াবে, তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, তাই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি কেয়ামতের পূর্বে তরবারী সহ প্রেরিত হয়েছি, যেন আমি সত্যদ্রোহীদের সাথে জেহাদ করি, যাতে করে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা হয়"। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-ই একমাত্র আদর্শ

আলোচ্য আয়াতের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই হলেন আলোচ্য আয়াতের মর্মের জীবন্ত নমুনা। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি মানুষকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু মক্কাবাসী সে আহ্বানে সাড়া দেয়া তো দূরের কথা; বরং তারা তাঁর প্রতি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করে। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তাঁদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ পাক হিজরতের অনুমতি দান করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম একে একে রাতের অন্ধকারে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করেন। প্রথমে আবিসিনিয়ায়, এরপর মদীনা মোনাওয়্যারায়। হিজরতের এক বছর পর মদীনায় হানাদারদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। তাই সর্ব প্রথম বদরের রণাঙ্গনে মাত্র তিনশত তেরজন মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের মোকাবেলা করতে হয়, আর এভাবে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল ধীরে ধীরে বিদায় নেয়।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ

'যাতে করে আল্লাহ পাক একথা প্রকাশ্যে জানেন কে না দেখে আল্লাহ পাককে ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি পরাক্রমশালী'।

আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন, কে ইসলামের সাহায্যকারী, আর কে ইসলামের বিরোধিতাকারী। কিন্তু তিনি একথা প্রকাশ করে দিতে চান যে, কে ইসলামের সাহায্যকারী। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব শক্তিমান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে যে কোন সময় ধ্বংস করতে পারেন, তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তবে তিনি মুসলমানদেরকে এ উদ্দেশ্যে জেহাদের আদেশ দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ করে আখেরাতে উচ্চ মর্তবা লাভ করে। আল্লাহ পাকের আদেশ পালনের মাধ্যমে অশেষ সওয়াব লাভ করে। আর যারা শাহাদাত বরণ করেন, তারা যাতে শাহাদাতের মহা পুরস্কার লাভ করেন।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

"আর নিশ্চয় আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়্যত ও কিতাব প্রচলিত রেখেছিলাম, এরপর তাদের মধ্যে কতিপয় লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হলো, আর তাদের অধিকাংশই ছিল নাফরমান"।

হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে। হযরত নূহ (আঃ)-এর পর থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত যত নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন, সকলেই হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর যত নবী রসূলগণ আগমন করেছেন, সবাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশে তথা বণী ইসরাঈলে দু' হাজার বছরের মধ্যে চার হাজার নবী আগমন করেছেন, সবাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে শুধু একজন নবী হয়েছেন, তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, নবী ও রসূলগণের দলপতি, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধারায় দশম হলেন হযরত নূহ (আঃ), আর বিশতম ব্যক্তি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। আর নব্বইতম ব্যক্তি হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আর তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবেনা, যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, মনে রেখ! সাবধান হও, আমার পরে আর কোন নবী নেই। আরও এরশাদ হয়েছে, "আর আমার দ্বারা নবীগণের আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে"।

এভাবে দুনিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের বাস্তব ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে কিতাব প্রচলিত রাখেন, তাদের বংশধরদের মধ্যে কিছু লোক সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়, সত্যের অনুসারী হয় এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়, তবে তাদের অধিকাংশই ছিল অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, পথভ্রষ্ট।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ
فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝۲۷
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ
كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۲۸ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰي شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝۲۹

তরজমা

(২৭) এরপর তাদের পেছনে তাদের অনুসরণে আমার রসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকি, এরপর তাদের পেছনে মরয়ম পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করি এবং তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করি, এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আমি তাদের অন্তর সমূহে সৃষ্টি করেছিলাম করুণা ও দয়া। কিন্তু তারা নিজেরাই বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তন করে, যার বিধান আমি তাদেরকে দেইনি, আমি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্বেষণের কথাই বলেছি, অথচ তা-ও যথাযথভাবে তারা পালন করেনি, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে পুরষ্কার দিয়েছি, আর তাদের অধিকাংশই ছিল অবাধ্য, নাফরমান।

(২৮) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দ্বিগুণ অংশ দান করবেন, আর তিনি তোমাদেরকে এমন এক নূর দান করবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, এবং আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।।

(২৯) তা এজন্যে যে, আহলে কেতাবরা যেন জানতে পারে, আল্লাহ পাকের সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই, আর তারা একথাও (জানতে পারে) যে, অনুগ্রহ শুধু আল্লাহ পাকেরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ্ পাক সুমহান, করুণার অধিপতি।

তফসীরুল কোরআন

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ

'এরপর তাদের পেছনে তাদের অনুসরণে আমার রসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকি, পরে তাদের পেছনে মরয়ম পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করি এবং তাকে ইঞ্জিল প্রদান করি'।

বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রেরিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের অনুসরণে আরও নবী রসূলগণ প্রেরিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর বণী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী হিসাবে আগমন করেছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁকে আল্লাহ্ পাক ইঞ্জিল কিতাব দান করেছিলেন। কিন্তু নাসারারা সে কিতাবে পরিবর্তন করে। তাদের কাছে বর্তমানে যে ইঞ্জিল রয়েছে, তা আদৌ সে কিতাব নয়, যা আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট নাযিল করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের ছয়শত বছর পর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে গোমরাহীর অন্ধকারে সারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাসী এবং তাঁর বিধানের অনুসারী তখন কেউ ছিলনা। ঈসা (আঃ)-এর নাম উচ্চারণকারী ছিল কিন্তু তাঁর অনুসারী ছিলনা। আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

'আর যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আমি তাদের অন্তর সমূহে সৃষ্টি করেছিলাম

করুণা ও দয়া। কিন্তু তারা নিজেরাই বৈরাগ্যবাদ প্রবর্তন করে, যার বিধান আমি তাদেরকে দেইনি'।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের অন্তরে আল্লাহ পাক দয়া মায়া সঞ্চার করে দেন, ফলে তারা মানুষের সাথে এমনকি, সমগ্র সৃষ্টির সাথে সহৃদয় ব্যবহার করতো, আল্লাহ পাকের রহমতেই তারা এ গুণ অর্জন করেছিল। এটি ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত।

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতীরা বৈরাগ্যবাদ বা সংসারত্যাগী হওয়ার পথ অবলম্বন করেছিল, যার বিধান আমি তাদেরকে দেইনি।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে রুহবানীয়্যাত বা বৈরাগ্যের সাথে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

রুহবানিয়্যাত হলো সংসার ত্যাগে কঠোর সাধনায় বাড়াবাড়ি, যেমন সুস্বাদু খাবার পরিহার করা, কোন প্রকার জীব হত্যা পরিত্যাগ করা, বিয়ে শাদী না করা প্রভৃতি।

স্বভাব ধর্ম ইসলাম এসব কাজ করার নির্দেশ দেয়না। ধর্মের নামে নাসারারা নিজেদের তরফ থেকেই এসব আবিষ্কার করেছিল, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ

এ বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগের প্রথা আমি তাদেরকে লিখে দেইনি। তারা নিজেরাই ধর্মের নামে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার এ পন্থা আবিষ্কার করেছিল, এটি একটি শয়তানী ফাঁদ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হতে, কিন্তু তারা তাতে বাড়াবাড়ি করেছে।

অথচ তা-ও যথাযথভাবে তারা পালন করেনি অর্থাৎ সংসারত্যাগী হওয়ার যে ভ্রান্ত পথ তারা অবলম্বন করেছিল, তাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াত–

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ

এর দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন। তারা যে সংসার ত্যাগী হওয়ার পথ অবলম্বন করেছে তা তারা সৎ উদ্দেশ্যেই করেছে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করেছে।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ), কাতাদা (রঃ) আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগের প্রথা আমি তাদের জন্যে প্রবর্তন করিনি, আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নির্দেশ দিয়েছি কিন্তু তারা তা-ও অর্জন করতে পারেনি, তারা নিজেদের তরফ থেকে সংসার ত্যাগী হওয়ার যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, যথাযথভাবে তা-ও পালন করেনি।

ইসলামী জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য

ইসলাম মানুষকে সরল সঠিক পন্থা প্রদর্শন করে, যা মানুষের স্বভাব বিরোধী এমনকি, যা মানুষের জন্যে চরম কষ্টদায়ক, এমন কাজেরও নির্দেশ ইসলাম দেয়না। বিয়ে-শাদী, সংসার-ধর্ম না করে জীবন বিমুখ হওয়া, কোন কাজ-কর্ম না করা তথা বৈরাগ্য অবলম্বন করা ইসলামে পছন্দনীয় কাজ নয়। কোরআন ও হাদীসে এর কোন সমর্থন নেই। ইসলামে রুহবানিয়্যাত হলো আল্লাহর রাহে জেহাদ করা।

সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে দেয়া, এটিই ইসলামের শিক্ষা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের ক্ষমতাসীন লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর তৌরাত ইঞ্জিলে অনেক পরিবর্তন করে। কিন্তু তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল ঈমানের উপর কায়েম ছিল। তাদের অধিকাংশ লোক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী মানতো না, যেমন তারা আমাদের নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতেও বিশ্বাস করেনি, তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মোমেন ছিল, তাদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

'তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে পুরষ্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই ছিল অবাধ্য, নাফরমান'।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওসিয়ত মোতাবেক তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছিল, তাই তাদের জন্যে এ আয়াতে রয়েছে অশেষ সওয়াব লাভের সুসংবাদ।

وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

'আর তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল অবাধ্য, নাফরমান'।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হে এবনে মাসউদ! আহলে কিতাবরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে তিনটি ফেরকা দোযখ থেকে নাজাত পেয়েছে। আর অবশিষ্টরা ধ্বংস হয়েছে। এক ফেরকা পথভ্রষ্ট ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেছে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত ধর্মে তারা কায়েম ছিল, রাজা বাদশাহরা তাদেরকে হত্যা করেছে (এই ফেরকা জান্নাতী হয়েছে)। আর এক ফেরকা রাজা বাদশাহদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি রাখতো না, এমনকি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলার সাহসও রাখতো না, এ ফেরকা দেশ থেকে বের হয়ে যায় এবং ধর্মযাজক হিসাবে ভ্রমণে চলে যায়। আলোচ্য আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আর যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমার অনুসরণ করেছে তারাই হলো তৃতীয় নাজাত প্রাপ্ত ফেরকা। আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের ধ্বংস অনিবার্য (কেননা তারা হবে দোযখী)।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক উম্মতে রুহবানিয়্যাত রয়েছে, আর এ উম্মতের রুহবানিয়্যাত হলো আল্লাহর রাহে জেহাদ করা।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দ্বিগুণ অংশ দান করবেন, আর তিনি তোমাদেরকে এমন এক নূর দান করবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

এক ব্যক্তি হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললো, আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে এমন একটি জিনিস চেয়েছো যা আমি নিজে চেয়েছি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট। আমি তোমাকে এই উপদেশ দেই, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, এটিই সকল নেক আমলের রহস্য, আর জেহাদকে অবশ্য কর্তব্য মনে কর,

কেননা এটি ইসলামের রুহবানিয়্যাত বা সংসারত্যাগী হওয়া। আর আল্লাহর জিকর ও তেলাওয়াতে কোরআনে সর্বদা ব্যস্ত থাকবে, এটি তোমার জন্যে শান্তি ও কল্যাণের কারণ হবে, আর এ কারণেই আসমান ও যমীনে তুমি স্মরণীয় হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং তোমাদেরকে এমন নূর দান করবেন, যা দ্বারা তোমরা (পুলসিরাতে) চলবে, আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে মোমেনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা হলো আহলে কিতাব মোমেন, এজন্যে কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবেঃ হে সে সব লোক! যারা ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক এবং আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আন, তোমাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর রহমত থেকে দ্বিগুণ দান করবেন।

একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন (১) সেই আহলে কিতাব, যে প্রথমে নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর আমার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। (২) সেই গোলাম, যে তার মনিবের তাবেদারী করে এবং আল্লাহ পাকেরও হক্ব আদায় করে, তাকেও দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হবে। (৩) সেই ব্যক্তি যে তার বাঁদীকে আদব তমীজ শেখায়, শরীয়তের নিয়ম কানুন শেখায়, এরপর তাকে আজাদ করে দেয় এবং এরপর তাকে বিবাহ করে, সে ব্যক্তিও দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

আবু দাউদ এবং এবনে আবি হাতেম মোকাতেল (রঃ)-এর সূত্রে এ আয়াতের শানে নুযুল এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন সূরা কাসাসের এ আয়াত أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ (তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক দান করা হবে) নাযিল হলো তখন আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা গৌরব করতে লাগলেন যে, আমাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম তাদের এ গৌরব করাকে পছন্দ করেননি। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় এবং এতে সকল মোমেনের জন্যেই দ্বিগুণ সওয়াবের কথা ঘোষণা করা হয়।

এ বর্ণনার আলোকে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ আয়াতে যে সম্বোধন করা হয়েছে তা দ্বারা সকল সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, চাই আহলে কিতাব হোক বা না হোক। আর আয়াতের তরজমা হবে এভাবে, "হে মোমেনগণ! তোমরা

আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর নবী যা নিয়ে এসেছেন, সব কিছুর উপর ঈমান আন এবং তা মেনে চল"।[১]

نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ

অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন নূর দান করা হবে যার দ্বারা তোমরা পুলসিরাতে চলতে পারবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনই হল নূর।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সুস্পষ্ট হেদায়েতেই হল নূর অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে এমন সুস্পষ্ট পথ দেখাবেন, যার উপর চলে তোমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং জান্নাতুল ফেরদৌস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ

তোমাদের গত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

এবনে জরীর লিখেছেন, তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যখন يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ নাযিল হয় তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব দয়াবান, তাঁর দয়া মায়া অনন্ত অসীম, তাঁর রহমত অফুরন্ত।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"তা এজন্যে যে, আহলে কিতাবরা যেন জানতে পারে আল্লাহ পাকের সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই, আর তারা একথাও (জানতে পারে) যে, অনুগ্রহ শুধু আল্লাহ পাকেরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ পাক সুমহান, করুণার অধিপতি"।

আয়াতের এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াত يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ এর যে ব্যাখ্যা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) করেছেন, তার আলোকে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ঐ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সমস্ত মোমেনদেরকে, শুধু আহলে কিতাবদের নয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৯৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৭, পৃষ্ঠা-১১৮-১৯
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩১৯

আল্লামা বগভী (রঃ) কাতাদা (রঃ) এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ যে সব আহলে কিতাব হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেনি, তারা আহলে কিতাব মুসলমানদের হিংসা করতো, তারা বলতো, আমাদের সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ পাকের সাথে আমরা তার সন্তান (নাউজুবিল্লাহ), আমরা তাঁর প্রিয় এবং পছন্দনীয়। কেননা তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। এর দ্বারা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, যেহেতু তারা আল্লাহর নবীর প্রতি ঈমান আনেনি তাই তাদেরকে কোন সওয়াব দেয়া হবেনা, কেননা সওয়াব ঈমানের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে ঈমান নেই সেখানে সওয়াব নেই।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো আহলে কিতাবরা যেন একথা মনে না করে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহর অনুগ্রহ পাবেনা; বরং তাদের জানা উচিত, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের উপর আহলে কিতাবদের কোন অধিকারই নেই, কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ শুধু তাঁর হাতেই রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন।

এবনুল মুনজের মুজাহেদ (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আহলে কেতাবদের এই আকীদা ছিল যে তারা হলো আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর একান্ত পছন্দনীয় (নাউজুবিল্লাহ)। একথা আদৌ সত্য নয়। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِّئَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ

আহলে কিতাবরা যেন একথা জেনে রাখে যে, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কোন অংশের উপর তাদের কোন অধিকার নেই, তাদের আমলের জন্যে তারা কোন সওয়াব পাবেনা, কেননা তারা আল্লাহর নবীর উপর ঈমান আনেনি, আর সওয়াব ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইহুদীরা বলতো, আমাদের মাঝে অদূর ভবিষ্যতে একজন নবী প্রেরিত হবে, যে মুসলমানদের হাত পা কেটে দেবে। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ তথা নবুওয়তের ব্যাপারে তাদের কোন অধিকার নেই অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের فضل শব্দ দ্বারা নবুওয়্যতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে,

وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

অর্থাৎ নবুওয়্যত দান করার ক্ষমতা এক আল্লাহ পাকেরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন।

وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

আর আল্লাহ পাক সুমহান, করুণার অধিপতি, তাঁর করুণা, দয়া মায়ার কোন সীমা নেই। এতদসত্ত্বেও যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে না, তাঁর অনুসরণ করবে না, তারা করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা থেকে কিছুই লাভ করতে পারবে না, কেননা আল্লাহ পাক তাঁকে রহমতুল্লিল আলামীন বলে ঘোষণা করেছেন,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

'(হে রসূল!) শুধু আপনাকে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি'।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

'আমিতো শুধু বিতরণকারীই, আর আল্লাহ পাকই মহান দাতা'।

অতএব, মহান দাতা আল্লাহ পাকের দয়া মায়া পেতে হলে রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে, তাঁর উসিলায় দরবারে এলাহীতে আরজী পেশ করতে হবে। এজন্যই দোয়া কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল, দোয়ার পূর্বে ও পরে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পেশ করা। আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১লা এপ্রিল মোতাবেক ২২ জিলক্বদ, ১৮ চৈত্র রোজ মঙ্গলবার রাত আট ঘটিকার সময় তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৭ তম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর এই সাধনা এবং তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, এর বরকতে আমাদেরকে এবং তফসীরে নূরুল কোরআনের সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে কামিয়াব কর, আমীন।